ভারতের সামন্ততন্ত্র

(চতুর্থ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী)

রাম শরণ শর্মা

ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

মুখবন্ধ

গবেষণার ফলাফল ভারতীয় ভাষায় সাধারণ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। তাই সব পাঠকরাই আমাদের কাছে আশা করেন যে গবেষণার ফলাফল ভারতীয় ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হোক; আমাদের গবেষণার কাজ তারই ফলে ব্যাপকতর প্রচার লাভ করতে পারে। ইংরাজী ভাষায় লিখিত গবেষণা ভারতীয় ঐতিহাসিকদের আন্তর্জাতিক সুনাম ও মর্যাদা দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু সে লেখা ভারতবাসীদের সীমিত সংখ্যক গোষ্ঠীরই উপকারে আসে। হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদান ও গবেষণার প্রচেষ্টা ও সাদিচ্ছা বেড়েই চলেছে। কাজেই ভারতীয় ভাষায় লিখিত উপযুক্ত ইতিহাস পুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। ভারতীয় ইতিহাস লেখাই আমাদের প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সেই জন্য শ্রেষ্ঠ লেখকদের কিছু-কিছু উৎকৃষ্ট রচনা এবং ঐতিহাসিক গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে ও সমসাময়িক ধারায় রচিত অন্যান্য কিছু পুস্তকাদি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রকৃতি বর্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। উৎকীর্ণ লিপির উপর ভিত্তি করে নানা ধরনের ভূমিব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র ও কৃষকদের মাঝখানে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভবের প্রতি এই পুস্তকে আলোকপাত করা হয়েছে। যদিও মূল কাঠামো অপরিবর্তীত থেকেছে তবুও সময় ও আঞ্চলিক অবস্থা অনুযায়ী এই অগ্রগতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। ইংরেজী ভাষায় এই পুস্তকখানি প্রকাশের পর সামন্ততন্ত্রের উপর সাধারণভাবে আরও কিছু আলোচনা হয়েছে, বিশেষভাবে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। এই সব আলোচনার কিছু-কিছু আভাস বর্তমান পুস্তকে ছিল। ভারতীয় নিদর্শনের উপর ভিত্তি করে এইটিই এখন পর্যন্ত একমাত্র পুস্তক।

যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তক প্রথম প্রকাশ করেন ১৯৬৫ সালে তবুও বাংলাদেশে এই পুস্তকের খুব একটা প্রচার হয় নি। আশাকরি বাঙ্গালী পাঠকদের মধ্যে যাঁরা সামাজিক সংগঠনের স্বরূপ সম্বন্ধে খুবই উৎসুক তাঁদের এই অনুবাদ সাহায্য করবে।

আমি অনুবাদক শ্রীশিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়-কে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাম শরণ শর্মা

২০শে মার্চ, ১৯৭৭

অধ্যক্ষ

ভারতীয় ইতিহাস-অনুসন্ধান পরিষদ

পরিচিতি

বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উচ্চতর অধ্যয়ন কেন্দ্র কর্তৃক ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আয়োজিত বক্তৃতামালার প্রথম পর্যায়ের ছটি বক্তৃতাদানের জন্য এবং প্রথম দুটি আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাম শরণ শর্মাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অধ্যাপক শর্মার বক্তৃতাগুলি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উৎসাহী ছাত্রদের হাতে গ্রন্থরূপে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আলোচনা সভায় আলোচিত অন্যান্য বিষয়গুলি (সামন্তবাদ ও প্রাচীনভারতে ভূমিব্যবস্থা) পৃথকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

এত অল্প সময়ের মধ্যে বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত রূপ পাওয়ায় আমরা আনন্দিত। এর জন্য আমরা অধ্যাপক শর্মা ও পুরাণ প্রেসের নিকট ঋণী।

ডি. সি. সরকার
নির্দেশক

উচ্চতর অধ্যয়ন কেন্দ্র
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৭ই আগস্ট ১৯৬৫

ভূমিকা

১৯৬৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উচ্চতর অধ্যয়ন কেন্দ্রের নির্দেশক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আমি যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলাম, তার উপর ভিত্তি করে বর্তমান গ্রন্থটি রচিত। এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করার জন্য এবং আমার গ্রন্থটির প্রকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য আমি তাঁর প্রতি এবং কেন্দ্রের বর্তমান নির্দেশক ডঃ ডি. সি. সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ। ডঃ বাসাম গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপিতে কয়েকটি প্রমাদ নির্দেশ করেছেন, বিশেষ করে চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভারতীয় জলযান প্রসঙ্গে। ডঃ ভকৎপ্রসাদ মজুমদার আমাকে কয়েকটি সৎ পরামর্শ দিয়েছেন। এই জন্য আমি উভয়ের নিকট ঋণী। ডঃ (শ্রীমতী) সুবীরা জয়সওয়াল এবং ডঃ দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঝা শব্দসূচী প্রণয়ন করেছেন; ডঃ সীতারাম রায় ও শ্রী জগন্নাথ মিশ্র প্রুফ সংশোধন করেছেন, সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে আমি পুরাণ প্রেসকে তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থে ব্যবহৃত সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দগুলি একটি করে হাইফেন দিয়ে পৃথক করা হয়েছে; কোথাও কোথাও দুটি হাইফেন আবশ্যক হলেও প্রেসে পাওয়া যায় নি। আধুনিক ভারতীয় ভাষার সুপরিচিত নামগুলিতে কোন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় নি।

'পরিশিষ্ট ১'এ মূল গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও এটিতে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার ভূমিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে বলেই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভারতের পটভূমিকায় সামন্তবাদের আলোচনা যে সমস্যা সঙ্কুল সে সম্বন্ধে আমি সচেতন। কিন্তু এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কাউকে না কাউকে ত কাজের সূত্রপাত করতেই হবে। আলোচ্য গ্রন্থে আমি প্রায় ছয় শতাব্দীর সামন্তবাদের সাধারণভাবে আলোচনা করেছি; যে-সকল সমস্যা সামনে এসেছে সেগুলির আলোচনা পরে হতে পারবে। মুখ্যতঃ উত্তর ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ বর্তমান আলোচনায় আমি সামন্তবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনা করেছি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সামন্তবাদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করি নি।

এই সকল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমার এই গ্রন্থ যদি কোন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্রের মনে আলোচ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পাবে তা হলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

ইতিহাস বিভাগ
পাটনা বিশ্ববিত্যালয়
রাম শরণ শর্মা
১৫ই আগস্ট, ১৯৬৮

নাম সংকেত

	নাম	সংকেত
১।	Antiquarian Remains in Bihar D. R. Patil, Patna, 1963	এ. রি. বি.
২।	Archaeological Survey Reports by A. Cunningham	আ. সা. রি.
৩।	Ānandā Sarama Sanskrit Series	আ. স. সি.
৪।	Bibliotheca Indica	বি. ই.
৫।	Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, i, Oxford, 1906	ক্যা. ক. ই. মি.
৬।	Cambridge History of India, i, ed. E. J. Rapson, Indian Reprint, Delhi 1955	কে. হি. ই.
৭।	Corpus Inscriptionum Indicarum, i, iii, London, 1888-1929 , iv, Ootcamund, 1955	ক. ই. ই
৮।	Epigraphia Indica, Calcntta & Delhi	এ ই.
৯।	Gaikwad Oriental Series	গা. ও. সি.
১০।	History and Culture of the Indian People, ed. R. C. Majumdar, Bombay 1951	হি কা ই পি.
১১।	History of Dharmaśāstra, P. V. Kane, Poona	হি. ধ.
১২।	Indian Antiquary, Bombay	ই. এ.
১৩।	Inscriptions of Bengal, iii, N. G. Majumdar, Rajshahi, 1929	ই. বে.
১৪।	Indian Historical Quaterly, Calcutta	ই. হি. কোয়া.
১৫।	Journal of the American Oriental Society, Baltimore	জা. আ. ও. সো.
১৬।	Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Bombay	জা ব. ব ব. এ. সো.
১৭।	Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna	জা. বি. ও রি. সো.
১৮।	Journal of the Bihar Reseanch Society	জা. বি. রি. সো.
১৯।	Journal of Department of Letters, Calcutta University	জা. ডি. লে.
২০।	Journal of the Economic and Social History of the Orient, Leiden	জা. ই. সো হি.
২১।	Journal of Indian History Trivandrum	জা. ই. হি.

২২। Journal of the Numismatic Society of India, Varanasi (Banaras) — জা নি. সো. ই.

২৩। Journal of Oriental Research. Madras — জা. ও. রি.

২৪। Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, London — জা. র এ. সো.

২৫। Sacred Books of the East, 50 Vols, ed. F. Max Muller, Oxford, 1879-1900 — স্যা. বু. হি.

২৬। Selected Inscriptions, i, D. C Sircar, Calcutta 1942, — সে. ই.

অন্যান্য সংকেত

১। সম্পাদিত—সঃ

২। পৃষ্ঠা—পৃঃ

৩। পঙক্তি—প

সূচীপত্র

১

উদ্ভব ও প্রথম পর্যায়

(প্রায় ৩০০—৭৫০ খ্রীঃ)

সামন্ততন্ত্রের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন। সমাজবাদের ক্ষেত্রে যেমন, সামন্তপ্রথার ক্ষেত্রেও তেমনি, যত পণ্ডিত তত মত, তত সংজ্ঞা। পরস্পরের সঙ্গে স্থান ও কালের দূরত্বে যথেষ্ট সুদূর—ইতিহাস বিকাশের বিভিন্ন স্তরের ক্ষেত্রেও এই অভিধাটি প্রযুক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মিশরের রাজবংশের শাসনের অবসান ও পরবর্তী শাসনের অন্তবর্তীকাল (খ্রীঃ পূঃ ২৪৭৫-২১১০) এবং চীনের চৌ রাজাদের শাসনকাল (খ্রীঃ.পূঃ ১১২২-২৫০) উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাধারণভাবে এই শব্দটি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থা সম্পর্কেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এ বিষয়েও অবশ্য কেউ কেউ মালিক ও প্রজার চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের উপর, আবার কেউ কেউ 'মানব' প্রথার মাধ্যমে প্রকাশিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জোর দিয়ে থাকেন। ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে হয় সামন্ততন্ত্রের রাষ্ট্রনৈতিক তাৎপর্য ভূমির সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য ভূমিদাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল—যে ব্যবস্থায় জমির সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কযুক্ত প্রকৃত জমিচাষীরা প্রত্যক্ষভাবে জমি পায় না, পায় মধ্যবর্তী ভূস্বামী-শ্রেণীর কাছ থেকে এবং তাদেরই নিজ উৎপাদিত ফসল এবং কায়িক শ্রম দিয়ে জমির খাজনা পরিশোধ করে। এই ব্যবস্থা অবশ্য স্বনির্ভর অর্থনীতিব্যবস্থা সূচিত করে। এই অর্থনীতিব্যবস্থায় স্থানীয়ভাবে চাষীদের ও মালিকের ভোগের জন্যই সামগ্রী উৎপাদিত হত—বাজারে বিক্রির জন্য নয়। অতএব এই অর্থেই সামন্ততন্ত্রের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে আমরা ভারতে সামন্তপ্রথার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

মৌর্যোত্তরকালে এবং বিশেষ করে গুপ্তদের সময় থেকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকাশের কোনো কোনো দিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রের অভিমুখী করেছিল। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ব্রাহ্মণদের ভূমিদানপ্রথা। এই প্রথা ধর্ম-শাস্ত্রানুসারী এবং মহাকাব্যে ও পুরাণেও এই প্রথার উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতের অনুশাসনপর্বের 'ভূমিদানপ্রশংসা' শীর্ষক অধ্যায়ে ভূমিদানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। মৌর্যোত্তর প্রাচীন পালি গ্রন্থে কোশল এবং মগধ রাজ্যের রাজাগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের গ্রামদানের উল্লেখ আছে। কিন্তু দাতাদের প্রশাসনিক অধিকার বর্জনের কথা

তাতে উল্লেখ কবা হয নি। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ সাতবাহন বাজাদেব একটি প্রস্তবলিপিতে অশ্বমেধ-যজ্ঞ[১] উপলক্ষে গ্রামদানেব কথা উল্লিখিত আছে। সেই প্রস্তবলিপিধৃত সর্বপ্রাচীন দলিলেব প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। আশ্চর্যেব বিষয় সাতবাহন নৃপতি গোতমীপুত্র সাতকর্ণী খ্রীষ্টীয দ্বিতীয শতাব্দীতে বৌদ্ধশ্রমণদেব অনুরূপ দানেব সময বাজা সম্ভবতঃ এই প্রথম প্রশাসনিক অধিকাব পবিত্যাগ কবলেন। বৌদ্ধশ্রমণদেব দানলব্ধ ভূমিতে বাজকীয সেনা বা কোনো সবকাবী কর্মচাবী প্রবেশ কববে না এবং আঞ্চলিক আবক্ষীও সেখানে কোনোপ্রকাব হস্তক্ষেপ কববে না এইরূপ বাজাদেশ ছিল।[২] খ্রীষ্টীয পঞ্চম শতাব্দী থেকে এইরূপ ভূমিদানেব ক্ষেত্রে দুটি সাধাবণ বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট হযে ওঠে—সে দুটি এই, জমিব খাজনা আদায এবং প্রশাসনিক ও আবক্ষা (পুলিস) ব্যবস্থাব হস্তান্তব। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয শতাব্দীব দানপত্রে দেখা যায যে, লবণেব উপব থেকে বাজা নিজ নিয়ন্ত্রণাধিকাব প্রত্যাহাব কবে নিচ্ছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুমান কবা সঙ্গত যে, কব আদাযেব অন্যান্য সূত্রগুলি বাজা নিজেব হাতেই বেখেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয প্রববসেন বাকাতকেব সময থেকে (খ্রীষ্টীয পঞ্চম শতাব্দী) শাসনকর্তা পশুচাবণভূমি, চামডা, কাঠকযলা, খনি, লবণ প্রস্তুত, বেগাব খাটানো, ভূমিব অভ্যন্তবস্থ গুপ্তধন ইত্যাদি অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে বাজস্বেব সর্বপ্রকাব উৎস থেকেই নিজ নিযন্ত্রণাধিকাব প্রত্যাহাব কবে নিযেছিলেন।[৩] বঘুবংশে উল্লেখ আছে যে, বাজা পৃথিবীকে বক্ষা কবেন বলে খনিগুলিকে বেতন হিসাবে পান।[৪] খ্রীষ্টীয চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীব কিছু দানপত্রে দেখা যায যে, দানলব্ধ গ্রামেব অভ্যন্তবস্থ গুপ্তধন অথবা অন্যান্য সর্ববিধ খনিজ সঞ্চয়েব উপব ব্রাহ্মণদেব অধিকাব দেওযা হযেছিল।[৫] খনিব উপব অধিকাব বাজার সাবভৌমত্বেব পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই অধিকাবও হস্তান্তব কবা হয়েছিল।

অনুরূপভাবে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে দাতা কেবল বাজস্বেব অধিকাব ত্যাগ করেন নি। প্রদত্ত গ্রামেব অধিবাসীদেব শাসনেব অধিকাবও ত্যাগ কবেছিলেন। গুপ্তযুগে অন্তত আধ ডজন এমন নিদর্শন পাওয়া যায় যে মধ্যভাবতেব বড় বড বাজন্যবর্গ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের যে গ্রামসমূহ দান করা হয়েছিল, সেই গ্রামসমূহের চাষী এবং

১। সে. ই., পৃঃ ১৮৮, প ১১
২। ঐ, পৃঃ ১৯২, ১৯৪-৫
৩। ঐ, পৃঃ ৪২২, প ২৬-৯
৪। XXII, শ্লোক ৫০
৫। ক. ই. ই., নং XXXXI, প ৮; সে. ই., পৃঃ ৪২২, প ২৯

কারিগর অধিবাসীদেরকে বিশেষভাবে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা দান-গ্রহীতাকে শুধু প্রথাগত কর দেবে তাই নয়, তাদের আদেশও পালন করবে। গুপ্তযুগের পরবর্তী দুটি ভূমিদানের ক্ষেত্রে দাতা এইরূপ নির্দেশ জারী করেছিলেন যে সর্বাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী, নিয়মিত সৈনিক এবং ছত্রধারীরা যেন কোনক্রমে দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের বিরক্তি উৎপাদন না করে।[১] এই সমস্ত ঘটনা রাজ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতার হস্তান্তরের স্পষ্ট প্রমাণ।

পঞ্চম শতাব্দীর শিলালিপি থেকে জানা যায় যে শাসক সাধারণতঃ চোরকে দণ্ড-দানের ক্ষমতা নিজের হাতেই রাখতেন। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রশক্তির একটি অন্যতম ভিত্তিস্বরূপ ছিল। পরবর্তীকালে রাজারা যখন চোরকে সাজা দেবার অধিকার ছাড়াও পারিবারিক, বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত, ব্যক্তিগত ইত্যাদি সর্বপ্রকার অপরাধের বিচার-ক্ষমতা ব্রাহ্মণদের উপর অর্পণ করলেন, তখন রাষ্ট্রশক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণেই বিচ্ছিন্ন হতে থাকল। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কিছু রাজা দানগ্রহীতাকে তাদের দানলব্ধ গ্রামে মামলা মোকর্দমার বিচারভারও অর্পণ করেছিলেন। এইরূপ দানকে 'অভ্যন্তরসিদ্ধি'[২] আখ্যা দেওয়া হত। অভ্যন্তরসিদ্ধি শব্দটির নানারকম অর্থ করা হয়ে থাকে।[৩] এর অর্থবোধ সহজ হয় যদি আমরা অভ্যন্তরসিদ্ধি বলতে গ্রামের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বয়ং-নির্ভরতা[৪] বুঝি। এই পারিভাষিক শব্দটি যে উত্তর ভারতের দানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'স-দণ্ড-দশ-অপরাধঃ' শব্দটির পরিপূরক তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় শব্দটিতে দানগ্রহীতার অধিকারের সীমা শুধু ফৌজদারী মামলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ প্রথমটিতে সেটা দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রেও প্রসারিত।

প্রাচীন সাহিত্যে ও শিলালিপিতে রাষ্ট্রশক্তির যে সাতটি অঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়, তার মধ্যে শুল্ক আরোপ এবং সৈন্যবাহিনীর দ্বারা দমন ক্ষমতা—এই দুটি অপরিহার্য বলে বিবেচিত। এই দুটি পরিত্যক্ত হলে রাজশক্তির অন্তরবিচ্ছেদ ঘটে যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণদের দান দেওয়ার ফলে এইরূপ পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণতঃ চন্দ্রসূর্যের অবস্থিতিকাল পর্যন্ত জায়গীর দেওয়া হত যার অর্থই হল স্থায়ীভাবে রাজশক্তির সংহতি বিনষ্ট। পুরোহিতদের ভূমিদানের ইতিহাস খুঁজতে গেলে মৌর্য

১। রামশরণ শর্মা, পলিটিকো লিগ্যাল অ্যাস্পেক্টস্ অফ দি কাস্ট সিস্টেম, জা. বি. রি. সো., ৩৯, ৩২৫

২। "অভ্যন্তর সিদ্ধিকাঃ"। ক. ই. ই., iv, নং ৩১, পৃ ৪১

৩। ক. ই. ই., iv, ১৫৪, পাদটীকা ১

৪। ঐ, iii, ১৮৯-৯০, পাদটীকা ৪

ও প্রাক্‌মৌর্য যুগে পিছিয়ে যেতে হয়। কৌটিল্য নতুন জমি বন্দোবস্তের ব্যাপারে 'ব্রহ্মদেয়' নামক স্বত্বের সুপারিশ করেছিলেন, যার অর্থ কর ও শাস্তি থেকে অব্যাহতি।[১] কিন্তু গুপ্তযুগে অবস্থার পরিবর্তন হয়। পঞ্চম শতাব্দীর খ্যাতনামা গ্রন্থকার বুদ্ধঘোষ তাঁর রচিত পালি গ্রন্থে ব্রহ্মদেয় শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এইরূপ দান বিচারগত ও প্রশাসনসম্পর্কীয়।[২] তার এই ব্যাখ্যা সমসাময়িক শিলালিপির সাক্ষ্যেও সমর্থিত হয়। ব্রহ্মদেয় শব্দটির এই ব্যাখ্যা অবশ্য প্রাক্‌-মৌর্যযুগের অবস্থা প্রতিফলিত করে না, বরং টীকাকারের সমসাময়িককালের অবস্থাই বর্ণনা করে। অতঃপর ভূমিদানের বহুল ব্যবহার শুধু যে ব্রাহ্মণ প্রভুত্বের পথ সুগম করে দিয়েছিল তাই নয়, ব্রাহ্মণরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রাজ-পুরুষদের ক্ষমতার বাইরে থেকে, প্রায় স্বাধীনভাবে। তাদের কোনো রাজকীয় পদস্থ ব্যক্তির অধীনে থাকতে হত না। পূর্ববর্তী দানে যে বিষয়টি উহ্য ছিল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে তা স্পষ্ট হয়ে গেল এবং তুর্কীদের আমলে শাসনপদ্ধতিতে তা ভালভাবেই স্বীকৃত হল। দাতাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এইরূপ দানের ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই রাজা ও প্রজার মধ্যে একদল শক্তিশালী মধ্যবর্তীর আবির্ভাব হল। ভূ-সম্পত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ক্রমশ যেমন বাড়তে থাকল ততই তাদের মধ্যে অনেকে ধীরে ধীরে নিজস্ব পুরোহিতবৃত্তি পরিত্যাগ করে মূল মনোযোগ এবং কর্মশক্তি ভূ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণেই নিযুক্ত করতে থাকলেন। ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম অপেক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ ক্রিয়াকর্মই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেতে থাকল। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল সর্বব্যাপ্ত কর্মকুশলতা মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের এইরূপ ভূমিদান করার ফলে মৌর্যোত্তর এবং গুপ্ত-যুগে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে রাজশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ হতে থাকল। রাজস্ব আদায়ের কাজ, বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়, কৃষি ও খনিসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ আরোপ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি এবং প্রতিরক্ষা যা এ পর্যন্ত রাজকর্মচারীদের দ্বারা প্রতিপালিত হত, ধাপে ধাপে তা পরিত্যাগ করা সুরু হল। প্রথমতঃ পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে এবং পরে যুদ্ধজীবী সম্প্রদায়ের হাতে সেগুলি চলে যেতে থাকল।

গুপ্তদের কালে বঙ্গদেশে ও মধ্যভারতে প্রদত্ত ভূমিদানের ক্ষেত্রে দানগ্রহীতাকে ভূমিরাজস্ব ভোগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দান বিক্রয় অথবা

১। অর্থশাস্ত্র, অ ২, শ্লোক ১

২। পা-টে-সো, পালি ইংলিশ ডিক্সনারি, 'ব্রহ্মদেয়' শব্দ

ভূমির স্বত্ব হস্তান্তরের অধিকার তাদের দেওয়া হয় নি। মধ্যভারতে ইন্দোরে এইরূপ হস্তান্তরের অধিকার দানের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গুপ্তসম্রাটের অধীনস্থ সামন্ত মহারাজা স্বামীদাস কর্তৃক জনৈক বণিককে[১] এইরূপ ভূমিদান করার অনুমতি দেওয়া হয়। তার বিবরণ ৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে পাওয়া যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে নিজ অধিকার সীমার মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তির ধর্মীয় দান অনুমোদন করবার অধিকার স্বামীদাসের ছিল। এটাও স্বতঃসিদ্ধ যে সামন্ত রাজা হিসাবে স্বামীদাসের নিজেরও সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুদান দেবার অধিকার ছিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজন্য যেমন পরিব্রাজক ও উচ্চকল্পও অনেক গ্রামদান করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউ যে কখনো রাজকীয় জমি হস্তান্তর করেছিলেন এমন কোনো প্রমাণ মেলে না। অতএব এঁদের প্রদত্ত দানগুলি উপসামন্তীকরণের প্রকৃত উদাহরণরূপে গণ্য হতে পারে না। যাই হোক ইন্দোরে প্রদত্ত দানটি দানগ্রহীতাকে এই অধিকার দিয়েছিল যে ততদিনই সে ভূমির ভোগদখল, চাষ করা অথবা কাউকে দিয়ে করানো ইত্যাদির অধিকারী থাকবে যতদিন সে 'ব্রহ্মদেয়'র শর্তগুলি পালন করবে।[২] এই সর্ত স্পষ্টত দানগ্রহীতাকে দানলব্ধ ভূমিতে প্রজা বসানোর সুবিধা দিয়েছে। এই দানটিই সম্ভবতঃ ভূমির উপসামন্তীকরণের প্রথম শিলালৈপিক নিদর্শন। অবশ্য দেশের অন্যান্য অংশে এইরূপ দানের কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। তবে আমরা এখান থেকেই ভূমির উপসামন্তীকরণের প্রথার সূত্রপাত দেখি যা পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যভারতের পশ্চিম প্রান্তে প্রচলিত ছিল। এর দ্বারা ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে বলভী শাসকদের প্রদত্ত ভূমিদানের বৈশিষ্ট্যও পরিস্ফুট হয়।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে গুপ্তসাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমিস্বরূপ আধুনিক উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভূক্ত এলাকাগুলি থেকে রাজকীয় অনুমতি ব্যতীত কোনো সামন্তপ্রধানের দ্বারা প্রদত্ত কোনো গ্রাম বা ভূমি দানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এ ধরণের ভূমিদান এই অঞ্চলের বহির্পরিধিস্থ স্থানে সঙ্ঘটিত হয়েছে। গুপ্তসম্রাটের প্রতি এই সব এলাকার প্রধান সামন্তদের নামমাত্র আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। গুপ্তসম্রাটদের রাজত্বের শেষভাগে তাঁদের সাম্রাজ্যের কেন্দ্রেই অবশ্য এইরূপ দানপ্রথার প্রচলন হয়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক গয়া জেলায় কুমারামাত্য মহারাজ নন্দন একটি গ্রামদান

১। এ. ই., XV, নং ১৬, প ১-৯। দাতা স্বয়ং বণিক অথবা অন্য কেউ তা সঠিক বোঝা যায় না।

২। "উচিতয়া ব্রহ্মদেয় ভুক্তয়া ভুঞ্জতঃ কৃষতঃ কৃষাপয়তশ্চ।" ঐ, প ৬-৭

করেছিলেন।[১] অথচ তার আগে একমাত্র গুপ্তসম্রাটদেরই দান দেবার এই বিশেষাধিকার ছিল।

দানলব্ধ জমি ভোগের পরিবর্তে সনদ অনুযায়ী পুরোহিতগণ দাতা এবং দাতার পূর্বপুরুষদের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান কর্মে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু বৃত্তি ভোগকারী পুরোহিতদের ধর্মনিরপেক্ষ বাধ্যবাধকতার কোনো উল্লেখ বিরল। বাকাতক রাজা দ্বিতীয় প্রবরসেনের পৃথক তাম্রপত্রটি এর একমাত্র উদাহরণ। এই তাম্রপত্রে উল্লেখ আছে যে এক হাজার ব্রাহ্মণকে একটি গ্রামদান করা হয়েছিল এবং তাদের উপর বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছিল।[২] বিধিনিষেধগুলি এই যে তাঁরা রাজ্য ও রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, চুরি, ব্যভিচার, ব্রহ্মহত্যা, রাজাকে বিষ প্রয়োগ ইত্যাদিতে লিপ্ত হতে পারবেন না। অধিকন্তু তাঁরা অন্য গ্রামের প্রতি কোনো অন্যায় আচরণ করতে পারবেন না।[৩] অবশ্য এ সমস্তই ছিল নেতিবাচক কর্তব্য-- এর দ্বারা এটাই অনুমিত হয় যে পুরোহিতবৃন্দ তৎকালে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করে জমি ভোগ করতে পারতেন। জমিদানের অন্যান্য দলিলে বোধ করি ধর্মীয় বৃত্তিভোগী পুরোহিতদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত কৃত্যগুলি স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এটা স্বাভাবিক যে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অধিকারভুক্ত গ্রামগুলির আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। সেখানকার অধিবাসীদের নিজ নিজ বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্মে লিপ্ত রাখতেন এবং রাজা যিনি গুপ্তযুগ থেকে বিবিধ দেবগুণে বিভূষিত বলে বিবেচিত হতেন তাঁর প্রতি প্রজাদের অনুগত থাকতে অনু-প্রাণিত করতেন। এইভাবে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের উদারহৃদয় দাতা এবং পৃষ্ঠপোষকদের যথেষ্ট প্রতিদান দিতেন। সুতরাং দাতাদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন দানগুলি যে শুধু ধর্মীয় উদ্দেশ্যসাধন করত এ কথা মনে করা ভুল হবে। পুরোহিতগণ অবশ্য দাতাদের এবং তাদের পূর্বপুরুষদের পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য ক্রিয়াকর্ম করতেন, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বিশপগণের ন্যায় সৈন্য সরবরাহ করতেন না। অবশ্য জনগণকে আচার-আচরণে এবং বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি অনুগত রাখতে পারলে সাময়িকভাবে সাহায্য করার প্রয়োজনই বা কোথায় ?

গুপ্তযুগে সামরিক অথবা প্রশাসনিক কার্যের জন্য পদাধিকারীদের ভূমিদানের কোনো শিলালৈপিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না—যদিও এরূপ সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। যদি আমরা স্মৃতি গ্রন্থাদি অনুসরণ করি

১। জা. অ. স. ব. (১৯০৯) ১৬৪, এ. ই., X, ১২
২। ক. ই. ই., iii, নং ৫৫
৩। ঐ, প ৩৯-৪০

তা হলে দেখব যে দশমিক পদ্ধতিতে প্রগঠিত তহশীলদারী ও প্রশাসনিক বিভাগের প্রধানদের ভূমিদানের দ্বারা পারিশ্রমিক দেওয়া হত। দশমিকপ্রথায় আঞ্চলিক সীমা নির্ধারণের প্রথম পরিকল্পনা করেন কৌটিল্য। তিনি ৮০০, ৪০০, ২০০, ১০,[১] এমন কি ৫টি গ্রামের এক একটি একক গঠনের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন এবং পদাধিকারীদের পঞ্চগ্রামী, দশগ্রামী, গোপস্থানিক, সমাহর্তা[২] ইত্যাদি নামকরণ করেছিলেন। নতুন ব্যবস্থায় সমাহর্তাকে নগদ বেতনদানের ব্যবস্থা ছিল।[৩] এবং গোপ ও স্থানিককে তাদের পারিশ্রমিকরূপে ভূমিদানের ব্যবস্থা ছিল। এই ভূমি অবশ্য তারা বিক্রয় অথবা অন্য কোনোপ্রকারে হস্তান্তরের অধিকারী ছিল না।[৪] এটা প্রতীয়মান হয় যে এই ভূমিবৃত্তি তাদের নিয়মিত নগদ পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত ছিল। কৌটিল্যের ব্যবস্থায় তাই সামন্তপ্রথার লক্ষণ অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু এই প্রথা যে খ্রীষ্টীয়যুগের প্রথমদিক থেকেই শক্তিশালী হতে আরম্ভ করেছিল তার প্রমাণ মনুস্মৃতিতে পাওয়া যায়। মনু দশমিকপ্রথা রক্ষা করেন এবং ১০, ২০, ১০০ এবং ১০০০ গ্রামের এক-একটি প্রসাসনিক এককের ব্যবস্থা দেন।[৫] কিন্তু তিনি বেতনদানের পদ্ধতির পরিবর্তন করে প্রধান পদাধিকারীকেও ভূমিদানের দ্বারা বেতনদানের সুপারিশ করেন। এই নিয়মটি কৌটিল্যের প্রদত্ত ব্যবস্থার একেবারে বিপরীত কারণ তিনি প্রায় সকল স্তরের পদাধিকারীকেই নগদ বেতনদানের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। ১, ১০, ২০, ১০০ অথবা ১০০০[৬] গ্রামের রাজস্ব আদায়কারী (রাজ প্রদেয়নী) এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মচারীদের মনুস্মৃতি নগদ মুদ্রায় বেতনদানের পরিবর্তে ভূমিবৃত্তি দানের ব্যবস্থা দিয়েছেন।[৭] গুপ্তদের কালে প্রামাণ্য বলে বিবেচিত বৃহস্পতি রচিত[৮] শাস্ত্রেও এই নিয়মের পুনরুল্লেখ আছে। গুপ্তযুগীয় কোনো শিলালিপিতে এই ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু পাল শিলালিপিতে দেখা যায় যে এইরূপ রাজস্ব আদায়কারী পদাধিকারীকে গ্রামপতি (একটি গ্রামের অধিপতি) এবং দশগ্রামিক (দশটি গ্রামের অধিপতি) আখ্যা দেওয়া হত। পরবর্তী পদবীটি মনুরচিত[৯] শাস্ত্রে উল্লিখিত পদবীর অনুরূপ। প্রাচীনকালে জমির উপর ধার্য রাজস্বই

১। অর্থশাস্ত্র, অঃ ২, শ্লোক ১
২। ঐ, ২, ৩৫
৩। ঐ, ৫, ৩
৪। ঐ, ২, ১
৫। মনুস্মৃতি, অঃ ৩, শ্লোক ১১৫-৭
৬। ঐ, অঃ ৭, শ্লোক ১১৮-৯
৭। ঐ, ১১৫-২০
৮। অঃ ১৯, শ্লোক ৪৪
৯। হিষ্ট্রী অফ বেঙ্গল, অঃ ১, শ্লোক ২৭৭

রাজ্যের মুখ্য আয় ছিল এবং রাজার প্রতিনিধি প্রত্যক্ষভাবে এই কর আদায় করতেন অথবা 'গ্রামভোজক' বা 'গোপ' অর্থাৎ গ্রামপ্রধানদের দ্বারা এই কর আদায় করা হত। এই উদ্দেশ্যে কৌটিল্য প্রতিটি পরিবারের লোকসংখ্যা এবং সম্পত্তির পরিমাণ তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১] এই ব্যবস্থার দ্বারা করধার্য সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় এবং কর আদায়ের জন্য কত কর্মচারী দরকার তাও নির্ধারণ করা সম্ভব। চীনা পরিব্রাজকের বিবরণ থেকে এইরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে গুপ্তকালে কর আদায়ের কিছুটা ভার সামন্তদের উপর দেওয়া হয়েছিল। ফলে পরিবারের লোকসংখ্যা ইত্যাদির বিবরণ রাখার প্রয়োজন হত না। পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ফা-হিয়েন গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ মধ্যদেশের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন "তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা তালিকাভুক্ত করাতে হত না বা কোন সরকারী নিয়মপালনও করতে হত না।"[২] এই বিবরণ গুপ্তসাম্রাজ্যে রাজস্ব আদায়ে কেন্দ্রীয় অধিকারের এবং প্রশাসনযন্ত্রের দুর্বলতার নির্দেশক। সপ্তম শতাব্দীর প্রশাসন ব্যবস্থার অনুরূপ চিত্র পাই হুয়েন স্যাঙের বিবরণীতে। তিনি লিখেছেন "যেহেতু সরকার উদার, রাজকর্মচারীর সংখ্যাও অত্যন্ত কম, পরিবারগুলি তালিকাভুক্ত করা হয় না।"[৩] অতএব চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, পরিবার-গুলির তালিকাভুক্তির কোনো প্রয়োজন ছিল না—ফলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, চাষীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কর আদায়ের জন্য সরকারের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। সম্ভবতঃ এই দায়িত্বটি সরকার ও চাষীর মধ্যবর্তী কেউ গ্রহণ করেছিল। এটিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সামন্তীকরণের পূর্বসূচনা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

গুপ্তকালের পর পদাধিকারীদের বেতনদানের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয়। কৌটিল্যের প্রামাণিকতায় নির্ভর করলে দেখা যায় যে, মৌর্যকালে নূতনব্যবস্থায় মাত্র কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ সরকারী কর্মচারীকে বেতন দেওয়া হত নগদ মুদ্রায়, সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৪৮০০০ পণস্ এবং নিম্নতম বেতন ছিল ৬০ পণস্।[৪] সম্ভবতঃ এটা ছিল মাসিক বেতন। ভৃত্যদের ভরণ-পোষণ বিষয়ক 'ভৃত্যভরণীয়'ম শীর্ষক অধ্যায়ে গরিষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ সর্বপ্রকার রাজকর্মচারীর বেতনমানের উল্লেখ আছে। কিছু পদাধিকারীর নাম উল্লেখ করে অন্যান্য সমমর্যাদার অধিকারীগণকে

১। অর্থশাস্ত্র ২, ৩৫

২। স্যামুয়েল বীল, ট্রাভেলস্ অফ ফা-হিয়েন এ্যাণ্ড সুঙ্গ ইউন, পরিচ্ছেদ ১৬, পৃঃ ৬৭। চাইনিজ লিটারেচার ১৯৫৬, নং ৬, ১৫৪ তে এর অনুবাদ দেওয়া হয়েছে—ঐ সকল ব্যক্তি কর অথবা কোনোপ্রকার আধিকারিক বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত।

৩। ওয়াটস্, উয়ান, চুয়াংস ট্রাভেল ইন ইণ্ডিয়া I, ১৭৬

৪। অর্থশাস্ত্র, অঃ ৫, শ্লোক ৩

সম-বেতনদানের সুপারিশ করা হয়েছে।[১] কিছুসংখ্যক উচ্চ-পর্যায়ভুক্ত যাজকদের যেমন ঋত্বিক, আচার্য এবং পুরোহিত যাঁদের ৪৮০০০ পণস্ বেতন অনুমোদন করা হয়েছে তাঁরাও নতুন ব্যবস্থায় 'ব্রহ্মদেয়' ভূমিলাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন।[২] আবার নতুন ব্যবস্থায় কিছু মধ্যবর্গীয় কর্মচারীদের যেমন হস্তি-শিক্ষক, চিকিৎসক, অশ্ব-শিক্ষক যাদের বেতন ২০০০ (পণস্?) নির্ধারিত ছিল তাদেরও ভূমিলাভের যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। অবশ্য এই বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করার অধিকার তাদের দেওয়া হয় নি।[৩] অতএব কিছু কর্মচারী যাদের নগদ মুদ্রায় বেতনদানের অতিরিক্ত ভূমিদানও করা হত, তাদের ছাড়া অন্য সকলকে নগদ মুদ্রায় বেতনদানের রেওয়াজ ছিল। প্রকৃতপক্ষে কৌটিল্যানুসারী রাজ্যে সমস্ত উচ্চ-পদাধিকারীকেই নগদ মুদ্রায় বেতনদানের প্রথা ছিল। খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয়। আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে সঙ্কলিত মনুস্মৃতিতে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের ভূমিদানের দ্বারা পারিশ্রমিক দানের উল্লেখ আছে।[৪] গুপ্তসাম্রাজ্যের আইন-ব্যবস্থাদানকারীরা এই ব্যবস্থারই পুনরুল্লেখ করেছেন। পঞ্চম শতাব্দীতে বৃহস্পতি 'প্রসাদলিখিতে'র (অনুগ্রহের লিপি) সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে-কোনো কর্মচারীর সেবায় বা বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাকে একটি জেলা বা অনুরূপ ভূমিদান করে থাকেন।[৫] গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কর্মচারীদের বেতনদান পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই, কারণ চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণীতে এই বিষয়ের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। ফা-হিয়েনের একটি অনুচ্ছেদে লেগ্ উল্লেখ করেছেন "রাজার দেহরক্ষী এবং পরিচারকগণ নিয়মিত বেতন পেত।"[৬] কিন্তু বীল আবার এটির অন্যভাবে অনুবাদ করে লিখেছেন "রাজার প্রধান কর্মচারীদের রাজা রাজস্ব নির্ধারিত করেছিলেন।"[৭] অধুনা একজন চীনা পণ্ডিত আলোচ্য অনুচ্ছেদটির অনুবাদ করে লিখেছেন "রাজার পরিচারক রক্ষী এবং অনুচরদের সকলেই পারিশ্রমিক এবং অবসর ভাতা পেয়ে থাকেন।"[৮] শেষোক্ত অনুবাদটিকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করলে পারিশ্রমিক শব্দটির ব্যাপক অথ ধরে

১। ঐ অর্থশাস্ত্র, অ: ৫, শ্লোক ৩
২। ঐ
৩। ঐ, অ: ২, শ্লোক ১
৪। মনুস্মৃতি, অ: ৭, শ্লোক ১১৫-২০
৫। ব্যবহার ময়ূখে উদ্ধৃত পৃ: ২৫-৭ (অনু: পি. পি. কানে, এস. জি. পটবর্ধন)
৬। দি রেকর্ড অব বুদ্ধিষ্টিক কিংডম, পৃ: ৫
৭। ট্রাভেলস্ অব ফা-হিয়েন ইত্যাদি পৃ: ৫৫
৮। হো চাংচুন, 'ফাহিয়েনস্ পিলগ্রিমেজ টু বুদ্ধিষ্ট কান্ট্রিজ.' চাইনিজ লিটারেচার, ১৮৫৬, নং ৩, ১৫৪

মনে করা যেতে পারে যে কর্মচারীরা বৃত্তিও ভোগ করত। যাই হোক না কেন এটা স্পষ্ট যে হর্ষবর্ধনের কালে উচ্চ-পদাধিকারীদের নগদ মুদ্রায় বেতন দেওয়া হত না। কারণ দেখা যায় যে তৎকালে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ উচ্চ-রাজকর্মচারীদের বৃত্তিদানের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হত।[১] একস্থানে হুয়েন স্যাঙ্ স্পষ্ট করে লিখেছেন যে, "প্রকাশক, মন্ত্রী, বিচারক এবং পদাধিকারীদের প্রত্যেকের ভরণ-পোষণের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত।"[২] হর্ষের শিলালিপি অনুযায়ী এই উচ্চ-পদাধিকারীগণ 'দুঃসাধ্যসাধনিক', 'প্রমাচার', 'রাজস্থানীয়', 'উপরিক' এবং 'বিষয়পতির' অন্তর্ভূক্ত।[৩] অতএব হর্ষের সময়ে শুধু যে পুরোহিত এবং পণ্ডিতদের ভূমিদান করা হত তাই নয়[৪], উচ্চ-পদাধিকারীদেরও ভূমিদান করা হত। তৎকালীন মুদ্রার দুষ্প্রাপ্যতাও এই ব্যবস্থার সমর্থন করে।

গুপ্তকালের কিছু শিলালিপিতে দেখা যায় যে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থাকে গ্রামদান করা হত, কিন্তু তা ধর্মীয় প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হত। সাতবাহন ও কুষাণদের রাজত্ব-কালে শিল্পীসঙ্ঘকে তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনে নগদ বৃত্তি দেওয়া হত[৫], কিন্তু গুপ্তদের সময়ে কর্মচারী এবং অন্যান্যদের ঐ একই প্রয়োজনে ভূমিদান করা হত। এর একটি প্রাচীন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ৪৯৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যভারতে উচ্চকল্প মহারাজা জয়নাথের প্রদত্ত একটি দানপত্রে।[৬] একজন লিপিকর, তার পুত্র এবং দুই পৌত্রকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একটি গ্রামদান করা হয়েছিল এবং গ্রামবাসীদের এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা বৃত্তিভোগীকে ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ইত্যাদি প্রদান করবে। কিন্তু দাতা চোরকে শাস্তিদানের অধিকার নিজের হাতেই রেখেছিলেন।[৭] এই সুবিধা যে সব সময় ধর্মীয় স্বার্থেই ব্যবহৃত হত তা নয়। বিশেষ করে লিপিকরদের অত্যাচারের কথা ত প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। লিপিকরকে তার পারিশ্রমিকের পরিপূরক বৃত্তি দেওয়া হত কিনা তার ধর্মনিরপেক্ষ সেবার জন্য, সেটা ঠিক স্পষ্ট নয়, কিন্তু সে যে তার পকেট পূর্ণ করার সুযোগের অবহেলা করত না তাতে কোন সন্দেহই নেই।

একই এলাকায় জয়নাথের পুত্র সর্বনাথ কর্তৃক অনেকগুলি অনুরূপ দান দেওয়া হয়েছিল খ্রীষ্টোত্তর ৫১২-৩ সালে গ্রামদান করেছিলেন যার চারটি অংশের মধ্যে দুটির

১। ওয়াটস্, i, ১৭৬
২। এস. বীল (অনু:), সি. য়ু. কী., i, ৪৪
৩। এ. ই, ii, নং ২৯, প ৯
৪। ঐ, i, ৮৭
৫। ঐ
৬। ক. ই. ই., iii, নং ২৭
৭। ঐ, প ৫-১১

অধিকারী ছিল বিষ্ণুনন্দিন, একটির বণিক শক্তিনাগ এবং অবশিষ্টটির কুমারনাগ ও স্কন্দনাগ।[১] গ্রামটিকে উদ্‌বঙ্গ উপরিকর দেওয়া হয়েছিল। গ্রামটিতে নিয়মিত অথবা অনিয়মিত সেনাবাহিনীর প্রবেশাধিকার ছিল না।[২] এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যতিক্রম যা পূর্বোক্ত দানগুলির ক্ষেত্রে লক্ষিত হয় না। এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই দানের প্রত্যক্ষ স্বত্বভোগীগণ ধর্মনিবপেক্ষ গৃহস্থ এবং তাদের বংশধবদের এই দানেব চিরস্থায়ী স্বত্বভোগের অধিকাব দেওয়া হয়েছিল।[৩] কিন্তু প্রকৃত স্বত্বভোগী হলেন দু-জন দেবতা যাঁদের পূজা এবং মন্দির সংস্কারেব জন্য এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এইরূপ চুক্তি ছিল।[৪] যাই হোক না কেন এ কথা স্পষ্ট যে রাজস্বসম্বন্ধীয় ও প্রশাসনিক অধিকার ভোগ করত গৃহস্থ এবং শুধু লভ্যাংশটুকুই দেবমন্দিরের ভোগে লাগত। অর্ধগ্রামের একটি বৃত্তি অনুরূপ সর্তে ঐ একই রাজাব দ্বারা চোড্ডুগোমিক নামক এক ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয়েছিল। এই ব্যক্তিটিও ছিল ধর্মনিরপেক্ষ গৃহস্থ এবং দাতাব সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছিল যে দানটি পিষ্টপুরিকাদেবীর পূজা ও তাব মন্দিব সংস্কারেব কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে।[৫] এই সকল অনুদানগুলি এই ধারণার সৃষ্টি কবে যে ধর্মনিবপেক্ষ ব্যক্তিগণ অনুদত্ত গ্রামগুলিব ব্যবস্থাপনা এবং মন্দিব পরিচালনার ভাব গ্রহণ কবত।

কিন্তু পূর্বোক্ত রাজার প্রদত্ত ৫৩৩-৪ এব একটি দলিল নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ধর্মনিরপেক্ষ গৃহস্থকে স্বাধীনভাবে ভোগ করার জন্যও ভূমিদান কবা হত। এই দলিলে দেখা যায় যে পুলিন্দভট্ট নামক একজন আদিবাসী সদারকে রাজস্বসম্বন্ধীয় এবং প্রশাসনিক ক্ষমতাসহ দুটি গ্রামের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল।[৬] ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রস্তুত দলিলে প্রায়শ ব্যবহৃত 'সসনীকৃত' শব্দটি এই দলিলে ব্যবহার করা হয় নি বরং 'প্রসাদীকৃতো' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই দানটির পরিবতে আদিবাসী প্রধান কুমার স্বামিন্‌কে পিষ্টপুরিকাদেবীর পূজা ও মন্দিব সংস্কাবেব জন্য দুটি গ্রামদান করেছিলেন।[৭] এই হস্তান্তরের পূর্বে পুলিন্দভট্ট যে গৃহীত গ্রাম দুটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষভাবে ভোগ করতেন তা নিশ্চিত। গুপ্তকালে আরও ধর্মনিরপেক্ষ

১। **ক. ই. ই., iii, নং ২৮, প ১-১৭**
২। **ঐ, প ৯-১০**
৩। **ঐ, প ১২-৩**
৪। **ঐ, প ১৩-৬**
৫। **ঐ, নং ২৯, প ১-১২**
৬। **ক. ই. ই., iii, নং ৩১, প ১-১০**
৭। **ঐ, প ১১-৩**

দান হয়ত দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলি ধর্মীয় দানের সঙ্গে অসম্পৃক্ত হওয়াতে সেগুলি প্রস্তর অথবা তাম্রপত্রের ন্যায় কোনো চিরস্থায়ী দলিলে নথীভুক্ত করা হয় নি।

গুপ্তোত্তরকালের উৎকীর্ণ লিপিতে ধর্মনিরপেক্ষ স্বত্বভোগীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের আশরাফপুরের দুটি তাম্রপত্রে (সাধারণভাবে অনুমিত ৭ম-৮ম খ্রীষ্টাব্দ) এইরূপ দানের উল্লেখ আছে।[১] এই দুটিতে উল্লেখ আছে যে বহু ব্যক্তির নিকট হতে ভূমিখণ্ড নিয়ে বৌদ্ধমঠের প্রধানকে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। এটা 'ভোজ্যমান'[২] বা 'ভুজ্যমানক'[৩] শব্দ দুটির দ্বারা অনুমিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি ভূমিখণ্ড পর পর দুই ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত হবার পর বৌদ্ধাচার্য সঙ্ঘমিত্রের মঠে হস্তান্তরিত হয়েছিল।[৪] তাঁদের সকলের নামের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাদের পদমর্যাদা বা ব্যক্তি পরিচয়ের উল্লেখ নেই। যাই হোক একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হয়ত ভরণ-পোষণের জন্য রানীকে ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল।[৫] আরও একটি ক্ষেত্রে রাজসেবার পরিবর্তে কোনো নারীকে ভূমিদান করা হয়েছিল এবং অন্য একটি দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে অধিস্বামীর সেবা করার জন্য সামন্তকে ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল।[৬] এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে কোনো সেবার পরিবর্তে প্রাপ্ত এই ভূমিখণ্ডগুলি নির্দিষ্ট কালসীমার পরে অথবা অন্য কোনো কারণে রহিত করা হয়েছিল, তা না হলে এগুলি এত সহজে হস্তান্তরিত করা যেত না। এটাও স্পষ্ট যে জমির মালিকরা জমির জন্য কোনো ক্ষতিপূরণও পায় নি। এর দ্বারা বোঝা যায় যে ৭ম অথবা ৮ম শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে ভূমি অনুদানের দ্বারা কিছু কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া হত এবং সেগুলির অধিকারস্বত্ব নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত।

ধর্মীয় কার্যসম্পাদনের বেতনরূপে ভূমিদান এবং বৈষয়িক কার্যসম্পাদনের জন্য নগদ মুদ্রায় বেতনদান সমসাময়িক অর্থনৈতিক পটভূমিকায় সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাই, তার কারণ গুপ্তোত্তরযুগে মুদ্রার অপ্রতুলতা। যতদিন মুদ্রার বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল, কুষাণ ও সাতবাহনের আমলে, এমন কি ধর্মীয় সেবার জন্যও নগদ মুদ্রায় বেতন দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা কিছুকাল পর্যন্ত গুপ্তযুগেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরে এই ব্যবস্থা প্রায় উঠেই গেল এবং ধর্মীয় এবং বৈষয়িক উভয়-প্রকার সেবার জন্যই ভূমিদানের দ্বারা

১। মেমোয়ার্স অফ দি এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, i, নং ৬, পৃঃ ৮৬
২। ঐ, পৃঃ ৯০, ফলক 'এ', প ৪
৩। ঐ, প ৫-৬
৪। ঐ, ফলক 'বি', প ৮-৯
৫। ঐ, ফলক 'এ', প ৪
৬। ঐ, প ৪-৫

পারিশ্রমিক দেওয়া হতে থাকল। শিলালিপি থেকেও পূর্বোক্ত ব্যবস্থার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু যদি পুরোহিত ও মন্দিরগুলির ব্যয়নির্বাহের জন্য ভূমিবৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে পদাধিকারীদের জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থার আবশ্যকতা কোথায় ?

গুপ্তকালে প্রশাসনিক পদাধিকারীদের বেতনদানের সমস্যাটি আমরা তাদের পদনাম এবং প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলির আলোকে বিচার করতে পারি। 'ভোগিক' এবং 'ভোগপতিক' এই দুটি পদবীর দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে পদস্থ কর্মচারীগণ প্রজাদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের জন্যই রাজস্ব আদায় করে থাকতেন, প্রজাদের মঙ্গল বিধান ইত্যাদি তাদের গৌণ দায়িত্ব ছিল। কখনও কখনও রাজার অমাত্যরাই ভোগিকের পদ পেতেন।[১] এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা এই ভেবে বিস্মিত হই যে রাজ-অমাত্য বোধ করি অন্য কোনোপ্রকার রাজসেবার পরিবর্তেই এই পদবী এবং পারিশ্রমিক লাভ করতেন। তা ছাড়া ভোগিকের পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। তিন পুরুষ ধরে ভোগিকের পদ অধিকার করার উল্লেখ বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছে।[২] এই সকল কারণগুলি ভোগিককে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে বেশ শক্তিমান অধিস্বামীতে পরিণত করেছিল। বর্ধমানভুক্তিতে রাজা বিজয়সেন[৩] যখন মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপ-চন্দ্রের অধীনস্থ রাজা হিসাবে প্রায় ৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করতেন তখন সেখানকার ১২ জন পদস্থ কর্মচারীর একজনকে ভোগপতিক আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এই পদাধিকারী একজন জায়গীরদার ছিলেন এরূপ অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে। কিছু ভোগপতিক গ্রাম্য জনগণের উপর অত্যাচার করতেন। হর্ষচরিতে উল্লেখ আছে যে হর্ষের সৈন্যাভিযানকালে গ্রামবাসীগণ ভোগপতিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছিল।[৪] নিজ পৃষ্ঠপোষকের প্রশাসনযন্ত্রকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্যই বাণ যে এই সকল অভিযোগকে মূল্য দেন নি তা স্পষ্টই বোঝা যায়। অন্য আর একপ্রকার সামন্ততান্ত্রিক কৃত্যকারী মহাভোগীর কথা উত্তর ভারতের কোনো শিলালিপিতে উল্লিখিত না থাকলেও উড়িষ্যায় প্রাপ্ত কোনো শিলালিপিতে তার উল্লেখ আছে।[৫] কাদম্বরীতে রাজা তারাপীড়ের অন্তঃপুরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বাণ দ্বারপ্রকোষ্ঠে শত শত মহাভোগীর উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন।[৬] অগ্রওয়াল মনে করেন এঁরা সকলে রাজার দানে জীবিকানির্বাহ করতেন।[৭] মধ্যযুগীয় ইউরোপে রাজা অথবা উচ্চ-

১। ক. ই. ই, iii, নং ২৩, প ১৮-২০ ; নং ২৬, প ২২-৩
২। ঐ, নং ২৬, প ২২-৩
৩। সি. ই., পৃঃ ৩৬০, প ৩-৪
৪। ঐ, পাদটীকা ৯
৫। বিনায়ক মিশ্র, মিডাইভাল ডাইনেষ্টিজ অফ উড়িষ্যা, পৃঃ ২৪-৫। শিলালিপি সংখ্যা-১
৬। অগ্রওয়াল, কাদম্বরী, পৃঃ ১৩৩
৭। ঐ

ভূম্যধিকারীর গৃহবাসী অনুচর অথবা যোদ্ধাদের সঙ্গে সম্ভবতঃ এঁদের তুলনা চলে। সম্ভবতঃ গ্রামের রাজস্বের অংশবিশেষ এঁদের দানরূপে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। এঁরা মাঝে মাঝে তাঁদের প্রভুকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কখনও কখনও সমবেতভাবে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হতেন। প্রাচীন কলচুরি শিলালিপিতে ভোগিকপালক[১] নামক পদাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায় যাঁরা সম্ভবতঃ ভোগিকদের তত্ত্বাবধায়করূপে থাকতেন।[২] খ্রীষ্টোত্তর ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে একটি ক্ষেত্রে ভোগিকপালককে 'মহাপীলুপতি' অর্থাৎ গজারোহী সেনাবাহিনীর প্রধানরূপে দেখা যায়।[৩] এই পদ তিনি মহাভোগিকপাল পদমর্যদার জন্য অথবা তার বিপরীত কারণে পেয়েছিলেন ঠিক বোধগম্য হয় না। কিন্তু ভোগিক, ভোগপতিক এবং ভোগিকপালক এই সকল শব্দগুলি সামন্তপ্রথার ইঙ্গিত বহন করে।

জমি যার দখলে থাকে অথবা যে জমি শাসন করে জমিভোগের সেই হয় প্রকৃত অধিকারী, এই সামন্ততান্ত্রিক ধারণা গুপ্তযুগেই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। বৈদিক পরবর্তী শাস্ত্রে দেখি যে বৈশ্যগণ শাসকদের দ্বারা প্রতিপালিত হবে, আবার বৈদিকোত্তর যুগের ধর্মসূত্র বলে যে শূদ্রগণ উচ্চ তিনটি বর্ণের সেবা করবে। অশোকের শিলালিপিতেই প্রথম দেখা যায় যে এলাকাবদ্ধ জমি পদাধিকারীদের ভোগের জন্য—এইরূপ সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হয়েছে। অশোক জনপদকে কয়েকটি 'আহারে' বিভক্ত করেছিলেন।[৪] অধিকারীর পক্ষে সেগুলিই ছিল আহারস্বরূপ। এই 'আহার' আধুনিক জেলা বা তহশীলের অনুরূপ ছিল বলে মনে হয়। এই প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলি যে সাতবাহনদের যুগে এবং পরবর্তীকালে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রেও প্রচলিত ছিল তা প্রাচীন কলচুরি শিলালিপি থেকে জানা যায়।[৫] অবশ্য পরবর্তীকালে এগুলির জন্য সাধারণভাবে অন্য কোনো উপভোগবাচক শব্দ ব্যবহৃত হত।

মনে করা যায় যে ভোগিক শব্দটি 'ভুক্তি' শব্দটির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত[৬]—কিন্তু বঙ্গীয় শিলালিপিতে 'ভুক্তি'র শাসককে উপরিক বলা হত। ভুক্তি শব্দটি গুপ্ত শিলালিপি অনুসারে আঞ্চলিক কেন্দ্রকে সূচিত করে। এই শব্দটি কিছু ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। এই শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ লিপিতে। এটিতে বলা হয়েছে যে কুষাণ শাসকবৃন্দ, সিংহল ও অন্যান্য দ্বীপের

১। ক. ই. ই., iv, নং ১৩. প ৪ ; নং ১৮, প ৯
২। ঐ, ভূমিকা, পৃঃ ১৪১
৩। ঐ, নং ১৩, প ৪
৪। রূপনাথ লঘু স্তম্ভলিপি : সারনাথ সঙ্ঘভেদ স্তম্ভলিপি
৫। ক. ই. ই., iv, ভূমিকা, পৃঃ ১২৪-৫
৬। ঐ, iii, পৃঃ ১০০, পাদটীকা ২

রাজাগণ তাঁদের 'বিষয়' ও 'ভুক্তি'র অধিকার পেতেন আনুগত্য স্বীকার করে এবং বিবাহে কন্যাদান করে।[১] পরে ভুক্তি শব্দটি বৃহত্তর প্রশাসনিক কেন্দ্ররূপে বার বার উল্লিখিত হতে থাকে। 'ভুক্তি' শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'ভোগের জন্য'। শাসকগণ ভূমি ভোগের অধিকারী, এই ধারণা সে যুগে প্রচলিত ছিল।[২] আঞ্চলিক কেন্দ্ররূপে 'ভুক্তি' শব্দটি সেই কেন্দ্রের শাসকবৃন্দের ভোগের জন্যই এটা অনুমান করা যায়।

ভুক্তি শব্দটি ভোগ শব্দটির সঙ্গে তুলনীয়। মধ্যভারতের পূর্বপ্রান্তে ৫০৮-৯'র একটি শিলালিপিতে উল্লিখিত 'মহারাজ শর্বনাথ ভোগে'[৩] এই বাকাংশটির অর্থ নিশ্চিতরূপে এই যে মহারাজ শর্বনাথ দ্বারা ভোগ্য প্রদেশ। এই প্রসঙ্গে ভোগ শব্দটির দ্বারা এই অর্থই ব্যঞ্জিত হয় যে গুপ্তসম্রাটের নামমাত্র অধীনে থেকে সামন্ত সর্বনাথ ভূমি ভোগ করতেন। কিন্তু ভুক্তি শব্দটির অর্থ সম্রাটের প্রত্যক্ষাধীনে থেকে ভূমি উপভোগ। কলচুরিযুগের শিলালিপিতে 'ভোগ' শব্দটির দ্বাবা ভোগিকের অধীনস্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজস্বক্ষেত্রের বোধ জন্মায়।

উত্তর ভারত এবং বাঙ্গলায় 'ভুক্তি' 'বিষয়ে' বিভক্ত ছিল। কিন্তু যদি দামোদরপুরে প্রাপ্ত তাম্রপত্রে উল্লিখিত অনুদানে প্রযুক্ত শব্দাবলীর আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি তাই সঠিক বলে গৃহীত হয়, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে 'বিষয়ে'রও 'ভোক্তা' ছিলেন সেই অঞ্চলের পদাধিকারী। 'অনুবহমানকে কোটিবর্ষবিষয়ে' এই বাক্যাংশের অর্থ ধরা হয়েছে 'সতত সমৃদ্ধিমান জেলা'।[৪] কিন্তু 'অনুবহ'কে বহন অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন। মনুস্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের টীকায় শব্দটি এই অর্থেই গ্রহণ কবা হয়েছে।[৫] অতএব 'অনুবহমানকে বিষয়ে'র অর্থ ভারবহনকারী জেলা—এই অর্থই সঙ্গত। এই ভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায় 'হস্ত্যশ্বজন-ভোগেন' এই শব্দটির মধ্যে। গজারোহী, অশ্বারোহী অথবা পদাতিক সৈন্যসংগ্রহ বা এই তিন বাহিনীর ব্যয় জেলাগুলির শাসককে জোগাতে হত[৬]—এটিই হল 'ভার'।[৭] এর থেকে মনে হয় কোটিবর্ষের 'বিষয়' থেকে শাসনকর্তার সৈন্য প্রতিপালন করে, তাঁর 'ভোগ'র ভার বহন করা হত।

মৌর্যসাম্রাজ্যে 'রাজুক' অর্থাৎ বিভাগের প্রধান পদাধিকারীর নিযুক্তি স্বয়ং সম্রাট

১। সি. ই., পৃঃ ২৫৮, প ২৪
২। 'য়ে ভুক্তানাথৈন্ন'—সি. ই., পৃঃ ৩৯৪, শ্লোক ৪
৩। ক. ই. ই., iii, নং ২৪, প ৪
৪। আর. জি. বসাক, এ. ই., XV, ১৩১, পাদটীকা ২
৫। মনিয়ার উইলিয়াম, সংস্কৃত ইংলিশ ডিক্সনারি
৬। এ. ই., XV, ১৪৪) তে প্রদত্ত অর্থ 'পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গজারোহী সৈনিকদের শাসন শব্দার্থের দিক থেকে নয়, তবে ব্যঞ্জনার্থের দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য
৭। এ. ই., XV, ফলক সংখ্যা ৭, প ২

করতেন, কিন্তু গুপ্তযুগে এই পদাধিকারীরা যাদের 'কুমারামাত্য' বলা হত, 'উপরিক'র দ্বারা নিযুক্ত হত। কুমারগুপ্তের একটি শিলালিপির (৪৪৮ খ্রীঃ) অংশবিশেষের উপর ভিত্তি করে বলা চলে যে বাঙ্গলার একটি জেলার প্রধান পদাধিকারী (কুমারামাত্য) এবং গুপ্তসম্রাটের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং এরূপ অনুমানও করা হয়েছে যে পঞ্চনগরীর কুমারামাত্য যিনি 'ভট্টারকপাদানুধ্যাতঃ'[১] (প্রভুপাদ উৎসর্গীকৃত) বিশেষণে ভূষিত ; স্বয়ং কুমারগুপ্ত দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২] কিন্তু ভট্টারক[৩] উপাধির জন্যই এই ব্যক্তি কুমারগুপ্ত কিনা সন্দেহ হয়। কারণ বাঙ্গলায় প্রাপ্ত পূর্ববর্তী তিনটি শিলালিপিতেই কুমারগুপ্তকে 'পরমভট্টারক'রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] অতএব পূর্বোক্ত গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপিটির দ্বারা এটিই সূচিত হয় যে পঞ্চনগরীর কুমারামাত্য নিজ প্রত্যক্ষ উচ্চতর প্রভুরই সেবক ছিলেন সম্ভবতঃ এই ঊর্ধ্বতন প্রভু পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির প্রধান ছিলেন।

গুপ্তসাম্রাজ্যের কেন্দ্রে অথবা নিকটবর্তী অঞ্চলেই স্বয়ং সম্রাট জেলাধিকারী নিয়োগ করতেন। এই দৃষ্টান্ত অন্তর্বেদী অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার দোয়াবের বিষয়পতি সর্বনাগের নিযুক্তি।[৫] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে বিষয়পতি শব্দটির দ্বারা প্রশাসন বা প্রজাদের কল্যাণ সূচিত হয় না বরং জেলাধিকারী নিজ অধীনস্থ ভূমি ভোগ করতেন[৬] এটাই বোধগম্য হয়। অতএব প্রতীয়মান হয় যে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রাঞ্চল ব্যতীত দূর প্রান্তের জেলাধিকারীদের উপর সম্রাটের প্রত্যক্ষ কোনো প্রভাব ছিল না—এই জেলাধিকারীরা সম্রাট অপেক্ষা তাদের নিকটতম প্রভুর প্রতিই আনুগত্য প্রদর্শন করতেন।

উপরিক কুমারামাত্য এবং বিষয়পতি যে স্বাধীন সামন্তের মত ছিলেন এরূপ মনে করা কিন্তু ভুল হবে। গ্রামে ভূমিদানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কয়েকজন আমলা সম্পৃক্ত থাকতেন। কখনও কখনও এঁদের সংখ্যা ন'জনে দাঁড়াত।[৭] এই অনুদানগুলিতে উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর পদাধিকারীর উল্লেখ আছে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই পদাধিকারীদের পদনামের উল্লেখ যে তাদের পদমর্যাদার ক্রমপর্যায়ানুযায়ী হত তা বলা

১। বৈগ্রাম তাম্রপত্র ; পৃঃ ৩৪২, প ১

২। বি. সি. সেন, সাম হিস্টোরিক্যাল আস্পেক্টস্ অফ দি ইনস্ক্রিপসন অফ বেঙ্গল, পৃঃ ২১১

৩। সি. ই., পৃঃ ২৮০ এবং ২৮৫

৪। সি. ই., পৃঃ ৩২৪, প ১ ; এ. ই., xxiii, নং ৮, প ১০-১ (এই শিলালিপি সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের সঙ্গে সম্পর্কিত) দ্রঃ সি. ই., পৃঃ ৪০৩, প ১

৫। ক. ই. ই., iii, নং ১৬, প ৩-৪

৬। 'অন্তর্বেদ্যাম্ ভোগাভিবর্ধয়ে বর্তমানে।' ঐ, প ৪-৫

৭। ক. ই. ই., IV, নং ৭, প ২-৪

কঠিন। গুজরাটে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে মহাসামন্ত মহারাজ সঙ্গমসিংহ কর্তৃক প্রদত্ত একটি ভূমিদানের প্রসঙ্গে রাজা তাঁর অধীনস্থ রাজস্থানীয়, উপরিক, কুমারামাত্য চাট, ভট ইত্যাদি কর্মচারীদের কিছু আদেশ দিচ্ছেন[১] এইরূপ উল্লেখ আছে। বাঙ্গলার শিলালিপির প্রতি দৃষ্টি রেখে বলা চলে যে উপরিকের স্থান বিষয়পতি ও কুমারামাত্যের উপরে ছিল। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে অনুদান সম্পর্কীয় আদেশের সূচনা উর্ধ্বতন অধিকারীদের দেওয়া হত। এর দ্বারা মনে হয় যে সামন্তরাজা নিজ কর্তৃত্ব বিষয়পতির উপরেও প্রয়োগ করতে চেষ্টা করতেন; যদিও বিষয়পতি ছিলেন উপরিকের দ্বারা নিযুক্ত এবং তাঁরই অধীন।

কালক্রমে অমাত্য ও কুমারামাত্য সামন্তের উপাধিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, অন্তত হর্ষের যুগের অমাত্যদের সম্বন্ধে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে কেননা হর্ষচরিতে অন্তত দুটি স্থলে এমন অমাত্যদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যাঁরা 'মূর্ধাভিষিক্তাশ্চামাত্যারাজনঃ'রূপে বর্ণিত হয়েছেন।[২] অগ্রওয়াল মহাশয়ের মতে এখানে অমাত্য শব্দটির অর্থ সঙ্গী বা সখা হিসাবে গ্রহণ করাই সঙ্গত[৩], মন্ত্রীরূপে নয়। কিন্তু এটিকে কোন উচ্চ-সম্মানের পরিচায়করূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। অগ্রওয়াল মহাশয় আরও বলেন যে রাজকুমারের সম্পর্কিত অধিকারীগণ কুমারামাত্য নামে অভিহিত হতেন।[৪] হতে পারে যে সুরুতে এই রকমই ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কুমারামাত্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদে পরিণত হয়েছিল, যার সঙ্গে রাজকুমারের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মানমর্যাদার দিক থেকে কুমারামাত্য অমাত্যের নীচে ছিল। গুপ্তকালে মন্ত্রী, সেনাপতি, মহাদণ্ডনায়ক, বিষয়পতি এবং অন্য উচ্চ-প্রশাসনাধিকারীগণও কুমারামাত্য নামে অভিহিত হতেন। ধারণা করা যেতে পারে যে অর্থশাস্ত্রে যেমন 'অমাত্য', তেমনি এ ক্ষেত্রে 'কুমারামাত্য' পদাধিকারীদের একটি শ্রেণীমাত্র, যেখান থেকে সমস্ত বড় বড় পদাধিকারীর নিযুক্তি হত। কুমারামাত্য একটি উচ্চ-সম্মানসূচক সামন্ততান্ত্রিক উপাধি যা উচ্চ-প্রশসানাধিকারী মহারাজকেও প্রদান করা হত[৫]—এই অর্থেই কুমারামাত্য শব্দটিকে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। কুমারামাত্যগণ রাজস্বসম্বন্ধীয় কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেতেন কিনা তা অবশ্য বলা কঠিন। কিন্তু গুপ্তসম্রাটদের শাসনকালের শেষাংশে দেখি যে কুমারামাত্য নন্দন নিজ অধিস্বামীর

১। ঐ, নং ১১, প ১-৩

২। "প্রতাভিজনশিলশালিনো মূর্ধাভিষিক্তাশ্চামাত্যারাজনঃ" হর্ষচরিত অফ বাণভট্ট (নির্ণয়-সাগর সং, পৃঃ ১৭৩) অগ্রওয়াল মহাশয়ের অনুসারে যুবরাজ কুমারামাত্য নামে অভিহিত হতো—'হর্ষচরিত এক সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন', পৃঃ ১১২

৩। 'হর্ষচরিত এক সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন', পৃঃ ১১২

৪। ঐ

৫। জা. এ. সো. ব. (নিউ সিরিজ) V, (১৯০৯) ১৭৪

অনুমতি ছাড়াই ভূমিদান করেছেন। এর দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি কুমারামাত্যগণ প্রকৃতপক্ষে গ্রামগুলির শাসনকর্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল এবং গ্রামদানের জন্যও তাদের কারও কাছে অনুমতি নিতে হত না।

গুপ্তকাল থেকে জেলা এবং বিভাগের প্রশাসনকারীদের পদ বংশানুক্রমিক হতে থাকল এবং অন্যদিকে প্রশাসনব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক হয়ে উঠতে লাগল। যদিও কৌটিল্যের মতে পদাধিকারী (অমাত্য) এবং সৈনিকের পদ বংশানুক্রমিক হওয়াই উচিত, সমসাময়িক শিলালিপিতে তার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। গুপ্তযুগীয় শিলালিপি থেকে জানা যায় যে গুপ্তসম্রাটের মন্ত্রী ও সচিবদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল[১] এবং মধ্যভারত[২] ও বৈশালীতে[৩] অমাত্যের পদও ছিল বংশানুক্রমিক। মধ্যভারতে এমন একটি পরিবারের পরিচয় পাওয়া যায় পাঁচ পুরুষ ধরে যারা উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রথমজন অমাত্য, দ্বিতীয়জন অমাত্যভোগিক তৃতীয়জন ভোগিক এবং চতুর্থজন ও পঞ্চমজন মহাসান্ধিবিগ্রহিক[৪] পদের অধিকারী হয়েছিল। ঐ একই অঞ্চলে দুই[৫] বা তিন[৬] পুরুষ ধরে ভোগিক পদ অধিকার করেছিল এমন পরিবারও দেখা যায়। আবার আমরা দেখি যে পুণ্ড্রভুক্তির উপরিক বা শাসক সকলেরই বংশগত উপাধি ছিল 'দত্ত'।[৭] এর থেকে মনে হয় এঁরা সকলেই একই বংশের লোক ছিলেন। সম্রাট পদাধিকারীকে আইনত পদচ্যুত করতে পারতেন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা নিজ নিজ পদে বংশানুক্রমিকভাবে অধিষ্ঠিত থাকতেন। তা ছাড়া একই ব্যক্তিকে একাধিক পদভার দেওয়ার ফলে তার শক্তি ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পেত।

সপ্তম শতাব্দী থেকে পদাধিকারীগণকে উচ্চ-আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি দেওয়া হতে থাকল। ভাস্করবর্মণের কোষাধ্যক্ষ (ভাণ্ডাগারাধিকৃত) দিবাকরপ্রভকে মহাসামন্ত উপাধি দেওয়া হয়েছিল।[৮] অনুরূপভাবে হর্ষবর্ধনের কালেও পদাধিকারীদের মহাসামন্ত উপাধি দেওয়া হত। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে এই সময়ে অধিকারীদের এবং অধিনস্থ সামন্তসর্দারদের আড়ম্বরপূর্ণ 'প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ'[৯] উপাধি

১। সি. ই., পৃঃ ২৮২-৩, প ৬-৭, ক. ই. ই. ই., iii, নং ৬, প ৩-৪
২। ক. ই. ই., iii, নং ২২, প ২৮-৩০
৩। দীক্ষিতার, দি গুপ্ত পোলিটী, পৃঃ ১৪০-৫০
৪। ক. ই. ই., iii, নং ২২, প ২৮-৩০ ; নং ২৩, প ১৮-২০
৫। ঐ, নং ২৭, প ২১-২
৬। ঐ, নং ২৬, প ২২-৩
৭। সি. ই., পৃঃ ২৮৪, প ৩ ; পৃঃ ৩২৪, প ২ ; পৃঃ ৩২৮, প ২
৮। আর. বি. পাণ্ডে, হিস্টোরিক্যাল এ্যাণ্ড লিটারারী ইনস্ক্রিপসন্স, নং ৫৬, প ৫০
৯। ঐ, প ৪৭-৮

দেওয়া হতে লাগল। পূর্ব ভারতে এই উপাধিটি বড় বড় রাজপদাধিকারীদেব দেওয়া হত। ভাস্কর বর্মণের একটি অনুদানের কার্যনির্বাহক প্রাপ্তপঞ্চমহাশব্দ উপাধি পেয়েছিলেন। পশ্চিম ভারতে গুমররাজ দ্বিতীয় ডড্ড এই উপাধি গ্রহণ কবেছিলেন[১] এবং সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় চরণে তিনি এই গৌবব 'সেন্দ্রক'দেব প্রদান করেছিলেন।[২]

দন্তিদুর্গের পূর্বপুরুষ রাষ্ট্রকূট সর্দাব নন্নরাজ তাঁর ৬৩১-২ এর দানপত্রে দাবী করেছেন যে তিনি নিজ পৌরুষেব বলে পঞ্চমহাশব্দ পদবী অর্জন করেছিলেন, এটি তাঁর পূর্বপুরুষদেব অবিগত ছিল না।[৩] এব দ্বাবা প্রতিপন্ন হয় যে অধিস্বামীকে উল্লেখযোগ্য সেবাব দ্বারা যে-কোনো সামন্ত এই পদবীর অধিকারী হতে পারত। দ্বাদশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থ 'মানসোল্লাসে' উল্লেখ আছে যে পঞ্চমহাশব্দ শব্দটি পাঁচটি বাদ্যযন্ত্রেব প্রয়োগ বুঝায়।[৪] জৈন লেখক বরকোট্যাচার্য ও এব উল্লেখ করেছেন এবং জনৈক লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ভুক্ত লেখক শৃঙ্গ, তম্মট, শঙ্খ, ভেরী ও জয়ঘণ্টা[৫] এই পাঁচটি বাদ্যযন্ত্রেব নাম উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম সর্বোচ্চ শক্তিই এই উপাধি ধাবণ করতে পাবতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সামন্তগণও এই উপাধি পেয়েছিলেন।

গুপ্তকালে রাজার দ্বাবা নিযুক্ত গ্রামপ্রধানেবা কার্যতঃ অর্ধসামন্তে পবিণত হয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁবা প্রধানতঃ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিব চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন। মৌর্যকালে কৃষিতত্ত্বাবধায়কগণ রাজ্যেব মঙ্গলেব জন্য যে কাজ করে আসছিলেন সেই কাজই গুপ্তকালে 'গ্রামাহিপত্যাযুক্তক' অর্থাৎ গ্রাম প্রধানেবা নিজ নিজ গোলা ভরার কাজে লাগাতেন।[৬] মধ্যভারতে প্রাপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভেব কয়েকটি শিলালিপিতে আযুক্তকেব উল্লেখ আছে এবং সম্ভবতঃ আযুক্তক গ্রামশাসক ছিলেন।[৭] গ্রামবাসীদের উৎপন্ন ফসলের প্রাপ্ত অংশবিশেষ থেকে তাঁর নিজস্ব ব্যয়নির্বাহ[৮] হত এবং তিনি সম্ভবতঃ আদায়ীকৃত ফসলেব মোটা অংশ রাজাকে পাঠিয়ে দিতেন। লক্ষ্য করবার বিষয় যে তিনি কৃষকরমনীদেরও সম্পূর্ণ নিজেব প্রয়োজনে বেগার খাটাতে পারতেন।[৯] পূর্বতন ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজার প্রয়োজনেই বেগার খাটানো চলত।

১। ক. ই. ই., IV, নং ১৬, প ৩১
২। এ. ই, XXIV, ফলক 'এ', প ১১-২
৩। অলটেকর, দি রাষ্ট্রকূটজ এ্যাণ্ড দেয়ার টাইমস্, পৃঃ ৭
৪। iii, শ্লোক ১৩৩৬
৫। ই. এ., XII, ৯৬
৬। কামসূত্র, অঃ ৫, ৫'৫
৭। ক. ই. ই., IV, নং ৬, প ২ (একটি ভূমি অনুদানপ্রসঙ্গে আযুক্তকের উল্লেখ করা হয়েছে) নং ৭, প ২-৪
৮। কামসূত্র, অঃ ৫, ৫ ৫
৯। ঐ

গুপ্তকালে এক নতুন ধরণের গ্রামের উদ্ভব হয়েছিল, যা রাজার অনুগ্রহের পাত্রদের আশ্রয়স্থলরূপে পরিণত হয়েছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুসারে এই গ্রামগুলিতে বসবাসকারীদের মধ্যে দুষ্ট এবং প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের আধিক্য ছিল, তাদের নিজেদেব কোনো জমিজমা বা চাষ-আবাদ ছিল না এবং তারা অন্যের জমি-জমার সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করত।[১] রাজানুগ্রহপুষ্ট এই সকল ব্যক্তি মধ্যবর্তীর কাজ কবত এবং তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্তবাদী প্রবৃত্তির উদ্বোধকের কাজ করেছিল।

পরাক্রমশালী রাজা ছোট ছোট সর্দারদের পরাজিত করে, এই সর্তে তাদের রাজ্য এবং পদমর্যাদা ফিরিয়ে দিতেন যে তারা আনুগত্য স্বীকার করবে এবং রাজস্ব দেবে। এই নিয়ম সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবে যথেষ্ট সহায়তা কবেছিল। সমুদ্রগুপ্তেব সময়ে এই নিয়ম চরমে পৌছেছিল। তিনি ঘূর্ণিঝড়ের মত বিশাল ভূভাগ জয় করে সেখানে পূর্বোক্ত বাজাদের সঙ্গে আরো ব্যাপকভাবে সম্বন্ধস্থাপন করলেন। এর ফলে সামন্তপ্রথার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল এই প্রথা সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী বংশধরগণও অনুসরণ করেছিলেন। এই শ্রেণীর পরাভূত রাজা বা সদারদের ষষ্ঠ শতাব্দীতে সামন্ত নামে অভিহিত করা হত। মৌর্যকালে এই শব্দটি যে স্বাধীন প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত কৌটিল্যের অথশাস্ত্র এবং অশোকের শিলালিপি থেকে তা স্পষ্টতঃই বোঝা যায়।[২] মৌর্যোত্তর স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিবেশী ভূস্বামীর[৩] অর্থেই শব্দটি ব্যবহাব করা হয়েছে, সামন্ত ভূস্বামীর অর্থে নয়। যদিও অনেক আধুনিক লেখক তাই মনে কবেন।[৪] ফসল, রাজস্ব এবং জরিমানা রাজার পরিবর্তে সামন্ত ভূস্বামী আদায় করবেন মনু (অঃ ৭, ১২৬ এবং ৯) এমন বিধান দিয়েছিলেন এ কথাও ঠিক নয়।[৫]

মনে হয় পঞ্চম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে দক্ষিণ ভারতে অধীনস্থ সর্দারদের অর্থে সামন্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। কারণ শান্তিবর্মণের যুগে (৪৫৫-৭০) এবং পল্লব শিলালিপিতে 'সামন্তচূড়ামণি' এই পদ পাওয়া গিয়েছে।[৬] ঐ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কয়েকটি দানপত্রে অধীনস্থ সর্দারদের অর্থেই শব্দটি

১। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৪৯·৪৯। এই অংশের এম. এন. দত্ত কৃত ইংরেজী অনুবাদ পার্জিটর কৃত অনুবাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক বলে মনে হয়।

২। অর্থশাস্ত্র, 1, ৬ ; স. স., ২, প ৫

৩। মনুস্মৃতি, অঃ ৮, ২৮৬-৯

৪। বি. এন. দত্ত, হিন্দু ল অফ ইনহেরিটেন্স, প ২৭

৫। প্রাণনাথ, ইকনমিক কণ্ডিসন্স ইন এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া, পৃ. ১৬০

৬। আর. বি. পাণ্ডে, হিস্টোরিক্যাল এ্যাণ্ড লিটারারি ইনস্ক্রিপসন্স, নং ২৯, প ৩০.

ব্যবহৃত হয়েছে।[১] উত্তর ভারতে অনুরূপ অর্থে শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় বাঙ্গলার একটি শিলালিপিতে এবং মৌখরী সর্দার অনন্তবর্মণের বরাবর পাহাড়স্থ গুহালিপিতে, যেটিতে অনন্তবর্মণের পিতাকে 'সামন্তচূড়ামণি'রূপে অভিহিত করা হয়েছে।[২] পুরালিপিবিজ্ঞানের দিক থেকেও এই গুহালিপিটিকে হর্ষশিলালিপির (৫৫৪ খ্রীঃ) থেকে প্রাচীন বলে ধরা হয়।[৩] অতএব অনন্তবর্মণের পিতার কালকে ৫০০ শতাব্দীর সমীপবর্তী বলে ধরা যেতে পারে। এই সময়ে মৌখরীরা গুপ্ত-সম্রাটদের সামন্ত ছিল। এর পর সামন্ত শব্দটির গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ দেখি যশোধর্মণের (প্রায় ৫২৫—৩৫) মন্দসোর প্রস্তর স্তম্ভে। এই স্তম্ভলিপিতে যশোধর্মণ সমস্ত উত্তর ভারতের সামন্তদের পরাজিত করবার দাবী করেছেন।[৪] ষষ্ঠ শতাব্দীতে বলভী শাসকগণ মহারাজ ও মহাসামন্তের উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। ক্রমে সামন্ত শব্দটি পরাজিত সর্দারদের ছাড়া রাজপদাধিকারীদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতে থাকল। এইভাবে কলচুরি চেদীযুগের শিলালিপিতে ৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'উপরিক' এবং 'কুমারামাত্যে'র স্থান 'রাজা' ও 'সামন্ত' গ্রহণ করল।[৫] অতঃপর হর্ষবর্ধনের ভূমি অনুদানপত্রে 'সামন্তমহারাজ' এবং 'মহাসমন্ত' শব্দের প্রয়োগ বড় বড় রাজপদাধিকারীদের উপাধিরূপে ব্যবহৃত হতে থাকল।[৬]

সমুদ্রগুপ্তের অধীনস্থ জায়গীরদারদের জন্য সামন্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয় নি। কিন্তু প্রয়াগ শিলালিপিতে তাঁদের সমস্ত দায়দায়িত্বের উল্লেখ আছে যে নিজ নিজ সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়ে বিজিত এবং অধীনস্থ রাজারা সম্রাটকে সমস্ত প্রকার কর প্রদান করবে, রাজাদেশ পালন করবে, বিবাহে নিজ কন্যা সম্প্রদান করবে এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করবে।[৭] বাণই প্রথম লেখক যিনি সামন্তদের দায়দায়িত্বের উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর 'হর্ষচরিতে' সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীগুলির যে টীকা দিয়েছেন, তাতে দেখি যে পুষ্পভূতি নিজ মহাসামন্তদের করদ রাজায় পরিণত করেছিলেন।[৮] সম্রাট সামন্তগণ কর্তৃক প্রশাসিত অঞ্চলের প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় না করে সামন্তদের কাছ থেকেই বার্ষিক কর আদায়

১। 'জার্নাল অফ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী'তে (ভাগ ১ ও ২, এপ্রিল ১৯৬৩) প্রকাশিত "সামন্ত ইটস্ ভ্যারিইং সিগ্নিফিকেন্স ইন দি এনিসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধে এল. গোপাল এই উদাহরণগুলির সঙ্কলন করেছেন।

২। ক. ই ই., iii, নং ৪৯, প ৪

৩। আর. বি. বসাক, দি হিস্ট্রী অফ নর্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১০৫

৪। সি. ই., পৃঃ ৩৯৪, শ্লোক ৫

৫। ক. ই. ই., iv, ভূমিকা পৃঃ ১৪১

৬। এ. ই., i, ৬৭ ; iv, পৃঃ ২০৮

৭। প ২২-৫

৮। 'করদীকৃত মহাসামন্ত', হর্ষচরিত : পৃঃ ১০০

করতেন।[১] সম্রাটের অধীনস্থ সামন্তরা প্রজাদের উপর কর আরোপ অথবা করের হার বৃদ্ধি করতে পারত কিনা তা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু নিজ নিজ এলাকায় কর আদায়ের দায়িত্ব তাদেরই ছিল।

কাদম্বরীতে পরাজিত রাজা (যাঁরা পরাজিত হয়ে অধীনস্থ সামান্তরাজে পরিণত হয়েছিলেন) কর্তৃক সম্রাটকে প্রণামের পঞ্চপ্রকার রীতির উল্লেখ করা হয়েছে। মস্তক অবনত করা, মস্তক অবনত করে চরণ স্পর্শ করা, অবনত মস্তকে চরণতল স্পর্শ করা (অর্থাৎ সম্রাটের পদধূলি গ্রহণ করা) এবং অবশেষে সম্রাটের চরণের নিকট মস্তক স্থাপন—এই পঞ্চপ্রকার প্রণামরীতি বর্ণিত হয়েছে।[২]

সামন্ত সম্রাটকে বার্ষিক কর প্রদানে বাধ্য থাকত। তার এই দায়িত্ব সুস্পষ্ট। তার দ্বিতীয় কর্তব্য সম্রাটের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত থেকে রাজভক্তি প্রদর্শন। এই ভক্তি প্রদর্শনের যে সজীব বর্ণনা বাণ দিয়েছেন তাতে আমরা দেখি যে কি ভাবে পরাজিত মহাসামন্তগণ নিজ নিজ মস্তক থেকে মুকুট ও শিরাবরণ মোচন করে সম্রাটকে অভিবাদন জানাতেন। হর্ষের রাজসভায় এঁদের কেউ কেউ গলায় তরবারি বেঁধে প্রাণভিক্ষা করতেন, আবার কেউ কেউ সমস্ত প্রকার বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে সর্বদা সম্রাটকে করবদ্ধভাবে প্রণাম জানাতেন এবং যতদিন না সম্রাট কর্তৃক ভাগ্য নির্ধারিত হয় ততদিন দাড়ি কামাতেন না।[৩]

সামন্তে পরিণত পরাজিত রাজাদের কাছ থেকে তিন প্রকার সেবা আদায় করা হত। হর্ষের রাজসভায় ঐ ভাবে পরাজিত শত্রু মহাসমন্ত রাজসভায় চামরধারীর কাজ করতেন।[৪] হস্তে বেত্রধারণ করে তাঁরা দরবারে দ্বারপালের কাজও করতেন।[৫] তৃতীয়তঃ তাঁরা রাজার শুভকামনা ও জয় ঘোষণা করে ধ্বনি দিতেন।[৬] বাণ তাঁর কাদম্বরীতে এই বর্ণনা দিয়েছেন।[৭] এই সুস্পষ্ট অবমাননাকে তাঁরা কিন্তু সৌভাগ্য বলেই মনে করতেন।[৮]

বিজেতাকে নিজ কন্যা সম্প্রদানের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে প্রয়াগ শিলালিপিতে উল্লেখ থাকলেও, বাণ এরূপ কিছুর উল্লেখ করেন নি, বরং তিনি লিখেছেন যে পরাজিত সামন্তগণ

১। অগ্রওয়াল, হর্ষচরিত, পৃঃ ২১৭
২। অগ্রওয়াল, কাদম্বরী, পৃঃ ১২৮। অগ্রওয়ালের অনুসারে প্রণামের চতুর্থ ও পঞ্চম রীতিটি 'শেখরীভবত্তপদরজাংসি' (পৃঃ ১২৮) পদের অন্তর্ভুক্ত।
৩। হর্ষচরিত, পৃঃ ৬০
৪। ঐ
৫। ঐ, পৃঃ ১৯৪
৬। অগ্রওয়াল, কাদম্বরী, পৃঃ ১২৭-৮
৭। ঐ
৮। হর্ষচরিত, পৃঃ ৬০

বিজেতাকে নাবালক পুত্র বা উত্তরাধিকারী সমর্পণ করতেন।[1] উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ রাজানুগত্য ও রাজভক্তি প্রদর্শন। অন্যদিকে যখন যশোমতীকে রাজমহিষীপদে অভিষিক্ত করা হচ্ছিল তখন সামন্তপত্নীগণ স্বর্ণকলসে করে জল এনে তাঁকে পবিত্র স্নান করিয়ে রাজসেবার পরিচয় দিয়েছিলেন।[2] সম্ভবতঃ এই সেবা শান্তিকালেই কর্তব্য ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে বাণে সেই সমস্ত সামন্তের দায়দায়িত্বের উল্লেখ পাওয়া যাবা যুদ্ধে পরাজিত হতেন, এবং বাণ এঁদেরকেই 'শত্রু-মহাসামন্ত' নাম দিয়েছিলেন। এরা পরাজিত হবার পরিণামস্বরূপ নানাপ্রকার রাজসেবায় বাধ্য ছিলেন।

শান্তিকালে সামন্তদের প্রশাসন বা ন্যায়বিধান সংক্রান্ত কোনো কর্তব্যপালন করতে হত কিনা তার কোনো উল্লেখ কোনো স্মৃতিগ্রন্থ অথবা হর্ষচরিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা কাদম্বরীতে দেখি যে নিজ ভগ্নি জয়শ্রীর মৃত্যুতে শোকাহত রাজ্যবর্ধন যখন অন্নজল পরিত্যাগ করেছিলেন তখন তিনি প্রধানতঃ সামন্তদের অনুরোধেই অনশন ভঙ্গ করেছিলেন, কারণ সামন্তদের অনুরোধ উপেক্ষাণীয় ছিল না।[3] ব্যক্তিগত বিষয়েই যদি এঁদের পরামর্শ অনুপেক্ষণীয় হয়, তা হলে প্রশাসনিক বিষয়ে তা উপেক্ষা করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে? প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা ত আরও বেশি প্রয়োজন ও প্রত্যাশিত ছিল।

কিছু সামন্ত নিজ নিজ প্রভুর অনুমতি ছাড়া ভূমি অনুদান দিয়ে থাকতেন। বাঙ্গলায় জয়নাগকৃত বপ্পঘোষ অনুদানটিই এই প্রকার দানের প্রারম্ভিক দৃষ্টান্ত। জয়নাগের শাসনকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে এঁর রাজধানী ছিল। ঔদুম্বরিক জেলার মালিক সামন্ত নারায়ণচন্দ্র মহাপ্রতিহার সূর্য-সেনকে এই আদেশ ঘোষণা করতে বলেন যে তিনি ভট্ট ব্রাহ্মণ বীরস্বামীকে বপ্প-ঘোষবাট গ্রামদান[4] করছেন এবং তাম্রপত্রের দ্বারা এই দানকার্য সম্পাদিত করা হয়েছিল।[5] এই প্রথা যে পূর্ব ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে মধ্যপ্রদেশে সামন্ত ইন্দ্ররাজ জনৈক ব্রাহ্মণকে নিজ অধিস্বামীর অনুমতি ছাড়াই একটি গ্রামদান করেন, কারণ দেখা যায় যে দানপত্রে অধিস্বামীর কোনো উল্লেখ নেই।

১। হর্ষচরিত পৃঃ ৪৫
২। ঐ, পৃঃ ১৬৭
৩। ঐ, পৃঃ ১৭৮
৪। এ. ই., XVIII, ৬০-২
৫। ঐ, নং ৭, প ১-৭
৬। ঐ, প ৭-২৪

মনে হয় রাজদরবারে অবস্থানকারী সামন্তদের কতকগুলি সামাজিক কর্তব্য-পালন করতে হত। দ্যূতক্রীড়া, পাশাখেলা, বংশীবাদন, রাজার চিত্রাঙ্কন, সমস্যাপূরণ ইত্যাদি নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে তাঁরা অংশগ্রহণ করতেন।[১] কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে সামন্ত পত্নীদেরও রাজদরবারে উপস্থিত থাকতে হত।[২] এইভাবে দেখা যায় যে শুধু সামরিক বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক ক্ষেত্রেও সামন্তগণকে তাঁদের অধিস্বামীদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হত।

বাণ সামন্ত, মহাসামন্ত, আপ্তসামন্ত, প্রধানসামন্ত, শত্রু-মহাসামন্ত এবং প্রতিসামন্ত এত রকম সামন্তের উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে স্পষ্টতঃই মহাসামন্তের স্থান সামন্তের উপরে ছিল এবং শত্রুসামন্ত ছিল শত্রুরাজা। স্বেচ্ছায় অধিস্বামীর অধীনতা স্বীকারকারী সামন্তকে সম্ভবতঃ আপ্তসামন্ত[৩] বলা হত। প্রধানসামন্ত সম্রাটের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ব্যক্তি যাঁর পরামর্শ তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন না। কিন্তু প্রতিসামন্তের অর্থ অনুমান করা কঠিন।[৪] সম্ভবতঃ প্রতিসামন্ত সম্রাটের প্রতিপক্ষ অথবা শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। যাই হোক এটা স্পষ্ট যে সামন্ত পদটি সু-প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং কমপক্ষে ছয় প্রকারের সামন্ত ছিল।

রাজাদের মর্যাদাও সামন্তদের অপেক্ষা কিছু ভাল ছিল না। তাঁদেরও তিনটি শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে (১) শত্রু-মহাসামন্ত—ইনি নানাভাবে সম্রাটের সেবা করতেন এবং তাঁর প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করা হত (২) মহীপাল—সম্রাটের প্রতাপের সামনে এঁদের অবনত থাকতে বাধ্য করা হত (৩) যাঁরা অনুরাগবশতঃ স্বভাবতই সম্রাটের প্রতি আকৃষ্ট হতেন।[৫] বাণ একস্থানে অনুরক্ত মহাসামন্তের উল্লেখ করেছেন। তার থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে তাঁরা সম্রাটের বিশেষ ভক্ত ছিলেন।

সাধারণতঃ সম্রাটকে সামরিক সাহায্যদানই রাজা ও সামন্তদের প্রধান কর্তব্য ছিল। হর্ষ যুদ্ধযাত্রাকালে নিজ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজাদের প্রেরিত সৈন্য এবং অশ্বসমূহ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।[৬] হিউ-এন্-স্যাঙ হর্ষের সেনাবাহিনীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাকে অতিরঞ্জিত বলে ধরে নিলেও এ কথা সুস্পষ্ট যে এই সৈন্যবাহিনী মৌর্যদের সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। হর্ষের রাজ্য মৌর্যদের অপেক্ষা ছোট, তা ছাড়া রাজ্যের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণক্ষমতাও মৌর্যদের অপেক্ষা কম, তবু এই বিশাল

১। অগ্রওয়াল, কাদম্বরী, পৃঃ ১০০
২। হর্ষচরিত, পৃঃ ১৪৩
৩। ঐ, পৃঃ ১৫৫
৪। "প্রতিসামন্ত চক্ষুষামিব ননাশনিদ্রা কুমুদবলানাম্" হর্ষচরিত, পৃঃ ২১৯
৫। ঐ, পৃঃ ৬০, তুলনীয়, অগ্রওয়ালকৃত হর্ষচরিত, পৃঃ ৪৩
৬। ঐ, পৃঃ ২০৯-১০

সেনাবাহিনী পালন করা কি ভাবে সম্ভব হয়েছিল এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনই বা কি ছিল, তা ভাববার বিষয়। এর এই ব্যাখ্যা হতে পারে যে এই বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়মিত ছিল না, বরং যুদ্ধকালে সামন্তদের কাছ থেকে সংগৃহীত ও একত্রিত বাহিনীমাত্র ছিল। এহোল শিলালিপি থেকেও এই অনুমানটি সমর্থিত হয়। এটিতে হর্ষের প্রবল শত্রু পুলকেশিনের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে হর্ষ নিজ সামন্তদের সংগৃহীত সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সুসজ্জিত ছিলেন।[১] সামন্তদের সৈন্য সরবরাহের উপর নির্ভর করার ফলে সম্রাট তাঁদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলেন এ কথা স্পষ্ট।

হর্ষ তাঁর সামন্তদের তাঁদের দ্বারা আদায়ীকৃত রাজস্ব অনুদান হিসাবে ভোগ করতে দিতেন কিনা তা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু এই অধিকার তিনি 'অগ্রহারিকদের' দিয়েছিলেন যদিও সম্রাটদের প্রতি অগ্রহারিকদের কোনো কর্তব্য বা দায়দায়িত্ব ছিল বলে মনে হয় না। হর্ষচরিতে উল্লেখ আছে যে হর্ষকে স্বাগত অভিনন্দন জানাবার জন্য অগ্রহারিকগণ স্বেচ্ছায় দধি, গুড়, শর্করা ইত্যাদি বদ্ধ আধারে নিয়ে নিজ নিজ গ্রামের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দণ্ডধারীগণ ভয় দেখিয়ে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছিল।[২] সাধারণতঃ তাঁদের এর বেশী করণীয়ও কিছু ছিল না। হর্ষের সৈন্যাভিযান-কালে 'মহত্তর'গণ নিজেদের হাতের কলস উচ্চে উত্তোলন করে সম্রাটকে শুভকামনা জানাতেন।

গুপ্তকাল অথবা গুপ্তোত্তরকালের কোনো স্মৃতিগ্রন্থ অথবা শাস্ত্রে সামন্ত বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদাধিকারীর দায়দায়িত্ব সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। কিন্তু সমসাময়িক কিছু কিছু সাহিত্যগ্রন্থে এগুলির স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘোড়া বিশেষ করে হাতির উপর একছত্র অধিকার হারানোর ফলে, কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকল। প্রাক্‌মৌর্যকালে একমাত্র রাজাই হাতি পালন করতে পারতেন। একটি জাতক কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে ত্রিশটি পরিবারের বসতিপূর্ণ একটি গ্রামকে রাজা একটি হাতি পুরস্কার দিয়েছিলেন।[৩] যেখানে একাধিক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত, সেখানে শাসকপরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে রাজাকে একটি করে হাতি দিতে হত। এর উদাহরণ বিয়াস তটবর্তী ৫০০০ অভিজাতের বসতিপূর্ণ রাজ্য।[৪] মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায়

১। "সামন্ত সেনামুকুটমণিময়ূখাক্রান্তপাদারবিন্দু।' হর্ষচরিত, পৃঃ ৪৩
২। ঐ; পৃঃ ২১২
৩। জাতক, 1, পৃঃ ২০০
৪। স্ট্রাবো, অঃ ১৫, ১৭ ; ম্যাক্রিণ্ডল, এনিসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এ্যাজ ডেসক্রাইবড ইন ক্লাসিক্যাল লিটারেচার, পৃঃ ৪৫

যে কোনো সাধারণ ব্যক্তি হাতি বা ঘোড়া রাখতে পারত না ; কারণ ঐ দুটি প্রাণী রাজার বিশেষ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত।[১] মেগাস্থিনিসের উদ্ধৃতি দিয়ে স্ট্র্যাবো বলেন হাতি ও ঘোড়ার রাজকীয় আস্তাবল এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্য রাজকীয় অস্ত্রাগারের ব্যবস্থা ছিল, কারণ সৈন্যদের হাতি-ঘোড়া পশুশালায় এবং অস্ত্রশস্ত্র অস্ত্রাগারে ফিরিয়ে দিতে হত।[২] কৌটিল্য ঘোড়া এবং হাতির তত্ত্বাবধায়কের পদের উল্লেখ করেছেন।[৩] এর থেকে বোঝা যায় যে দুর্গের উল্লেখযোগ্য হাতি ও ঘোড়া ছিল। প্রাকমৌর্য ও মৌর্যকালে বেসরকারী ব্যক্তি হাতি পালন করতে পারতেন না। রঘুবংশেও হাতির উপর রাজকীয় একচ্ছত্রাধিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়, এটিতে বলা হয়েছে যে পৃথিবীকে রক্ষা করার বেতনরূপে প্রাপ্ত বস্তুসমূহের মধ্যে জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত হাতিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৪] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌর্যোত্তরকাল থেকে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। মিলিন্দ পঞ্হো গ্রন্থে আছে যে উৎকৃষ্ট হাতি-ঘোড়া রাজার সম্পত্তি ছিল।[৫] এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে রাজা কেবল উৎকৃষ্ট হাতি-ঘোড়াই রাখতেন। গুপ্তযুগে এই অধিকারের ভিত্তি আরও শিথিল হয়ে গিয়েছিল। নারদ এই বিধান দিয়েছেন যে হাতি ও ঘোড়ার উৎপাতের জন্য তাদের মালিকদের কোনো জরিমানা হওয়া উচিত নয় কারণ হাতি-ঘোড়া প্রজাদের রক্ষকস্বরূপ।[৬] সম্ভবতঃ বেসরকারী ব্যক্তিগণও হাতি-ঘোড়া রাখত। যদিও বৃহস্পতি তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরূপে হাতি-ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়কের উল্লেখ করেছেন।[৭] সমসাময়িক শিলালিপিতেও অনুরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার এও দেখি যে বড় বড় পদাধিকারীদের হাতি-ঘোড়া রাখাটা রাজশক্তির পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করা হত। গুপ্তোত্তরকালের গ্রন্থ 'কামন্দক-নীতিসার'-এ বলা হয়েছে যে রাজ্যের মহামাত্যগণের এবং পুরোহিতগণের হাতি-ঘোড়ার বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।[৮] রাজার হিতের জন্য সামরিক শক্তির উপর নজর রাখা উচ্চ-

১। স্ট্র্যাবো, অঃ ১৫, ৪১-৩ ; ম্যাক্রিডল, এানসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এ্যাজ ডেসক্রাইবড বাই মেগাস্থিনিস্ এ্যাণ্ড এরিয়ান, পৃঃ ৯০

২। স্ট্র্যাবো, অঃ ১৫, ৫২ ; ম্যাক্রিডল, এনিসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এ্যাজ ডেসক্রাইবড ইন ক্ল্যাসিক্যাল লিটারেচার, পৃঃ ৫৫

৩। অর্থশাস্ত্র, II, ৩০-২

৪। ১৭.৬৬

৫। সম্পাদনা—ভি. ট্রেঙ্কনার, পৃঃ ১৯২

৬। XI, ৩২, ভুঃ ৩০

৭। 'সংস্কারকাণ্ড', পৃঃ ৩০১, শ্লোক ৩০৫

৮। 'কামন্দকনীতিসার', xii. ৪৪

রাজপদাধিকারীদের পক্ষে আবশ্যক ছিল, কিন্তু প্রজার প্রতি ব্যবহারের পক্ষে তাঁরা পূর্বাপেক্ষা অধিক স্বাধিকার লাভ করেছিলেন।

মৌর্যযুগের রচনা গৌতমস্মৃতি কোনো ঘোড়ার দ্বারা কারো ক্ষতিসাধন হলে মালিকের জরিমানার বিধান দিয়েছেন।[১] কিন্তু নারদ হাতি-ঘোড়ার মালিককে এই বলে রেহাই দিয়েছেন যে হাতি-ঘোড়া প্রজাদের রক্ষক।[২] কিন্তু এই গ্রন্থেরই অন্য অংশে বর্ণিত আছে যে ঘোড়ার মালিক যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘোড়ার দ্বারা কারো কোনো ক্ষতিসাধন করে তবে সে দণ্ডনীয় হবে।[৩] এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে সম্ভবতঃ স্থানীয় সদারগণই গুপ্তকালে হাতি ঘোড়া পালন করতেন এবং এঁরাই প্রজাদের স্বাভাবিক রক্ষক বলে স্বীকৃত হতেন। এইভাবে আমরা দেখি যে পূর্বে যে কাজ রাজার নিযুক্ত পদাধিকারী করতেন সেই কাজ স্থানীয় সদারদের হাতে চলে গিয়েছিল।

রাজা ও সামন্তদের মর্যাদা নির্ভর করত তাদের অধীনস্থ হাতি-ঘোড়ার সংখ্যার উপর। ৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি চৈনিক বিবরণ অনুসারে মধ্যভারতের রাজার নিকট ৯০০টি হাতি ছিল এবং সেই সময় বড় বড় সর্দারদের কাছে মাত্র ২০০ থেকে ৩০০টি হাতি ছিল।[৪] দক্ষিণ ভারতের রাজার কাছে ছিল ৮০০টি, পশ্চিম ভারতের রাজার নিকট ৫০০-৬০০ এবং উত্তর ভারতের রাজার নিকট মাত্র ৩০০টি হাতি ছিল।[৫]

বর্বর জাতির আক্রমণের ফলে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হওয়াতে সবলের ছত্রছায়ায় দুর্বলের আশ্রয়গ্রহণের যে প্রথা ইউরোপে সু-প্রচলিত ছিল, ভারতে তার বিশেষ প্রচলন হয় নি। তথাপি তৃতীয় শতাব্দীর সমসাময়িক বিষ্ণুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে সম্পদ ও আত্মরক্ষার জন্য গৃহস্থকে নিজ প্রভুর নিকট আবেদন জানাতে হত, কিন্তু, সবলের আশ্রয় গ্রহণ করার দৃষ্টান্ত বিরল। বিহারের হাজারিবাগ জেলায় অষ্টম শতাব্দীর সমসাময়িককালে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি অনুসারে, তিনটি গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ নিজেদের জনৈক বণিকের নিকট সমর্পণ করেছিল এবং ঐ বণিক গ্রামবাসীগণ কর্তৃক রাজাকে প্রদেয় 'অবলগন'র দাবী মিটিয়ে দিয়ে গ্রামবাসীদের রক্ষা করেছিলেন।[৬] রাজার অনুমতি নিয়ে গ্রামবাসীগণ বণিককে তাদের রাজা হওয়ার

১। সম্পাদনা—এ. এফ. স্টেন্‌জলার, XII, ২৪
২। নারদস্মৃতি, XI, ৩২
৩। ঐ, XV, XVI, ৩২
৪। জান-ইউন-হুয়া, হুই চাও এ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্ক : এ রিএ্যাসেসমেন্ট দি ইণ্ডো-এসিয়ান কালচার—XII, ১৮৪
৫। ঐ
৬। "অথযোগক্ষেমার্থমীশ্বরমধিচ্ছেৎ।"

আবেদন জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান।[১] মূলতঃ কানাড়া ভাষা থেকে উদ্ভূত শব্দ 'অবলগ' বা 'ওলগ'র অর্থ সামরিকভাবে অথবা অন্যভাবে প্রভুর সেবা করা।[২] ৮ম শতাব্দী থেকে কর্ণাটগণ পালদের সেনাদলে কর্মনিযুক্ত থাকায় আমরা অনুমান করতে পারি যে তারাই উত্তর ভারতে শব্দটি আমদানী করেছিল। কিন্তু আলোচ্য শিলালিপিটিতে শব্দটি ঐ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। এই শিলালিপিটিতে দেখা যায় যে মগধের রাজা আদিসিংহ তিনটি গ্রাম থেকে 'অবলগন' দাবী করছেন[৩]—স্পষ্টতঃই তিনি নগদে এবং দ্রব্যে বকেয়া কর দাবী করছেন। এখানে অবলগনের অর্থ কোনোপ্রকার সামন্তিক সেবকরূপে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কিন্তু যখন বণিক উদয়মান গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে রাজার অবলগনের দাবী মিটিয়ে দিলেন তখন রাজার সঙ্গে বণিকের চুক্তিটিকে ইউরোপের অধিস্বামীর সঙ্গে সামন্তের চুক্তির অনুরূপ দৃষ্টান্ত বলে গ্রহণ করা যায়।[৪] পরে উদয়মান নিজের ভাইকে একটি গ্রামদান করে তাকে উপ-রাজার পদ প্রদান করেন। এটি ধর্মনিরপেক্ষ উপসামন্তীকরণের একটি স্পষ্ট নিদর্শন। অর্থ যাই হোক না কেন 'অবলগন' শব্দটির উল্লেখ প্রাক্-মধ্যকালীন কোন ভূমিদানপত্রে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় অষ্টম শতাব্দীর দুটি প্রাকৃত গ্রন্থে এবং ১২শ ও ১৪শ ও এমন কি ১৬শ শতাব্দীর গ্রন্থাদিতে।[৫] কিন্তু আলোচ্য শিলালিপিটিতে আনুগত্য ও উপ-সামন্তীকরণের যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা সামন্তবাদের স্পষ্ট নিদর্শন এবং উক্ত দুটি বৈশিষ্টই প্রশাসনিক ব্যাপারে কেন্দ্রকে ক্রমশ দুর্বলতর করে তুলেছে।

কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল এবং স্থানীয় প্রভুর শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নারদের বিধান অনুসারে যারা রাজার বিরোধিতা করে, রাজস্ব আদায়ে বাধাপ্রদান করে তাদের মোকাবিলা করার জন্য অনুরূপ ব্যক্তিদের প্ররোচিত করা প্রয়োজন।[৬] বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা রাজ্যশাসনের রীতি বহু পুরাতন হলেও, একজন রাজবিরোধীকে অন্যজনের বিরুদ্ধে ভিড়িয়ে দেওয়ার নীতি ইঙ্গিত দেয় যে রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে নিযুক্ত রাজপদাধিকারীগণ কতিপয় শক্তিশালী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ

১। এ. ই., ii, নং ২৭, প ৬-৭
২। 'সামারিজ অফ পেপারস'—ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী অধিবেশন (পুণা ১৯৬৩), পৃঃ ১৫
৩। এ. ই., ii, ২৭, প ৭
৪। ঐ, প ৭ ৮
৫। ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের পুণা অধিবেশনে (১৯৬৩) পঠিত এই বিষয়ে লিখিত দশরথ শর্মার গবেষণানিবন্ধ যা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নি।
৬। নারদস্মৃতি X, ৪, ৫, ৭

মোকাবিলায় অসমর্থ ছিল এবং এই সকল শক্তিশালী ব্যক্তিগণের স্থান সম্ভবতঃ সামন্তসমাজের মধ্যবর্তী ছিল।

কোন্ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা সামন্ততন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করেছে তা ঠিক বলা কঠিন। এ সম্পর্কে প্রথম বিচার্য বিষয় এই যে ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে প্রদত্ত জমি চাষ-আবাদ হত অথবা অনাবাদী পড়ে থাকত, দানগ্রহীতা স্বয়ং জমি চাষ করত অথবা অস্থায়ী চাষীরা চাষ করত। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে প্রাপ্ত ১৫০ খ্রীষ্টাব্দের একটি সাতবাহন শিলালিপিতে রাজকীয় ভূমিব একটি খণ্ড বৌদ্ধভিক্ষুদের দানের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে জমি আবাদ না হলে গ্রামের পত্তন হবে না।[১] স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে যে সমস্ত গ্রামদান করা হয়েছে সেখানে আবাদী জমি অবশ্যই ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণগুণ্টুর অঞ্চলে প্রাপ্ত তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেব একটি শিলালিপিতে ইক্ষ্বাকু বাজাকে শত সহস্র হল দ্বাবা আবাদযোগ্য ভূমিব দাতারূপে উল্লেখ কবা হয়েছে।[২] ভূমির মাপ হিসাবে 'হল' শব্দের প্রয়োগের ফলে স্পষ্টতঃ প্রতিয়মান হয় যে তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই অন্ধ্রপ্রদেশের অধিবাসীগণ 'হল' দ্বাবা চাষের পদ্ধতি জানত। খ্রীষ্টোত্তর প্রথম শতাব্দীতে পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে যজ্ঞেব জন্য ব্রাহ্মণদের যে গামসমূহ দান কবা হয়েছিল[৩] সেগুলিতে চাষ-আবাদ হত কিনা বলা কঠিন, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে প্রদত্ত অনুরূপ ভূমিদানের ক্ষেত্রে জমি চাষ-আবাদ অবশ্যই হত।

উত্তব ও পূব বঙ্গদেশে গুপ্তযুগেব ভূমিদানপত্রে 'খিল' ও 'অপ্রহত' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হওয়ায় অনুমিত হয় যে ব্রাহ্মণদের পতিত ও অনাবাদী জমি দান করা হত। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সবক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত বৈগ্রাম তাম্রপত্রে প্রযুক্ত খিলক্ষেত্র[৪] শব্দটি পতিত বা অনাবাদী জমির অর্থে গ্রহণযোগ্য হয়। প্রথমতঃ গুপ্তযুগের রচনা নারদস্মৃতিতে খিল শব্দের পরিভাষায় বলা হয়েছে যে এব অর্থ হল এমন জমি যা বিগত তিন বছর ধরে কর্ষিত হয় নি।[৫] দ্বিতীয় উল্লিখিত অনুদানের ক্ষেত্রে 'খিলক্ষেত্রের' সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের সেবায়েতদের জন্য কিছু বাস্তুভূমিও দেওয়া হয়েছিল।[৬] যার ফলে অনুমিত হয় যে সেই জমি একেবারে

১। "ত চখেত(ন) কর্ষতে স চ গমো ন বসাতি।" সি. ই., পৃঃ ১৯৪, প ৩-৪
২। ঐ, পৃঃ ২১৯-২০, প ৪-৫ ; পৃঃ ২২২, প ৪ ; পৃঃ ২২৭, প ১ ; পৃঃ ২২৯, প ৩-৪ ; পৃঃ ২৩০, প ৬
৩। ঐ, পৃঃ ১৮৩, প ১০-১
৪। ঐ, পৃঃ ৩৪৩, প ৬-৭
৫। নারদস্মৃতি XI, ২৬
৬। সি. ই., পৃঃ ৩৪৩, প ৯ এবং পাদটিকা ৯

অনুবর বা অনাবাদী ছিল না। অনুরূপভাবে ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দের দামোদরপুর তাম্রপত্রে 'অপ্রহত' ও 'খিল'[১] শব্দ দুটি প্রথাগত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়, কারণ এখানে জমি এত কম ছিল যে পাচ কুল্যবাপ জমি তিনটি বিভিন্ন স্থান থেকে ক্রয় করতে হয়েছিল।[২] তা ছাড়া এখানেও খিল ও অপ্রহত জমির অতিরিক্ত বাস্তুভূমিও দান কর হয়েছিল[৩] ফলে এ কথা স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে যে জমিগুলি ঊষর বা অনাবাদী ছিল। তা ছাড়া এই ক্ষেত্রে পাচ 'কুল্যবাপ' জমির সমস্ত এলাকাটিকে খিল নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৪] পঞ্চম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে দামোদরপুরের আরও একটি ভূমি-অনুদান পত্রে বলা হয়েছে যে একজন বণিক কোকামুখস্বামী এবং শ্বেতবরাহস্বামী দেবতাদ্বয়ের জন্য যথাক্রমে যে চার কুল্যবাপ ও সাত কুল্যবাপ জমি কিনেছিল তা নিঃসন্দেহে আবাদী জমিই ছিল।[৫]

আধুনিক মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশে গুপ্তদের পরিব্রাজক নামে অভিহিত সামন্তদের রাজত্বে ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে প্রদত্ত ভূমি অনুদান থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। বঙ্গদেশে দেখা যায় যে সাধারণ ব্যক্তিবিশেষ কয়েকখণ্ড জমি কিনে দান করছে, কিন্তু মধ্যভারতে সামন্ত রাজাগণ দান করছেন এবং সমগ্র গ্রামদান করা হচ্ছে। বঙ্গদেশে সরকারী অনুমতি নিয়ে দান করা হয়েছে এবং দানগ্রহীতা কেবলমাত্র করদান থেকে মুক্ত ছিল, কিন্তু মধ্যভারতে দানগ্রহীতাকে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব থেকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বঙ্গদেশের অনুদানের মত মধ্যভারতের অনুদানের ক্ষেত্রেও অনাবাদী জমিবোধক শব্দ প্রথাগত অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। মধ্যভারতে যদিও 'ভূমিছিদ্রন্যায়' কয়েকটি অনাবাদী জমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল, তবু দানে দেওয়া গ্রামগুলি অনাবাদী পতিত জমিতে পূর্ণ ছিল এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অধিকাংশ অনুদানের ক্ষেত্রেই ভূমিছিদ্রন্যায় শব্দটি নিয়মরক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হত। অতএব এই নীতি অনুযায়ী প্রদত্ত পিষ্টপুরিকাদেবীর পূজা ও মন্দির সংস্কারের জন্য ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত দুটি গ্রাম ভূমিছিদ্রন্যায় অনুসারে দান করা হলেও স্পষ্টতঃই গ্রাম দুটি অনাবাদী জমিতে পূর্ণ ছিল।[৬] এই গ্রাম দুটিতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির লোকেরা বাস করত যাদের অনুদানের সূচনা[৭] দেওয়া হয়েছিল। আর একটি কথা—এই গ্রাম পুলিন্দভট্ট (স্পষ্টতঃই ব্রাহ্মণ) নামক এক ব্যক্তিকে প্রথমেই দান করা

১। ঐ, পৃঃ ৩৩৮, প ৬-৭
২। ঐ, পৃঃ ৩৩৮
৩। ঐ, প ১৫-৮
৪। ঐ, প ১৭-৮
৫। ঐ, পৃঃ ৩২৮, প ৫-৭
৬। ক. ই. ই., III, নং ৩১, প ৭-১১ ও ১৩
৭। ঐ, প ৭

হয়েছিল, পরে মহারাজ শর্বনাথের অনুমতি নিয়ে সে পুনরায় গ্রামটি কুমারস্বামী নামক পুরোহিতকে দান করেছিল।[১] ঘটনাক্রমে এটিও একটি উপসামন্তীকরণের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

অনুরূপভাবে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে প্রাপ্ত কলচুরি চেদীযুগের এবং পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে প্রাপ্ত ভূমিছিদ্র শব্দের প্রয়োগ স্পষ্টতঃই এমন গ্রামসমূহ ও ভূমিখণ্ডের সম্পর্কে করা হয়েছে, সেগুলি বসতিপূর্ণ ও আবাদী ছিল।[২] মোট নটি অনুদানের মধ্যে মাত্র তিনটি ক্ষেত্রে ভূমিখণ্ড দান করা হয়েছে, বাকি ছটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গ্রামদান করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে সবচেয়ে প্রাচীন (পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দশক) শিলালিপিতে একটি গ্রাম অনুদান বিষয়ে রাজা সুবন্ধুর আদেশ উক্ত গ্রামের অধিবাসীদের জানানো হচ্ছে[৩] এইরূপ উল্লেখ আছে, যদিও গ্রামটি ভূমিছিদ্রন্যায় অনুসারে দান করা হয়েছিল। যদি পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভিক দশক থেকেই ঐ ন্যায় অনুসারে গ্রামদান করা হয়ে থাকে তা হলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে প্রদত্ত দানপত্রে উল্লিখিত ভূমিছিদ্রন্যায় শব্দটি নেহাৎ নিয়মরক্ষা মাত্র। গুজরাটে একটি ভূমিছিদ্রন্যায় অনুদানে (৬৪২ খ্রীঃ) জানা যায় যে কিছু জমি একটি খামারবাড়ির (সশীবরম্) সঙ্গে দান করা হয়েছিল[৪] যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভূমিখণ্ডগুলিতে চাষ-আবাদ হত। অন্য ক্ষেত্রে প্রদত্ত জমিও যে আবাদযোগ্য ছিল তা অত্যন্ত স্পষ্ট এই কারণে যে খিল জমিটি জলসেচনের সুযোগ-সুবিধাসহ দান করা হয়েছিল।[৫]

গ্রামদানের ক্ষেত্রে প্রায় সকল অনুদানেই 'উদরঙ্গ' ও 'উপরিকর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দ দুটির অর্থ এই যে গ্রামের জন্য কোনোপ্রকার কর দিতে হবে না, দাতা গ্রাম থেকে কোনো উপহারও গ্রহণ করবেন না, গ্রামের উপর তাঁর কোনো বিশেষ অধিকারও থাকবে না এবং 'চাট-ভাট' উক্ত গ্রামে প্রবেশ করতে পারবে না। এর দ্বারা ধারণা হয় যে প্রদত্ত গ্রামটি বসতিপূর্ণ ও আবাদী জমিতে পূর্ণ ছিল। কোনো কোনো অনুদানের ক্ষেত্রে দানগ্রহীতাকে দশটি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তির কাছ থেকে জরিমানা আদায় করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। যে সকল কর ও শুল্ক থেকে দান গ্রহীতাদের রেহাই দেওয়া হয়েছে পতিত জমিতে ঐ সকল কর আরোপ করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা যায় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'ভূমিছিদ্রন্যায়'

১। ঐ, প ১০-১
২। ক. ই. ই., iv, নং ৭, প ৯ ; নং ১১, প ১০ ; নং ১৪, প ২০ ; নং ১৫, প ২১ ; নং ১৬, প ৩৪ ; নং ১৭, প ৩৪ ; নং ১৯, প ১৫ ; নং ২০, প ১৩ ; নং ২১, প ২৯
৩। "গ্রাম প্রতিবাসিনঃ" ক. ই. ই, IV নং ৭, প ৩-৪
৪। ঐ, নং ২০, প ১২-৩ এবং ৮০ পৃষ্ঠার পাদটীকা সংখ্যা ১০
৫। ঐ, নং ২১, প ১৮

শব্দটির সমার্থক 'অববনিরন্দ্রন্যায়' শব্দটিও আইনগত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে 'অবনিরন্ধ্রন্যায়' অনুসারে একটি গ্রামদানের উল্লেখ করতে পারা যায়। ঐ প্রদত্ত গ্রামটিতে নজরানা, বেগার খাটা, সরকারী কাজে ভ্রমণকারী পদাধিকারীর খোরাকীশুল্ক এবং অন্যান্য সকল-প্রকার কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। গ্রহীতাকে স্থানীয় বাদ-বিসংবাদের মীমাংসার অধিকারও প্রদান করা হয়েছিল।[১] এ সমস্তই গ্রামটির আবাদী হওয়ার নির্দেশক।

অতএব ৫ম থেকে ৭ম শতাব্দীর গ্রামদানপ্রসঙ্গে প্রযুক্ত খিল, অপ্রহত, ভূমিছিদ্র এবং অবনিবন্ধ শব্দগুলির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকা দরকার। যেমন শিলালিপিতে প্রযুক্ত আড়ম্বরপূর্ণ উপাধিগুলি রাজাদের প্রকৃত চারিত্রের পরিমাপক নয়, তেমনি দানপত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলিও সবত্র তাদের প্রকৃত অর্থ বহন করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শব্দগুলি প্রকৃত অবস্থাকে প্রকাশ করার পরিবর্তে নিয়মরক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

গ্রামদানের আদেশ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত গ্রামের অধিবাসীদেরও সূচিত করা হয়েছে।[২] অর্থাৎ প্রদত্ত গ্রামে পূব থেকেই লোক বাস করত। অধিকাংশ ভূমিদানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কলচুরি-চেদীযুগের প্রথম চারটি শতাব্দীতে প্রদত্ত অনুদানে গ্রহীতা ব্রাহ্মণদের আদিনিবাসস্থানের কোনো উল্লেখ নেই—অবশ্য তাদের ভরদ্বাজ গোত্রের প্রায়ই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যেখানে তাদের বাসস্থানের উল্লেখ আছে সেখানেও দেখা যায় যে তাদের বাসস্থান তাদের প্রদত্ত ভূমির নিকটবর্তী। এইভাবে আমরা বেশ কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাই যেখানে আবাদযোগ্য জমিই দান করা হয়েছে এবং এই দানপ্রথার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপের সামন্তপ্রথা তুলনীয়। পার্থক্য শুধু এই যে গুপ্তকালে ও গুপ্তোত্তরকালে দান-গ্রহীতারা প্রধানতঃ পুরোহিত এবং সংখ্যায় অল্প ছিল।

বঙ্গদেশে ভূমি অনুদানের ফলে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।[৩] কোশাম্বী ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রেও এই বক্তব্যের উপর জোর দিয়েছেন।[৪] গুপ্তযুগে এবং গুপ্তোত্তরযুগে উত্তরভারতের এবং পূববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চল সম্বন্ধে উক্ত অনুমান সত্য, কিন্তু মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে সাধারণভাবে বসতিপূর্ণ গ্রাম এবং আবাদী জমিই দান করা হয়ে থাকত। ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের প্রথা সম্ভবতঃ প্রাক্‌মৌর্যকাল থেকে সুরু হয়েছিল এবং কখনও

১। ক. ই. ই., ১২০, প ১৮-২০

২। পি. সি. চক্রবর্তী, হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল, i, ৩৪৮-৯

৩। এন ইনট্রোডাকসন টু দি স্টাডি অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী, পৃঃ ২৯১-৩

কখনও মগধ ও কোশলেও ব্রাহ্মণদের রাজকীয় দান করা হয়েছিল।[১] এই ব্যবস্থা মৌর্যকালেও অব্যাহত ছিল এবং সে যুগে নিষ্কর জমি বিশেষ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক করে রাখা হত।[২] উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, কারণ, দেখি যে নূতন জনপদ[৩] স্থাপনের জন্য অর্থশাস্ত্রেও এইরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। এই প্রথা পববর্তীকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

গুপ্তযুগে এবং গুপ্তোত্তরযুগেও নতুন জনপদ স্থাপনের জন্য ভূমিদান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। প্রাক্‌মৌর্য এবং বিশেষ করে মৌর্যকালে আমবা কিছু সাহিত্যিক প্রমাণও পাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিস্তর অনাদাবী জমি অংশত অনুদানের দ্বারা পুনরুদ্ধারের কথা উল্লিখিত আছে। শিলালিপির উল্লেখ অনুযায়ী এই পদ্ধতিব আরম্ভ খ্রীষ্টীয় যুগ থেকে। গুপ্তযুগ থেকে পতিত জমিকে কর্ষণযোগ্য করে তোলার উপায় হিসাবে এইরূপ জমিদানের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল। জমির মালিকের পক্ষে অনুর্বর জমি কোনো কাজেই আসত না, যতক্ষণ না সেই জমি কর্ষণযোগ্য হয়ে উঠত। তাই জমি কর্ষণযোগ্য কবে তোলার উদ্দেশ্যেই পুরোহিত বা মন্দিরকে জমিদান করা হত। বঙ্গদেশে সমাচারদেবের একটি ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উৎকীর্ণ শিলালিপি[৪] অনুসারে এক ব্রাহ্মণ জেলাধিকারীর নিকট এক খণ্ড জমি প্রার্থনা করলে, সে এই ভেবে জমিটি দান করতে সম্মত হল যে সেই খানাখন্দ ও বন্যপশুতে পরিপূর্ণ জমিটি রাজার ঐহিক বা পারত্রিক কোনো কাজেই লাগবে না, অথচ দানগ্রহীতা যদি জমিটিকে আবাদযোগ্য করে তোলে, তা হলে রাজার ধর্ম ও অর্থ দুই-ই লাভ হবে।[৫] যদিও অন্য কোন দানপত্রে এইরূপ উদ্দেশ্যের স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবু অনাবাদী জমিদান করার ফল স্পষ্ট দেখা যায়।

লোকনাথের ত্রিপুরা তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে তিনি বনভূমিকে কর্ষণযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এক শত ব্রাহ্মণকে ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে জমিদান করেছিলেন।[৬] স্পষ্টতঃই পতিত জমি বলে প্রদত্ত ভূমির কোনো সীমা নির্দেশ করা হয় নি—শুধু জমি যে জেলায় অবস্থিত সেই 'সুব্বারিগ' জেলার সীমানার উল্লেখ করা হয়েছিল।[৭] যেখানে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম কোনো ভেদ নাই, যে স্থান ঝোপঝাড়

১। দীঘ নিকায়, ৮৭, ১১১, ১১৪, ১১৭, ১৩১, ২২৪
২। অর্থশাস্ত্র, প ১
৩। ঐ
৪। এ. ই. XVIII, ৭৫
৫। ঐ, নং ২১, প ১-১৪। এই শিলালিপির যে শব্দটির পাঠ এন. কে. ভট্টশালী 'সাবটা'রূপে গ্রহণ করেছেন সেটিকে 'সাবটা'রূপে গ্রহণ করলে অর্থ হবে 'বৃক্ষ পরিপূর্ণ ভূমি'। আলোচ্য প্রসঙ্গে এই অর্থই অধিকতর প্রযুক্ত বলে মনে হয়।
৬। ঐ, ই. XV, নং ১৯, প ৩৩-৫০
৭। ঐ, IV

লতাগুল্মে পরিপূর্ণ, যে স্থানে হরিণ মহিষ ভালুক বাঘ সাপ প্রভৃতি বন্য পশুর দল নির্বিবাদে তাদের পারিবারিক জীবনযাত্রার আনন্দ উপভোগ করে[১]—প্রদত্ত বনভূমিটি এইভাবে বর্ণিত হয়েছিল। মহাসামন্ত প্রদোষবর্মণ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ভগবান অনন্তনারায়ণের পূজার্চনার জন্যই ব্রাহ্মণদের সেখানে আনা হয়েছিল[২] এবং তাঁর প্রচেষ্টাতেই ব্রাহ্মণগণ ভূমি অনুদান লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের আগমনের গুরুত্ব এই যে তাঁরা বনভূমিকে বাসযোগ্য এবং কর্ষণযোগ্য করে তুলেছিলেন। পশ্চিম ভারতেও কোথাও কোথাও এই একই প্রক্রিয়া লক্ষিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে কোনো এক সময়ে সম্পন্ন বিজয়রাজকৃত জালকৈবা তাম্রপটে ৬৩ জন ব্রাহ্মণকে একটি গ্রামের অংশ দেওয়ার উল্লেখ আছে[৩] যার ফলে বহু ব্রাহ্মণের একই স্থানে বসবাসের সুবিধে হয়েছিল। এইরূপ দলিলেব সংখ্যা খুব বেশি নেই—কিন্তু এই দুটি দলিল থেকেই স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে অনুর্বব বনভূমি ব্রাহ্মণ বা মন্দিরকে দান করে তা কর্ষণযোগ্য করে তোলা হত।

আবাদী জমির এলাকায় ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত গ্রামগুলিতে চাষ-আবাদের প্রণালী নিশ্চিতরূপে বনভূমির এলাকা থেকে ভিন্ন ছিল। উর্বর এলাকাতে চাষেব প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পৃথক হলেও প্রাথমিক জ্ঞান সকলেরই সমান ছিল বলে মনে হয়। শ্রীকণ্ঠ জনপদের (যার মধ্যে থানেশ্বর অবস্থিত) বর্ণনা দিতে গিয়ে বাণ ক্ষেতচাষ খামারবাড়িতে পাহাড়ের মত চূড়া করে রাখা ধান, ঘটিব[৪] দ্বাবা জলসেচন ইত্যাদির কথা বলেছেন, অবশ্য মুখ্য ফসল ছিল মুগ আর গম।[৫] স্পষ্টতঃ অগ্রহারদের মালিকদের চাষ-আবাদের পদ্ধতি জানা ছিল, তারা নিজেদের ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম এবং অধ্যাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। হর্ষের অভিযানকালে এঁরা দধি, গুড়, চিনি ইত্যাদি বদ্ধ আধারে নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[৬] চাষবাসের আদিম পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকলে, বিন্ধ্য পর্বতের বনভূমিতে এই সকল দ্রব্যের উৎপাদন অবশ্যই সম্ভব হত না।

হর্ষচরিত অনুসারে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলের লোকেরা বলদ ও হাল দিয়ে চাষ করার পদ্ধতি অবগত ছিল না।[৭] পরিবারের জীবিকানির্বাহের জন্য কোদালের সাহায্যে কঠিন পরিশ্রমে তারা অতি অল্পসংখ্যক অতি ছোট ছোট চাষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে

১। ঐ, পৃঃ ৩১০-২
২। এ. ই. XV, প ১৬-৩২
৩। ক. ই. ই. IV, নং ৩৪
৪। পৃঃ ৯৪। চাহমান শিলালিপিতে উল্লিখিত 'অরঘট্ট' নয় ত ?
৫। ঐ
৬। পৃঃ ২১২
৭। ঐ, পৃঃ ২২৭

পারত[1] তারা কোনোপ্রকার সারের ব্যবহারও জানত না। সম্ভবতঃ তারা আধুনিক-কালে যাকে ঝুম পদ্ধতি বলে সেই পদ্ধতিতে চাষ করত। আদিবাসীরা এই পদ্ধতিতে চাষ করে। তারা জঙ্গল পুড়িয়ে ফেলে জমি হাসিল করে এবং বর্ষাকালে সেই জমিতে বীজ ছড়িয়ে দেয়—ভস্মীভূত গাছপালা একপ্রকার সারের কাজ করে। ফসল পাকলে তা কেটে নিয়ে তারা অন্যত্র চলে যায় এবং সেখানে আবার সেই পদ্ধতিতে চাষ করে। হতে পারে যে হর্ষচরিতে বিন্ধ্য পর্বত এলাকায় জঙ্গল কাটার যে উল্লেখ আছে তার সঙ্গে এইরূপে জমিচাষের সম্বন্ধ থাকতেও পারে। ত্রিপুরার বনপ্রদেশের একাংশে যেখানে শতাধিক ব্রাহ্মণ নতুন বসতিস্থাপন করেছিলেন সেখানেও পূর্বে চাষের এই পদ্ধতিই সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই নতুন বাসিন্দারা নিশ্চয়ই আদিম কৃষিপদ্ধতির বদলে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন। হর্ষের সময়ে বিন্ধ্য অঞ্চলে ভূমি অনুদানের ফলে কৃষি পদ্ধতির কোনো উন্নতি হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট জানা যায় না, কিন্তু যদি বনাঞ্চলে ধর্মীয় ব্যয়নির্বাহের জন্য অগ্রহাররূপে দান দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে উক্ত অঞ্চলে উন্নততর কৃষিপদ্ধতির প্রয়োগের জন্যই এইরূপে দান দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা চলে।

ভূমি অনুদানের শিলালৈপিক বিবরণ থেকে যদিও দানগ্রহীতাকে প্রদত্ত রাজস্ব ও প্রশাসন-বিষয়ক রেহাই দেওয়া সম্পর্কে জানতে পারা যায়, তবু ব্রাহ্মণদের অথবা মন্দিরসমূহকে প্রদত্ত জমির পরিমাণ সম্বন্ধে শিলালিপির উপর নির্ভর করা যায় না। আমরা যে কালের পরিসংখ্যান নিয়ে আলোচনা করছি, তার অভাব তৎকালীন ইউরোপেরও ছিল, ভারতের অবস্থা ত আরও অসন্তোষজনক। প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম ধ্বংসের ফলে, উত্তর ভারতে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি প্রাচীন শিলালেখের অংশবিশেষ মাত্র। তবুও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ধর্মীয় অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংস্থার অধীনস্থ জমির একটি অতি সাধারণ এবং অস্পষ্ট ধারণাই করতে পারি। আমরা জানি যে নালন্দার বিহারটি দুই শত গ্রামের রাজস্ব ভোগ করত। সম্ভবতঃ বলভীর শিক্ষাকেন্দ্রটিও ঐ একই সংখ্যক গ্রাম লাভ করেছিল। হর্ষের যে তাম্রলিপি এখনও পাওয়া যায় তাতে মাত্র দুটি গ্রামদানের উল্লেখ আছে; কিন্তু সমসাময়িক বলভী তাম্রলিপিতে দশটি গ্রামদানের উল্লেখ পাওয়া যায়, আবার লোকনাথের ত্রিপুরা শিলালিপিতে ১০৯ জন ব্রাহ্মণকে তাঁদের জীবিকা-নির্বাহের উপযুক্ত বন-ভূমিদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাণও ধর্মীয় অনুদান বিষয়ে কিছু আলোকপাত করেছেন। হর্ষচরিত থেকে জানা যায় যে একটি সামরিক অভিযানের আগে মধ্যদেশে ১০০টি গ্রাম এবং ১০০০ হল পরিমাণ (অর্থাৎ ১০০০

১। ঐ

হলের সাহায্যে কর্ষণযোগ্য জমি অর্থাৎ প্রায় ১০০০০ একর জমি ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন।[১] কাদম্বরীতে তারাপীঠের প্রাসাদে সহস্র শাসনের মুসাবিদা প্রস্তুতরত লিপিকরের উল্লেখ আছে।[২] এই 'শাসনগুলিকে দানপত্ররূপে গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণদের যে অসংখ্য ভূমিদান করা হয়েছিল এ কথা সহজেই অনুমান করা চলে।

হস্তান্তরের শর্তগুলি দেখলে জানা যায় যে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণরা ক্ষেত চাষ-আবাদ করত না, বরং অস্থায়ী চাষীরাই তা চাষ করে দিত। মনে হয় প্রত্যক্ষভাবে রাজাকে কর দিয়ে জমি চাষ করে এমন চাষী বা জোতদারের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছিল। ফা-হিয়েনের বর্ণনানুসারে যারা রাজার জমি চাষ করত শুধু তারাই কর দিত এবং ইচ্ছানুসারে যেখানে খুশি থাকতে বা যেতে পারত।[৩] যারা রাজাকে কর না দিয়ে পুরোহিত, মঠ, মন্দিব অথবা অন্য কোনো মধ্যবর্তীকে কর দিত, সম্ভবতঃ তাদের পূর্বোক্ত বর্ণনার মধ্যে ধবা হয় নি। কারণ পরের অনুচ্ছেদে ফা-হিয়েন ব্যাপারটা খোলসা করে বলেছেন যে মঠকে ক্ষেত ও বাগান এবং সেগুলি চাষ-আবাদ করবার জন্য কৃষক ও পশু দেওয়া হত।[৪]

৫ম থেকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে ভূম্যধিকারী মন্দিরের সংখ্যায় বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় এবং এই মন্দিরই পরবর্তীকালে মঠে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যদিও অধিকাংশ দান ব্রাহ্মণের নামে দেওয়া হত, তবু কিছু-কিছু মন্দিরের নামেও দেওয়া হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মধ্যভারতে পিষ্টপুরী দেবীর মন্দিরকে দুটি ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল।[৫] ঐ শতাব্দীর উত্তরার্ধে মৌখরীসর্দার অনন্তবর্মণ গয়া জেলায় সুখসম্পদে পরিপূর্ণ একটি গ্রাম দেবী ভবানীকে দান করেছিলেন।[৬] বঙ্গদেশে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোবিন্দস্বামী[৭], শ্বেতবরাহস্বামী[৮] ও কোকামুখস্বামীর[৯] মন্দিরগুলিকে ভূমিখণ্ড দান করা হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলচুরি-চেদীযুগের ৩১টি অনুদানেব মধ্যে ২টি বৌদ্ধ মঠকে, তিনটি হিন্দু মন্দিরকে এবং বাকি ২৬টি ব্রাহ্মণদের দেওয়া হয়েছিল।[১০] ফা-হিয়েন বলেন যে

১। "অধিকরণ লেখকৈঃ আলিখ্যামানশাসনসহস্রম্" অগ্রওয়াল, কাদম্বরী পৃঃ ৯৯, পাদটীকা ৯
২। "মার্গগ্রামনির্গতৈ বা গ্রহারিকজালমৈ।" ঐ, পৃঃ ২১২
৩। "লেগে—এ রেকর্ড অফ বুদ্ধিস্টিক কিংডমস্" পৃঃ ৪২-৩
৪। ঐ, পৃঃ ৪৩
৫। ক. ই. ই. iii, নং ২৫, প ১৪-৫ ; নং ৩১, প ৭-১১
৬। ঐ, নং ৫০, প ১০
৭। সি. ই. পৃঃ ৩৪২
৮। ঐ, পৃঃ ৩৩৮-৯
৯। এ. ই. XV, নং ৭, প ৬-৭
১০। ক. ই. ই. iv, ভূমিকার পৃঃ ১৩৯

বুদ্ধের নির্বাণলাভের পর, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ, গৃহস্থ বৌদ্ধগণ, ভিক্ষুদের জন্য বিহার স্থাপন করেছিলেন। বিহারকে বাসগৃহ, বাগান, জমি, জমি চাষের জন্য কিষাণ ও পশু দান করা হয়েছিল।[১] এই চৈনিক পরিব্রাজকের মতে লৌহপটে অঙ্কিত দলিল এক রাজা থেকে অন্য রাজায় হস্তান্তরিত হত এবং বৈধ বলে স্বীকৃত হত। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ স্মরণশক্তির ত্রুটির জন্য ভুল লিখেছেন, কারণ আজ পর্যন্ত কোনো লৌহপত্র পাওয়া যায় নি। অতএব স্পষ্টতঃই ফা-হিয়েন তাম্রপত্র বুঝাতে চেয়েছেন।

রাজাগণ ধর্ম ও শিক্ষার প্রয়োজনে অগ্রহার দান করতেন—এই দানই ভূম্যধিকারী মঠ-মন্দিরের উদ্ভব ও বিকাশের অন্যতম কারণ। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্তরাজা দামোদর-গুপ্ত একশ অগ্রহার দান করবার গৌরব লাভ করেছিলেন।[২] অর্থাৎ ধর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিচালনার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণদের ১০০টি গ্রামদান করা হয়েছিল। অনুরূপ দান গুপ্তসম্রাটগণও করে থাকতে পারেন, কারণ বিহারে প্রাপ্ত স্কন্দগুপ্তের ভগ্ন শিলালিপি যেটাকে স্পট পড়া যায় না এবং ভিটরী স্তম্ভলিপি—এই দুটিতে কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৩] সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতেও ব্রাহ্মণদের মনে অগ্রহার অনুদানের স্মৃতি উজ্জ্বল ছিল এবং তারা সমুদ্রগুপ্তের নামে কমপক্ষে দুটি অগ্রহার-অনুদানের জাল দলিল প্রস্তুত করেছিল।[৪] হুয়েন স্যাঙ্ বলেন নালন্দা বিহারের খরচপত্র দানলব্ধ ১০০টি গ্রামের আয় থেকে চলত[৫] এবং মনে হয় যে ইৎসিঙের সময় পর্যন্ত এই গ্রামের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ২০০-তে পৌঁছেছিল।[৬] ধর্মীয় সংস্থা হওয়ার জন্য ভূমি অনুদান ও তৎসংক্রান্ত অনেক দায় থেকে রেহাই পাবার ফলে কালক্রমে মন্দিরগুলি অর্ধস্বাধীন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং এগুলিই পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় মঠে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই মঠগুলির বিপুল সম্পদই তুর্কী আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল।

ফা-হিয়েনের বিবরণ এবং ইৎসিঙের বিবরণ সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখে না যে মঠ-মন্দিরের জমি অস্থায়ী চাষীদের দিয়ে চাষ করান হত। চাষী-প্রজাদের কি কি শর্তে জমি দেওয়া হত ইৎসিঙ্ তার কিছু বিবরণ আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেন যে কৃষকদের জমি ও বলদ দেওয়া হত এবং সাধারণতঃ উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ আদায় করা হত।[৭] হল, বীজ, সার এবং চাষের জন্য অন্যান্য উপকরণও

১। চাইনিজ লিটারেচার ১৯৫৬, নং ৩, ১৫৩
২। ক. ই. ই. iii, নং ৪১, প ১০
৩। ঐ, নং ১২, প ২৪-৩০ ; নং ১৩, প ১৮
৪। ঐ, নং ৬০ ; এ. ই. ২৫, নং ৯
৫। এস. বীল, দি লাইফ অফ হিউয়েন স্যাঙ্, পৃঃ ২১২
৬। জে তাকাকুসু (অনুবাদ), এ রেকর্ড অফ দি বুদ্ধিস্ট রিলীজিয়ন, পৃঃ ৬৫
৭। ঐ, পৃঃ ৬১

চাষীদের দেওয়া হত কিনা ইৎসিঙ্ সে কথা লেখেন নি। মনে হয় তখনকার জমি-চাষীরা আগেকার মত ভাড়াটে শ্রমিক ছিল না; বরং তারা অর্ধ-ভূমিদাস বা অস্থায়ী প্রজা ছিল, যারা জমির মালিককে খাজনা বা ভাড়া দিত। মঠ ও মন্দিরকে তাঁদের মালিকানাধীন জমির জন্য রাজাকে কোনো খাজনা দিতে হত না।

গুপ্তকালীন স্মৃতিগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ধর্মীয় সংস্থার অধীনস্থ জমিচাষের যে ব্যবস্থার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, গৃহস্থের অধীন জমিচাষের বেলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। পার্থক্য শুধু এই যে জমির জন্য রাজাকে কিছু কর দিতে হত। কৌটিল্যের বিধান অনুসারে নতুন উপনিবেশে রাজা কৃষকদের চাষের জমি দেবেন।[১] কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে কৃষকদের জমি মহীপতি বা রাজা দেবেন না বরং ক্ষেত্রপতি দেবেন। অবশ্য জমির মালিকের অনুপস্থিতিতে উন্নত জমির লাভ রাজা অবশ্যই পাবেন।[২] যাজ্ঞবল্ক্যের (১১'১৫৮) 'মিতাক্ষরা' এবং 'বীরমিত্রোদয়' টীকা থেকে জানা যায় যে জমির সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের চারটি শ্রেণী ছিল—মহীপতি, ক্ষেত্রস্বামী, কর্ষক এবং উপ-প্রজা বা ভাড়াটে শ্রমিক। গুপ্তকালেও এই চতুর্থ শ্রেণীটি বর্তমান ছিল কিনা সঠিক বলা যায় না। তবে প্রথম তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু বৃহস্পতিব স্মৃতিগ্রন্থে ক্ষেত্রপতির স্থলে ক্ষেত্রস্বামী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং তিনি এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে স্বামীর স্থান রাজা এবং জমির প্রকৃত জোতদারের মাঝখানে।[৩] এরা কৃষকদের জমি বিলি করত এবং চাষে অবহেলা করলে কৃষকদের কাছ থেকে জরিমানাও আদায় করত।[৪] এই ধরনের চাষীরা ভূমিদাস নয় বরং অস্থায়ী প্রজামাত্র ছিল।

জমি চাষ-আবাদের এই ব্যবস্থা শিলালিপির দ্বারাও সমর্থিত হয়। মহারাষ্ট্র এবং গুজরাট চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রদত্ত ভূমি অনুদানের ক্ষেত্রে গ্রহীতাকে জমি নিজে চাষ করা, অথবা অন্যকে দিয়ে করানোর অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[৫] স্বয়ং চাষ করতেন এমন ব্রাহ্মণদের সংখ্যানুপাত জানার কোনো উপায় আমাদের নেই। তবে এঁদের সংখ্যা খুব কম হবে না কারণ সে যুগের স্মৃতিগ্রন্থে ব্যবস্থা আছে যে ব্রাহ্মণরাও ইচ্ছা করলে স্বয়ং চাষ করতে পাবেন।[৬] কিন্তু যেখানে সম্পূর্ণ একটি

১। অর্থশাস্ত্র ২'১

২। ২'১৫৩

৩। ১৯, ৫৪-৫

৪। যাজ্ঞবল্ক্য ii, ১৫৭-৮; বৃহস্পতি ১৯'১৯, ৫৩-৪

৫। "ভুঞ্জতঃ কর্ষতঃ প্রদিশৎ কর্ষয়তঃ"। ক. ই. ই. IV, নং ২, প ৬; নং ১১, প ১৩; তুঃ নং ২১, প ৫২ ও সি. ই. পৃঃ ৪০৫ প ৬-৭, পাদটীকা ২ ও ৩

৬। মনুস্মৃতি X, ৮১৮২, যাজ্ঞবল্ক্য ৩ ও ৫, ১৫৬-৬০

গ্রাম অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণকে দান করা হয়েছিল সেখানে ব্রাহ্মণদের পক্ষে সমস্ত জমি নিজেরাই চাষ করা সম্ভব ছিল না। ফলে ব্রাহ্মণদের অধীনস্থ বহু গ্রাম বা অগ্রহার অর্ধ-সামন্তবাদী হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটেনে ম্যানর-গ্রামের মালিকের সঙ্গে প্রকৃত চাষীদের যে সম্পর্ক ছিল, এখানে জমিদাব ব্রাহ্মণদের সঙ্গে জমিচাষীর সম্পর্ক অনুরূপ ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু কিছু-কিছু বিষয়ে কৃষকরা জমির মালিকের অধীন ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই নিজেব জমি অন্যকে দিয়ে চাষ করানোর অধিকার থাকায় জমির মালিক চাষীদের বদলাতে পাবত অর্থাৎ তারা প্রজাকে উৎখাত করতে পারত।[১]

মধ্যভারতে গুপ্তযুগীয় দানপত্রে দেখা যায় যে কৃষকদের বেগার খাটতে হত।[২] বাকাতক শাসদেব প্রদত্ত অনুদান ও গুপ্তরাজাদের সামন্তদের দ্বারা মধ্যভারতে প্রদত্ত অন্য কিছু অনুদানেব দানপত্র থেকে জানা যায় যে দানগ্রহীতাদের প্রদত্ত গ্রামগুলিকে বাজাব বেগাব খাটা থেকে বেহাই দেওয়া হয়েছিল।[৩] মহারাষ্ট্রে প্রাপ্ত পঞ্চম শতাব্দীব একটি বাষ্ট্রকূট তাম্রপত্রে সর্বপ্রকার 'দিব্য' ও 'বিষ্টি' থেকে মুক্ত এক অগ্রহার অনুদানেব উল্লেখ আছে।[৪] পশ্চিম ভারতেও অনুরূপ অনুদান হয়েছিল যেগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন অনুদানটি ৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়া হয়েছিল।[৫] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে দানগ্রহীতারা বাজাকে কোনো কর বা শ্রমদান থেকে মুক্ত ছিল, কিন্তু তাঁবা স্বয়ং তাঁদেব অধিনস্থ গ্রাম থেকে কর ও শ্রম আদায় করতে পারতেন। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অনুদানে প্রদত্ত কিছু গ্রামের অধিবাসীদের প্রতি আদেশ ছিল, যে তারা দানগ্রহীতাদের আদেশ পালন করবে। এর অর্থ সম্ভবতঃ এই যে দানগ্রহীতা প্রজাদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম (বেগার) আদায় করতে পারত।[৬] কিন্তু প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কিছু দাবী করার অধিকার দানগ্রহীতার ছিল কিনা সন্দেহ। যাই হোক এতে কোনো সন্দেহ নেই যে গুপ্তকালে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে শাসকগণ প্রজাদের কাছ থেকে বেগার আদায় করত।

গুপ্তকালে দলিলে বেগার আদায় করার যে অধিকারের আভাসমাত্র পাওয়া যায়, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে বলভী রাজাদের দানপত্রে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

১। ক. ই. ই. IV, ভূমিকার পৃঃ ১৯১
২। মাইতি রচিত 'ইকনমিক লাইফ অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া ইন গুপ্ত পিরিয়ড' পৃঃ ১৫২-৩ তে এই অনুদানগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবরসেনের অনুদানে 'সর্ববিষ্টি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
৩। ঐ
৪। এম. জি. দিক্ষীত সম্পাদিত 'সিলেক্ট ইনস্ক্রিপশন্স ফ্রম মহারাষ্ট্র' পৃঃ ৮
৫। ক. ই. ই. iv, নং ৮, প ৬
৬। মাইতি, পৃঃ ১৫১-৩

প্রথম ধরসেনের (প্রায় ৫৭৫ খ্রীঃ) একটি অনুদানপত্রে ধর্মীয় গ্রহীতাকে প্রয়োজনে বেগার নেবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[১] প্রথম শিলাদিত্যও তাঁর ৬০৫[২] খ্রীষ্টাব্দের এবং ৬১০-১১[৩] খ্রীষ্টাব্দের দানপত্রে দানগ্রহীতাকে একই প্রকাব অধিকাব দান করেছেন। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বলভী অনুদানে[৪] এমন কি গুজরাটের সেন্দ্রক-সর্দার অল্পশক্তির মত ছোট ছোট সর্দারদের দেওয়া অনুদানেও[৫] এমন একটি পারিভাষিক শব্দের বহুল প্রয়োগ হয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে দানগ্রহীতার বেগার আদায় করার অধিকার ছিল। বাদামীর চালুক্যদেব ভূমি অনুদানপত্রেও এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। স্পষ্টই বোঝা যায় যে বেগাব নেওয়ার অধিকাবপ্রাপ্ত দানগ্রহীতা প্রয়োজনানুসারে ইচ্ছামত বেগার আদায় করত।

শ্রমিকদের কাছ থেকেও বেগার আদায় করা হত প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে বিধান আছে যে কর দেওয়ার পরিবর্তে শ্রমিকশিল্পী মাসে এক দিন রাজার কাজ করে দেবে। করদানের পরিবর্তে শ্রমদান করাকে বেগার বলা যেতে পাবে না। কিন্তু কৌটিল্যের অনুসারে কর্মকার ও বেগার শ্রমিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না এবং সম্ভবতঃ কর্মকারের মধ্যে শিল্পীরাও অন্তর্ভূত ছিল। কিন্তু ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতে বণিকদের এক দলকে (বণিগ্‌গ্রাম) দেওয়া একটি অনুদানে দেখা যায় যে শিল্প-শ্রমিকদের কেবল রাজাকেই নয়, যে সমস্ত বণিক রাজার অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ছিল তাদেরও বেগার দিতে হত। 'বরিক' অর্থাৎ প্রধানরূপে কর্মরত বণিকরাও কর্মকার, সূত্রধর, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার ইত্যাদির কাছ থেকে বেগার শ্রম আদায় করত।[৬] নীল এবং চিনি প্রস্তুতকারক শ্রমিকদের রাজাকে বেগার দিতে হত না[৭], কারণ তাদের ব্যবসায়ের জন্য তারা রাজাকে কর দিত।[৮] ভিস্তি এবং গোয়ালা, যারা বণিকদের কাজ করত তাদেরও রাজাকে বেগার দিতে হত না।[৯] শিল্পী এবং অদক্ষ শ্রমিকদের

১। এ. ই. XI, ৮০

২। ই. এ. VI, পৃঃ ১২ প ৬। প্রযুক্ত শব্দ "সোৎপদ্যমান বিষ্টি" মিরাশি যার অনুবাদ করেছেন এইভাবে—"তার থেকে উৎপন্ন বাধ্যতামূলক শ্রমের লাভের অধিকার সমেত।"

৩। এ, ই. XI, নং ১৭, প ২৬

৪। ঐ XXI, নং ১৮, প ২৫

৫। ক. ই. ই. IV, নং ২১, প ২৭ ; ই. এ. VI, ১২

৬। এ. ই. XXX, নং ৩০, প ২৮-এর অনুবাদ প্রসঙ্গে কোসাম্বী (জার্নাল অফ ইকনমিক এ্যাণ্ড সোস্যাল হিস্ট্রী অরিয়েন্ট লাইডন ২, ২৮) বলেন, এই শ্রমিকদের করের বদলে বেগার দিতে হত। এই মত তখনই স্বীকার্য যখন আমরা বরিককে রাজপদাধিকারীরূপে স্বীকার করি, কিন্তু তাদের সে স্বীকৃতি দেওয়া ভুল হবে।

৭। এ. ই. XXX, নং ৩০, প ৮

৮। জা. ই. সো. হি. ও. ii, ২৮৩

৯। এ. ই. XXX, নং ৩০, প ৮

সেবা বণিকদের জন্য সুরক্ষিত করাই বণিগ্‌গ্রামকে এই সকল সুযোগ-সুবিধাদানের উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থা মধ্যযুগীয় অর্থব্যবস্থাব একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য যা স্থানীয় উৎপাদন এবং স্থানীয় উপভোগের উপবে ভিত্তি কবে বর্তমান ছিল।

গুপ্তকালে সামগ্রিকভাবে বেগারের স্বরূপ বদলে গিয়েছিল। মৌর্যকালে দাস ও কর্মকারেরাই বেগার দিত এবং ভাণ্ডারগৃহ পরিষ্কার, পরিমাপ, ওজন, চৌকিদারী, পেষণ ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদেব বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে হত।[১] এই শ্রমিকদের 'পরিদর্শক' বা 'বিষ্টিবন্ধক' নিযুক্ত কবত এবং এদেব পারিশ্রমিক দেওয়া হত।[২] এ কথা সত্য যে 'বিষ্টি'ও রাজ্যেব আয়েব একটি উপায় ছিল, কিন্তু গ্রামে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদেবও বেগাব দিতে হত কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তবে দ্বিতীয় শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতে বাজা রুদ্রদামন'র সমস্ত প্রজা বেগারদানে বাধ্য ছিল। এই ব্যবস্থায় আরও গুরুত্বপূর্ণ পবিবর্তন সাধিত হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। প্রথম—বাকাতক, রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যদের শিলালিপি থেকে জানতে পারা যায় যে এই প্রথা মধ্যভাবতেব পশ্চিমভাগে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের অংশবিশেষে বিস্তারলাভ করেছিল। দ্বিতীয়—মধ্যভারতে এর ব্যাপক বিস্তার হয়েছিল এবং এর জন্য 'সর্ববিষ্টি' শব্দ ব্যবহাব করা হত।[৩] পশ্চিম ভারতের চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীর কলচুরি-চেদীযুগের কয়েকটি শিলালিপিতে 'সর্বাদিত্যবিষ্টি'[৪] শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ সমস্ত-প্রকার কর ও বেগার। তৃতীয়—প্রথমে যেখানে একমাত্র রাজাকেই বেগার দিতে হত, এখন থেকে ধর্মীয় অনুদানগ্রহীতা এবং তাদের বংশধবদেবও বেগার দিতে হত, কাবণ তাদের যে গ্রাম-দান করা হয়েছিল সেই গ্রামের অধিবাসীদের রাজার বেগার দিতে হত না। চতুর্থ—বেগারের পরিধি বিস্তৃত হয়েছিল। কৌটিল্য বেগারের বিভিন্ন প্রকার কাজের উল্লেখ করেছেন, যেমন—ওজন করা, মাপা, পেষা ইত্যাদি। কিন্তু তিনি চাষ কবা বা চাষ-সম্বন্ধীয় কোনো কাজের উল্লেখ করেন নি। চাষের জন্য বেগারদানের স্পষ্ট উল্লেখ বাৎস্যায়ন'র কামসূত্রে পাওয়া যায়। তাঁর উল্লেখ অনুযায়ী রাজার জন্য নয়, বরং গ্রামপ্রধানের জন্যই জমিচাষে বেগার দিতে হত। কামসূত্র থেকে জানা যায় যে গুপ্তকালে এবং গুপ্তোত্তরকালে গ্রামপ্রধান নিজের সুখ-সুবিধার জন্য বেগার আদায় করে থাকত। কামসূত্রের অনুসারে কৃষকরমণীদের বিনা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন প্রকার

১। অর্থশাস্ত্র ii, ১৫
২। ঐ, V, ৩
৩। এ. ই. XXIV, নং ১০, প ২৩। দ্বিতীয় প্রবরসেনের অনুদানপত্রে এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।
৪। ঐ, নং ১০, প ২৩

কাজ করতে বাধ্য করা হত; যেমন গ্রামপ্রধানের গোলায় ধান তোলা, তার বাড়িতে জিনিসপত্র পৌঁছানো বা বাড়ি থেকে জিনিসপত্র অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা, পশম পাট বা সুতো কাটা, ইত্যাদি।[১] বাৎস্যায়নের গ্রন্থে যে ভৌগোলিক বর্ণনা[২] আছে, বা যে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের উল্লেখ আছে তাতে মনে হয় মধ্য এবং পশ্চিম ভারত সম্বন্ধেই তিনি বলেছেন। অতএব এমন মনে করা অনুচিত হবে না যে এই বাধ্যতামূলক কায়িক শ্রম সেই সকল গ্রামপ্রধানই আদায় করত, যারা প্রাসঙ্গিক গ্রামাঞ্চলগুলিতে রাজার প্রতিনিধি রূপে কাজ করত।[৩] যে যে কাজের জন্য বেগার দিতে হত গ্রামপ্রধানের জমিচাষ করাও তার অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মতে এই তথ্যের গুরুত্ব আছে, কারণ এটা সামন্তবাদী প্রথার সূত্রপাতের পরিচায়ক। স্বাভাবিকভাবেই যে-যে দানগ্রহীতা বেগার আদায়ের অধিকারী ছিল, তারা নিজ নিজ অধিকারভুক্ত গ্রামে সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করত, বিশেষ করে পতিত জমি চাষ-আবাদের কাজে। আমরা দেখেছি যে দান-গ্রহীতা জমিতে নিজে চাষ করা অথবা চাষ করানোর অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু-এর ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছিল।

একদিকে দানগ্রহীতা ও ক্ষেত্রস্বামীদেব অধীনস্থ কৃষকদের অবস্থা দাসের মত হয়ে গেল, অন্যদিকে নতুন নতুন কর আরোপের ফলে স্বাধীন কৃষকদেরও অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকল। এদেব উপর আরোপিত করের সঙ্গে ইউরোপের সামন্ত-তান্ত্রিক করের তুলনা চলে। মনে হয় গুপ্তকালে রাজকীয় সেনা অথবা পদাধিকারী যখন কোনো গ্রামে অবস্থান করত, তখন তারা জোর করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে টাকাপয়সা বা রসদ আদায় করত।[৪] অর্থশাস্ত্রে 'সেনাভক্ত' নামে করের সঙ্গে এই আদায়ের তুলনা চলতে পারে।[৫] তা ছাড়া পরিবহনের জন্য গ্রামপরম্পরায় পশুও সরবরাহ করা হত।[৬] ভ্রমণকারী রাজপদাধিকারীদের দুধ ও ফলও তাদের সরবরাহ কবতে হত।[৭] এই বাধতামূলক উপহারগুলি রাজ্য এবং সেনার প্রয়োজনেই আদায়

১। ৫ ৫৫
২। এইচ সি. চাকলাদারের মতে বাৎস্যায়ন দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী ছিলেন।
৩। বিষ্ণুসেন দ্বারা এক বণিগ্‌গ্রামকে ৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত একটি অধিকারপত্রে (এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিয়ানা XXX, নং ৩০'১) বলা হয়েছে যে বর্ষাঋতুর প্রারম্ভে বীজ খরিদের জন্য নিজ এলাকার বাজারে আসার পথে কৃষকদের তাদের মালিকগণ যেন বাধা না দেয়। এর দ্বারা অনুমান করা যায় যে কৃষকদের মালিকেরা তাদের বেগার আদায়ের জন্য যেখানে ইচ্ছা আটকে রাখতে পারত।
৪। 'অভটচ্ছাত্রপ্রাবেশ্য', ক. ই. ই. iii, পৃঃ ৯৮, পাদটীকা ২
৫। অর্থশাস্ত্র ii, ১৫
৬। 'অপারদ্ধড গোবলিবর্দ্দ', এ. ই. XXVII, নং ১৬, প ২৯
৭। ঐ

করা হত। এইভাবে আদায়ীকৃত অর্থ অবশ্য রাজকোষে পৌছত না, স্থানীয়ভাবে রাজকীয় সেনা বা পদাধিকারীরাই তা ভোগ করত। এই প্রথার ফলে এক মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব এবং স্বাধীন কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটেছিল।

রাজপ্রতিনিধিরা যেহেতু ভ্রমণশীল এবং তাদের পদও বংশানুক্রমিক ছিল না, সেজন্য তারা যে বাধ্যতামূলক শ্রম ও কর আদায় করত কৃষকদের পক্ষে সেটা ততটা ভারস্বরূপ ছিল না, কিন্তু দানগ্রহীতা গ্রামের মালিক স্থানীয় ব্যক্তি এবং তাদের প্রভুত্বও বংশানুক্রমিক হওয়ায় তাদের শোষণ ও অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এইরূপ বাধ্যতামূলক শ্রমদান আমাদের ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যেখানে প্রজাদের দুই প্রকারের দায়িত্বপালন করতে হত; (১) কর দেওয়া (২) মালিকের খাস জমিতে বেগার খাটা।[১] গুপ্তযুগে এবং গুপ্তোত্তরযুগে মধ্যভারতে ও পশ্চিম ভারতে কৃষকদের এই যুগ্ম-দায়িত্বপালন করতে হত দানগ্রহীতা গ্রামমালিকের প্রতি এবং এই প্রথা ইউরোপীয় প্রথা থেকে অভিন্ন ছিল।

দানগ্রহীতাদের যে বিচারক্ষমতা ও প্রশাসনিক অধিকার দেওয়া হয়েছিল তার ফলে তারা গ্রামের অধিবাসীদের উপরে অনায়াসে আধিপত্যও বিস্তার করতে পারত। অতএব কোনো-কোনো ব্যাপারে এদের সামন্ততান্ত্রিক লর্ডদের সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে। কিছু-কিছু পার্থক্যও ছিল। যাদের বেগার খাটতে হত তাদের দানগ্রহীতার ক্ষেত্রে ততটা পরিশ্রম করতে হত না যতটা ইউরোপে ম্যানর মালিকদের ক্ষেত্রে করতে হত। তা ছাড়া দানগ্রহীতাদের অধীনস্থ এলাকাও তুলনায় ছোট ছিল, কারণ ব্রাহ্মণদের একেবারে একটির অধিক গ্রামদানের দৃষ্টান্ত বিরল।[২] ফলতঃ তাদের ক্ষেত্রে চাষীদের কাজ করার প্রয়োজন ছিল কম এবং সীমাবদ্ধ।

চাষীদের অবস্থার অবনতির আর একটা কারণ এই যে ভূমি হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত এলাকার চাষীরাও নতুন মালিকের অধীনস্থ হয়ে যেত। ফা-হিয়েন স্পষ্ট লিখেছেন যে ভিক্ষুকদের জন্য নির্মিত বিহার, বাসগৃহ, বাগান, চাষের জমি, জলসেচব্যবস্থা সবই থাকত এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিচাষের জন্য চাষী এবং পশুর ব্যবস্থাও থাকত।[৩] কিন্তু বিহারের সঙ্গে চাষীদেরও হস্তান্তর ব্যবস্থার সব চেয়ে প্রাচীন শিলালৈপিক দৃষ্টান্ত সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের আশরাফ্‌পুর শিলালিপিতে প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের মালিকদের সঙ্গে সঙ্গে[৪] চাষীদের নামও

১। মার্ক ব্লাক, 'ফিউডাল সোসাইটি', পৃঃ ৭৩
২। কিন্তু ৫৩৩-৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি অনুদানে একজন রাজপুরুষের দাতা মন্দিরের জন্য একসঙ্গে দুটি গ্রামদান করেছিলেন। ক. ই. ই. iii, নং ৩১, প ৭
৩। চাইনিজ লিটারেচার—১৯৫৬, নং ৩, ১৫৩
৪। মেমোয়ার্স অফ দি এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, i, নং ৬, পৃঃ ৯০, প্লেট 'এ', প ৮

উল্লেখ করা হয়েছে।[১] এর থেকে জানা যায় যে পূর্ববর্তী মালিকের কাছ থেকে গ্রহণ করে যে ভূমিখণ্ড আচার্য সঙ্ঘমিত্রের অধীনস্থ বিহারকে দান করা হয়েছিল, তখন সেই ভূমিখণ্ডের অধিবাসীদেরও যেমনকার তেমনই রেখে দেওয়া হয়েছিল, কারণ, প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে চাষ করবার জন্য চাষীর প্রয়োজন ছিল। এর দ্বারা আরও জানা যায় যে অন্য একটি ভূমিখণ্ড যা দুই ব্যক্তি চাষ করত তাও নতুন ভোক্তাকে দেওয়া হয়েছিল।[২]

শিলালিপি থেকে জানা যায় যে জমির সঙ্গে সঙ্গে চাষীদেরও নতুন মালিকের কাছে হস্তান্তরের প্রথা প্রথম দক্ষিণ ভারতে শুরু হয়। তৃতীয় শতাব্দীর একটি পল্লব অনুদান থেকে জানা যায় যে একখণ্ড ভূমি ব্রাহ্মণকে দেওয়া হলে, উক্ত ভূমিখণ্ডের চারজন চাষী পূর্ববৎ সেখানেই থেকে গিয়েছিল।[৩] এর দ্বারা এটিই প্রতিপন্ন হয় যে ভূমিখণ্ড নতুন ভোক্তাকে দেওয়া হলে সেই জমি সেই আগের চাষীরাই চাষ-আবাদ করতে থাকত। আবার গোদাবরী জেলাস্থিত এলোরে প্রাপ্ত শালংকায়ন বিজয়দেব-বর্মণের একটি প্রকৃত দানপত্রে ব্রাহ্মণদের ২০ 'বিবর্তন' এবং সেইসঙ্গে ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের ভাগীদার দ্বারপাল এবং রক্ষকের জন্য বাসস্থান (ঘরস্থানম্) নির্মাণের জন্য স্থান দেওয়া হয়েছিল।[৪] উক্ত উদাহরণ দুটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে ক্ষেতচাষী এবং মজুররা জমির সঙ্গে জড়িত থাকতে বাধ্য ছিল। ধীরে ধীরে এই প্রথা কৃষকদের উপরেও প্রযুক্ত হল। কর্ণাটকে জমির নতুন মালিকের কৃষকদের সমর্পণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। বীজাপুর জেলায় প্রাপ্ত বাদামীর জনৈক প্রারম্ভিক চালুক্য রাজা ষষ্ঠ শতাব্দীর অনুদানপত্রে[৫] ২৫ বিবর্তন ভূমিদান করা হয়েছিল এবং সেই জমির উৎপন্ন ফসল, বাগান, জীরক, জল এবং গৃহও (নিবেশ) দেওয়া হয়েছিল।[৬] মনে হয় 'নিবেশ'র অর্থ চাষীদের বাসগৃহ। প্রায় এই শতাব্দীতে একটি গাঙ্গ অনুদানপত্রে এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।[৭] এতে বলা হয়েছে যে চারটি কুটিরের সঙ্গে ছটি 'হল' করমুক্ত জমি (চতুর্নিবেশনসহিতা) অগ্রহাররূপে নারায়ণ দেবতাকে চিরকালের জন্য দান করা হয়েছিল।[৮] এই দুটি

১। ঐ, প ৮-৯

২। ঐ, প্লেট 'বি', প ৯-১১

৩। এ. ই. I, নং ১, প ৩৯

৪। ঐ, IX, নং ৭, প ৮-১১

৫। এ. ই. XXVIII, ৫৯

৬। ঐ, নং ১০

৭। ঐ, XXIII, ৬২-৩

৮। ঐ, নং ১০, প১০--১৭। 'হল'শব্দটি সম্ভবতঃ একজোড়া বলদের সাহায্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণবোধক অর্থাৎ এক হল জমি ১০--১২ একর হতে পারে। অতএব ৬ হল জমির সঙ্গে চারটি ঘরের হস্তান্তর সঙ্গত বলেই মনে হয়। কারণ চারটি কৃষক পরিবার ৬০--৭০ একর জমি অনায়াসে চাষ-আবাদ করতে পারে।

অনুদানপত্রেই 'নিবেশ' বা 'নিবেশন' শব্দের অর্থ নিছক গৃহ বা বাসস্থান নয় বরং এমন বাসগৃহ যাতে চাষীরা বাস করে থাকে। বস্তুতঃ আজও গ্রাম্য এলাকায় এই অর্থেই সাধারণ লোকে ঐ শব্দ ব্যবহার করে থাকে। ভূমির সঙ্গে চাষীদের হস্তান্তরিত করার প্রথা দক্ষিণ ভারত থেকে সুরু হয়ে সম্ভবতঃ মধ্যভারত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দীর একটি বাকাতক অনুদানপত্রে চারটি কর্ষক নিবেশ দান কবার উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এব অর্থ এই যে চারটি কুটিরে বসবাসকারী চাষীদের দানগ্রহীতাকে সমর্পণ করে দেওয়া হল।

প্রদত্ত গ্রামের চাষীদের হাতে সমর্পণ কবে দেওয়ার প্রথা উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের আশেপাশেব অঞ্চলে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কোবাপুট জেলাব একটি শিলালিপিতে, যার কাল আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দী বলে অনুমান করা যেতে পারে, এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারে।[২] এটিতে ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত একটি গ্রামের অধিবাসীদের জীবিকা সম্বন্ধে আশ্বস্ত করা হয়েছে এবং তাদের গ্রামে থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।[৩] কিন্তু স্পষ্ট কবে এ কথা বলা হয় নি যে চাষীদেব সমেত গ্রামটি হস্তান্তরিত কবা হচ্ছে। মধ্যভারতেব পূর্বভাগের অনুদানপত্রে প্রদত্ত গ্রামেব অধিবাসীদের দানগ্রহীতাকে কর দেওয়া, তার আদেশপালন করা এবং শান্তিশৃঙ্খলার সঙ্গে বসবাস কবার কথা বলা হয়েছে।[৪] দানগ্রহীতার রাজস্বসম্বন্ধীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে সুখশান্তিতে বাস করার পরামর্শদান কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু সমগ্র আদেশটির অর্থ সম্ভবতঃ এই যে প্রদত্ত গ্রামের অধিবাসীরা পূর্ববৎ বসবাস করবে। কিন্তু এই সৎপরামর্শ সব সময় কার্যকব হত না এবং সেজন্য চাষী এবং শিল্পীদের সেবা গ্রহণের জন্য বলপ্রয়োগও করা হত।

মৈত্রক এবং গুজরাটের চালুক্যদের দানপত্রগুলি থেকে জানা যায় যে জমির সঙ্গে চাষীদেরও হস্তান্তরিত করা হত। সবচেয়ে প্রাচীন দৃষ্টান্ত ষষ্ঠ শতাব্দীর উত্তরার্ধে পাওয়া যায়। বলভীরাজ দ্বিতীয় ধরসেনের এই কালের একটি অনুদানপত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রফলের এমন পাঁচটি ভূমিখণ্ড দান করার বর্ণনা আছে, সেগুলি পাঁচজন জোতদারের অধীনে ছিল যাদের মধ্যে একজন 'মহত্তর' দ্বিতীয় জনকে 'কুটুম্বিন'

১। বি. বি. মিরাশি, বাকাতক রাজবংশ কা ইতিহাস তথা অভিলেখ, নং ৮, প ১৪-৬

২। এ. ই. XXXVIII, 12

৩। এ. ই. XXVIII, নং ২, প ৬-৭, "ষত ভবদ্বি(শ্চ) ধ্রুবকর্মান্তারৈস্ত সুনিবৃত্তবিষ্টৈর্ব মন্তব্য(ম্)", ডি. ডি. সরকারের (ঐ, ৫) মতে কৃষকদের তাদের নামে বন্দোবস্ত করা জমি চাষ করতে এবং সর্বপ্রকার অসদ্ব্যবহারের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই অর্থ সমীচীন বলে মনে হয় না।

৪। ক. ই. ই. iii, নং ৪০, প ১১-৩; নং ৪১, প ১৩-৫

নামে অভিহিত করা হয়েছিল।[১] সম্ভবতঃ ভূমিখণ্ড হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে চাষীদেরও হস্তান্তর করা হয়েছিল, অন্যথায় তাদের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। আবার বলভীরাজ তৃতীয় ধরসেনের ৬২৩-৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি দানপত্রে চারটি বিভিন্ন পরিমাপের আবাদী ভূমিখণ্ড দানের উল্লেখ আছে—এই ভূমিখণ্ডগুলি যথাক্রমে চারজন কৃষক বা কুটুম্বিন'র অধীনে ছিল এবং তাদের নামের উল্লেখ করা হয়েছিল। এই ভূমিখণ্ডের চতুঃসীমা সুনির্দিষ্ট ছিল এবং এগুলি অন্যান্য চাষীদের মাঝখানে ছিল।[২] গুজরাটের প্রারম্ভিক গুর্জররাজ তৃতীয় জয়ভট্টের (খ্রীঃ ৭০৬) নভ্‌সারিপট থেকেও নির্দিষ্ট জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত চাষীদেরও হস্তান্তরিত করার প্রথা অনুমান করা যায়। এই রাজা জনৈক ব্রাহ্মণকে ৬৪ নিবর্তন ভূমি এবং ঐ জমিতে অবস্থিত গৃহাদি, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি (গৃহাস্থবচলক) দান করেছিলেন।[৩] স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে ঐ জমিস্থিত অধিবাসীদেরও জমির সঙ্গে সঙ্গে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। যে অনুদানে আমরা গ্রামবাসীগণের হস্তান্তরের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দৃষ্টান্ত পাই সেটি হল মহারাজ সমুদ্রসেন নামক একজন সামন্তরাজ প্রদত্ত অনুদান যা সপ্তম শতাব্দীতে দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়।[৪] এই অনুদান-পত্র অনুযায়ী কাঙ্‌রা অঞ্চলে একটি গ্রাম তার অধিবাসীদেরসমেত (সপ্রতিবাসিজনসমেত) জনৈক দানগ্রহীতাকে দেওয়া হয়েছিল।[৫] এইভাবে আমরা দেখি যে কাঙরা এবং গুজরাটের কোনো-কোনো অংশে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ভূমিদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল।

মনে হয় ভূমির সঙ্গে সঙ্গে দাসরূপে চাষীদের হস্তান্তরিত করে দেবার প্রথা প্রধানতঃ সেই সমস্ত ভূমিখণ্ডেই প্রযুক্ত হত, যা কোনো-কোনো সংগঠিত গ্রামের অংশবিশেষ ছিল না এবং সেই ভূমি এমন চাষীর দ্বারা আবাদ হত, যারা সংঘবদ্ধ-ভাবে না থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত। এইরূপ ক্ষেত্রে চাষীর আবাদী জমি তার বাসগৃহের চারপাশেই থাকত। যখন এই জমিদান করা হত তখন সেই জমির বাসিন্দা চাষীকে সেখানেই রাখা হত, না হলে দানগ্রহীতার খুব অসুবিধা হত। এই চাষীদের কিছু ছিল কিষাণ যারা দাতার লাভের জন্যই জমিচাষ করত। এইজন্য মনে করা যেতে পারে যে দাস দুই প্রকারের ছিল একপ্রকার, যারা জমিচাষ করত অন্যপ্রকার যারা গ্রামবাসী প্রজারূপে সেবা করত। এই প্রজারা কররূপে তাদের

১। ক. ই. ই. নং ৩৮, প ২১-৮
২। ঐ
৩। ঐ, IV, নং ২১, প ১৭-২৮
৪। ঐ, ২৮৭
৫। ঐ, নং ৮০, প ১০

উৎপন্ন ফসলের একাংশ প্রদান করত এবং দানপত্রে নির্দিষ্ট অন্যান্য কাজকর্মও করত। ভারতের পটভূমিকায় ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত চাষীদের পূর্ণ ভূমিদাসরূপে এবং গ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও হস্তান্তরিত প্রজাদের অর্ধদাসরূপে গ্রহণ করা উচিত। দানগ্রহীতার খাস জমিতে প্রজাদের কাজ করতে হত না, যদিও তৎকালীন অর্থনৈতিক সংকটের যুগে তারা জীবিকানির্বাহের জন্য গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতেও পারত না।

শিলালিপির উল্লেখ থেকে প্রতীয়মান হয় যে দাসপ্রথা প্রথমতঃ উপান্ত অঞ্চলে, পরে ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের কেন্দ্রভূমিতে প্রসারিত হয়েছিল। এর সূত্রপাত পার্বত্য ও অনুন্নত অঞ্চলে যেখানে স্থানীয় অর্থব্যবস্থা পরিচালনায় উপযুক্ত চাষীর সংখ্যা ছিল না। কিন্তু চাষীদের উপর দানগ্রহীতাদের যথেষ্ট প্রভুত্বের ক্ষমতা দেওয়ার ফলে, এই ব্যবস্থা পরে উন্নত অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছিল। প্রথমতঃ ভাগচাষী এবং পরে সকল-প্রকার চাষীরাই এই প্রথার অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতঃ এই প্রথা প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে প্রযুক্ত হত; পরে সমস্ত গ্রামেই পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে দাসব্যবস্থা খুবই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ চীন যাত্রীর ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটিতে পাওয়া যাবে[১]—

"পঞ্চভারতে এমন নিয়ম আছে যে রাজা রানী রাজপুত্র থেকে সর্দার ও তাদের পত্নীরা পর্যন্ত সবাই নিজ নিজ ক্ষমতা ও সামর্থ্যানুযায়ী পৃথক পৃথক বিহার নির্মাণ করাতেন, সমবেতভাবে করাতেন না। তাই বক্তব্য এই ছিল যে যখন প্রত্যেকের নিজস্ব পুণ্যপ্রবৃত্তি আছে তখন সংযুক্ত চেষ্টার প্রয়োজন কি?

যখনই কোনো বিহার, নির্মিত হত, তখনই গ্রাম ও তার অধিবাসীদের ধর্ম, সংঘ ও বুদ্ধের সেবার জন্য উৎসর্গ করা হত। এমন কখনই হত না যে শুধুই বিহার নির্মিত হত অথচ বিহারকে অধিবাসীসহ গ্রামদান করা হত না। বিদেশেও এই প্রথার অনুসরণ করা হত রাজা, রাজমহিষী ও অন্যান্য রানীদের নিজস্ব অধিকারে পৃথক পৃথক গ্রাম ছিল। রাজপুত্র এবং সর্দারদের অধীনেও তাদের নিজস্ব অধিকার-ভুক্ত গ্রাম ছিল। এই কারণে এঁরা সকলেই স্বাধীনভাবে দান করতে পারতেন-- রাজার অনুমতি দেবার কোনো প্রয়োজন হত না। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা ছিল। যখনই মন্দির নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিত, তখনই তাঁরা তা নির্মাণ করাতেন; রাজানুমতির অপেক্ষা করতেন না। রাজা এ ব্যাপারে কোন বাধা দেবার সাহসও করতেন না, তাঁর ভয় ছিল পাছে পাপের ভাগী হতে হয়।

১। জান ইউন হুয়া, 'হুই চাউজ রেকর্ড অন কাশ্মীর'—কাশ্মীর রিসার্চ বাই এ্যানুয়াল, নং ২ (১৯৬২), পৃঃ ১১৯-২০

সাধারণ ধনী ব্যক্তি যাঁদের দান করার মত গ্রাম ছিল না, তাঁরাও মন্দির নির্মাণ ও তার ব্যয়নির্বাহের চেষ্টা করেন। যখনই তাঁরা কোনো মূল্যবানবস্তু লাভ করেন তখনই তাঁরা সেটি ধর্ম, সংঘ ও বুদ্ধের নামে উৎসর্গ করেন। পঞ্চভারতে মানুষ বিক্রয় করা হয় না। অতএব এখানে স্ত্রীরাও ক্রীতদাসী নয়। ইচ্ছা ও আবশ্যকতানুযায়ী গ্রাম ও গ্রামবাসীদের দান করা যায়।"

এই বিবরণ থেকে জানা যায় যে রাজা, রানী, রাজকুমার, সর্দার ইত্যাদির দ্বারা মঠ-মন্দির বিহার নির্মাণপ্রথার সঙ্গে সঙ্গে বসতিপূর্ণ গ্রামদানের প্রথাও সমানভাবে প্রচলিত ছিল। এই অনুদানের প্রাচুর্যের কারণ এই যে রাজা ও রানীদের ছাড়া রাজকুমার, সর্দার, ইত্যাদির অধিকারেও প্রজাসমেত গ্রাম ছিল, সেগুলি তাঁরা বিনা বাধায় দান করতে পারতেন। রাজকুমাব এবং ছোট ছোট সর্দাররা সম্ভবতঃ নিজ নিজ ব্যয়নির্বাহের জন্য উর্ধ্বতন প্রভুব কাছ থেকে অনুদান পেতেন, কিন্তু ধর্মীয় প্রয়োজনে ভূমি ও তৎসহ কর্মীদের দান কবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁদের ছিল। স্পষ্টতঃ বাসিন্দা প্রজা জমির মালিকের এবং জমি হস্তান্তরিত হলে দানগ্রহীতার সেবা করতে বাধ্য ছিল।

এই চৈনিক বিবরণটি ক্রীতদাসপ্রথার ভাঙ্গন এবং ভূমিদাসপ্রথার অভ্যুদয়ের বিষয়ে একটি মূল্যবান দলিল। বৌদ্ধ মঠে দানপ্রসঙ্গে এতে বলা হয়েছে যে পঞ্চভারতে মানুষ বিক্রী হয় না এবং এখানে ক্রীতদাসী নেই। এই উক্তি যদিও আমাদেব মেগাস্থিনিসের সেই উক্তিটি স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে তিনি বলেছেন যে ক্রীতদাস নেই, তবু মনে হয় যে সপ্তম শতাব্দীতে কিছু পুরুষ ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু ক্রীতদাসপ্রথা না থাকায় বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না, কারণ ইচ্ছা ও আবশ্যকতানু-সারে বাসিন্দাসহ গ্রামদান করা যেতে পারত। যেহেতু মঠকে প্রদত্ত জমিচাষ করার জন্য গ্রামবাসীদেরও দান করে দেওয়া হত, সেজন্য দানগ্রহীতাদের শ্রমিকের কোনো অভাব অনুভূত হত না।

এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে গুপ্তযুগ থেকে উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত দাসদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে এবং শূদ্রগণ দাসোচিত কর্ম থেকে ক্রমশঃ মুক্তি পেতে থাকে। দাসত্ব থেকে মুক্তি বিষয়ে কৌটিল্যের বিধান সাধারণতঃ যারা আর্য পিতামাতার সন্তান, অথবা স্বয়ং আর্য তাদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।[১] কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য একটি যুগান্তকারী নীতির কথা বলেছেন—তাঁর মতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিকে দাস করা চলে না।[২] পরের ভাষ্য অনুযায়ী এর অর্থ ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিযুক্ত শূদ্র, ক্ষত্রিয়

১। অর্থশাস্ত্র iii, ১৩
২। ২, ১৮২

ও বৈশ্য দাসদের রাজা মুক্তি দিতে পারেন।[১] শূদ্রদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসরূপে নিযুক্ত করা চলবে—মনুর এই বিধানকে যাজ্ঞবল্ক্য একেবারে পালটে দিয়েছেন।[২] আবার নারদ ও বৃহস্পতি এই সকল হীন ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করেছেন, যারা স্বাধীন হয়েও নিজেদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে।[৩] তা ছাড়া ভারতের ইতিহাসে নারদই প্রথম দাসত্বমুক্তির বিস্তারিত বিধিবিধানের নির্দেশ দিয়েছেন।[৪] কত্যায়নস্মৃতিব একটি অনুচ্ছেদে দাসদের নেতাদের 'বর্গিন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৫] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে দাসদের নিজস্ব কোনো সংস্থাও ছিল। এই সকল কারণেই দাসপ্রথাব ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়েছিল।

ভূমিব বিভাগ ও অনুদানের ফলে ভূমির বিচ্ছিন্নতা এই পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে উত্তরাধিকারের নিয়মাবলীতে ভূসম্পত্তি বিভাগের কোনো উল্লেখ নেই—এর উল্লেখ প্রথম নারদ[৬] এবং বৃহস্পতির[৭] স্মৃতিতে পাওয়া যায়। এর দ্বাবা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গুপ্তযুগের মধ্য বা সমাপ্তিকালে বড় বড় একান্নবর্তী পরিবারের মালিকানাধীন বিস্তীর্ণ এজমালী ভূমিখণ্ড, ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হতে আরম্ভ করেছিল। বিভাগের এই নীতি একবার স্বীকৃত হওয়ার পর উত্তর ভারতে নদীতীববর্তী ঘনবসতিপূর্ণ উর্বর আবাসযোগ্য ভূমির দ্রুত বিভাজন হতে থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। জনবসতির চাপ কি পরিমাণ বেড়েছিল তার পবিচয় ৫ম শতাব্দীর একটি শিলালিপিতে পাওয়া যায়। এই শিলালিপি অনুসারে উত্তববঙ্গে মাত্র দেড় 'কুল্যবাপ' জমি পৃথক পৃথক চারটি এলাকা থেকে কিনতে হয়েছিল।[৮] এই জমিও দান দেওয়ার জন্য কেনা হয়েছিল—ফলতঃ বিভাজন ক্রিয়া দ্রুততর হতে থাকল।

সাধারণ ব্যক্তির দান দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধক ছিল। বাংলাদেশের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে রাজার স্থানীয় প্রতিনিধি ও জেলা-পরিষদের সম্মতি ছাড়া দানের উদ্দেশ্যে জমি কেনা যেত না। মহারাষ্ট্র শিলালিপি থেকে জানা যায় যে রাজার বিনা সম্মতিতে সাধারণ ব্যক্তি ভূমিদান করতে পারত না। কিন্তু

১। কোলব্রুক, মিসলেনিয়স এসেজ, ii, ২৩

২। কিন্তু কাত্যা, শ্লোক ৭২২-এ মনুর বাবস্থার পুনরাবৃত্তিই করেছেন।

৩। নারদস্মৃতি V, ৩৭, বৃহস্পতিস্মৃতি, XV, ২৩, তুঃ কানে, হি. ধ. শা. ii, ১৮২

৪। V, ৪২-৩। তুঃ কাত্যার দাসমুক্তি-সম্পর্কীয় নিয়ম (শ্লোক ৩৫)। কিন্তু নারদস্মৃতিতে এ কথাও বলা হয়েছে যে কিছু বিশেষ শ্রেণীর দাসদের তাদের প্রভুর ইচ্ছা ছাড়া মুক্ত করা চলে না (শ্লোক ২৯)।

৫। কাত্যা, শ্লোক ৩৫০

৬। XIII, ৩৮

৭। XXVI, ১০, ২৮, ৪৩, ৫৩ এবং ৬৪

৮। এ. ই. XX, নং ৫, প ৫-১১

উভয় স্থানেই রাজা সাধারণতঃ অসম্মতি জানাতেন না, ফলে শুধু রাজা বা তাঁর সামন্তগণই নয়, সাধারণ ব্যক্তিরাও গ্রাম বা ভূমিখণ্ড দান করতেন।

পাঁচশ 'কবীস' পরিমাণ জমির কথা অথবা মৌর্যকালীন রাজকীয় কৃষিক্ষেত্রের কথা আলোচ্যকালে আর শোনা যেত না। শিলালিপিতে কখনও এক কুল্যবাপ আবার কখনও বা চার কুল্যবাপ, আবার কখনও আড়াই বা দেড় 'দ্রোণবাপ' ভূমিখণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] এসব কোনোমতেই বৃহৎ ভূমিখণ্ডের ইঙ্গিত দেয় না। পার্জিটরের মতে এক 'কুল্যবাপ' জমি মাপে এক একর জমির থেকে সামান্য বেশি ছিল।[২] কিন্তু আলোচ্যকালে 'কুল্যবাপ' যদি আসামের কাছাড় জেলার অনুরূপ হয়ে থাকে তা হলে[৩] এক কুল্যবাপ তের একর জমির সমান হবে। যেহেতু এক কুল্য আট দ্রোণের সমান অতএব এক দ্রোণবাপ পরিমাণ জমি দুই একরেরও কম হবে। সমকালেই গুজরাটস্থিত বলভীর মৈত্রক রাজাদের ভূমি অনুদানের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে ভূমিখণ্ডের আয়তন সাধারণতঃ দুই বা তিন একরের বেশি হত না।[৪] জমির আয়তন কমে যাওয়ার ফলে চাষ-আবাদের জন্য অধিক সংখ্যায় দাস ও শ্রমিক নিয়োগ করা আর্থিক দৃষ্টিতে লাভজনক ছিল না। কাজ করার জন্য দু-চারজনকে রেখে বাকি সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বৈশ্যরা যে কৃষক ছিল এই মামুলী ধারণা মৌর্যোত্তরকাল এবং গুপ্তকালের সাহিত্যে পাওয়া যায়।[৫] অমরকোষে কৃষকের পর্যায়বাচী শব্দগুলিকে বৈশ্যবর্গে দেওয়া হয়েছে।[৬] কিন্তু শূদ্ররাও যে বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় কৃষক হয়ে যাচ্ছিল, এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। বেশ কয়েকটি স্মৃতিগ্রন্থে শূদ্রদের অর্ধেক ফসলের ভাগচাষে জমি দেওয়ার উল্লেখ আছে।[৭] এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে শূদ্র ভাগচাষীদের জমি বন্দোবস্ত দেবার প্রচলন ক্রমশ বাড়ছিল। ২৫০-৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি একটি পল্লব ভূমিদানপত্র থেকে জানা যায় যে যখন একটি ভূমিখণ্ড ব্রাহ্মণদের দান করা হল, তখনও উক্ত ভূমিখণ্ডে চারজন ভাগচাষী (আধিকঃ) যথাবৎ থেকে গিয়েছিল।[৮] সম্ভবতঃ এরা শূদ্র ছিল।

১। এ. ই. XX, নং ৫, প ৫-১১
২। ই. এ XXXIX, ২১৫-৬
৩। হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল, i, ৬৫২। এস. কে. মাইতির মতে এক কুল্যবাপে ১৪.৪ থেকে ১৭.৬ একর জমি হত।
৫ ৪। কে. জে. বীরজী, এনিসিয়েন্ট হিস্ট্রী অফ সৌরাষ্ট্র, পৃঃ ২৪৬-৭, ২৬৭
করা ৮ শান্তিপর্ব, ৬০, ২৪-৬, ৯২-২
ii, ৯, ৬
১। মনুস্মৃতি IV, ২৫৩; বিষ্ণুপুরাণ LVII, ১৬; যাজ্ঞবল্ক্য i, ১৬৬
২। এ. ই. i, নং ১, প ৩৯

নারদ সাক্ষীদানে অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকায় 'কীনাশ'দের (কৃষক) অন্তর্ভূত করেছেন।[১] সপ্তম শতাব্দীর একজন টীকাকার কীনাশ[২] শব্দের অর্থ শূদ্র বলেছেন।[৩] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে কৃষকদের শূদ্ররূপে গণ্য করা হত। বৃহস্পতি জমির সীমানা-সম্বন্ধীয় কলহে নেতৃত্বকারী শূদ্রের জন্য কঠোর শারীরিক শাস্তির বিধান দিয়েছেন।[৪] এর থেকেও সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে শূদ্রদের অধিকারে জমি ছিল। হুয়েন স্যাঙও শূদ্রদের চাষীদের শ্রেণীবিশেষরূপে বর্ণনা করেছেন।[৫] দশম খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত নরসিংহপুরাণেও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায়।[৬] এইভাবে গুপ্তযুগ থেকে আরম্ভ করে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত শূদ্রগণ কৃষকে পরিণত হয়ে গেল। শূদ্ররা যে প্রধানতঃ কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভূত তা পূর্বকাল অপেক্ষা গুপ্তকালে এবং গুপ্তোত্তরকালেই অধিকতর সত্য বলে মনে হয়।[৭] এইভাবে শূদ্রদের দাস বা ভাড়াটে শ্রমিক থেকে কৃষকে রূপান্তর সামন্তবাদের অভ্যুদয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণরূপে গণ্য হবে।

ব্রাহ্মণদের জমিদান করাটা শূদ্র চাষীরা খুব ভাল চোখে দেখত না। গয়া জেলায় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাপ্ত একটি দানপত্রে ব্যবহৃত 'শূদ্রকরেদরক্ষুণঃ' শব্দটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে দানটিকে শূদ্রদের হাত থেকে রক্ষা করতে বলা হয়েছে।[৮] দাতা তার বংশধরদের এবং অন্যান্যদের এই নির্দেশ দিয়েছে যে প্রদত্ত সম্পত্তির ভোগে দানগ্রহীতাকে কেউ যেন বাধা না দেয়, সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রদের হাত থেকে জমিটিকে রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দান দেওয়া সম্পত্তির ভোগ উচ্চ এবং নীচ উভয় পক্ষ থেকেই বিপদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কোনো দানপত্রে শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি দেখে মনে হয় কৃষকদের মধ্যে ধর্মীয় দানের আধ্যাত্মিক গুরুত্বের প্রচার হওয়ায় তাদের বিরোধিতা শান্ত হয়েছিল।

স্বাধীন আত্মনিভরশীল আর্থিক ব্যবস্থার ফলে ইউরোপে সামন্তবাদের বিকাশ

১। i, ১৮১
২। হি. কা. ই. পি. iii, ২৯৯
৩। নারদস্মৃতি (i, ১৮১) সম্পর্কে অসহায়ের মন্তব্য
৪। XIX, ৬
৫। ওয়াটর্স, অন উয়ান চুয়াংস ট্রাভেলস্ ইন ইণ্ডিয়া i, ১৫৮
৬। ৫৪'১০-১৫
৭। কে. হি. ই. i, ২৬৮
৮। জ. এ. সো. ব. (নিউ সিরিজ ১৯০৯) ১৬৪। মহারাজ নন্দনের অমৌনা তাম্রশাসন (এ. ই X, নং ১০)-এর সম্পাদনা প্রসঙ্গে টি. ব্লাক বলেছেন যে এই শব্দসমষ্টিকে 'শূদ্রে কেনোৎকীর্ণম্' পড়া উচিত। কিন্তু এরূপ করার কোনো কারণ নেই। স্পষ্টতঃই এটিকে 'শূদ্রকরেভ্রক্ষুণঃ' পড়া যায়—যদিও এটি অশুদ্ধ সংস্কৃত।

ঘটেছিল। ভূমিদান ও অন্যান্য কারণে ভারতেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রহীতাকে বিভিন্ন প্রকার দান দেওয়ার ফলে দানদত্ত ভূখণ্ডের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। নিজ এলাকায় আর্থিক উন্নয়নের জন্য দান-গ্রহীতারা কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাদের অপেক্ষা স্থানীয় শ্রমিক চাষীদের উপরই বেশী নির্ভরশীল ছিল। দানগ্রহীতা সমস্ত-প্রকার স্থানীয় কর আদায়ের অধিকারী ছিল এবং তারা প্রাপ্ত রাজস্বের একটা মোটা অংশ স্থানীয় কর্মোদ্যোগেই নিয়োগ করত। গ্রামের আত্মনির্ভরশীল অর্থব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখার জন্যই কৃষকদের তাদের চাষের জমির সঙ্গে আবদ্ধ রাখা হত। দক্ষিণ বিহারে একই উদ্দেশ্যে আর একটি উপায় অবলম্বন করা হত। সমুদ্রগুপ্তের নামে, সম্ভবতঃ ৭ম-৮ম শতাব্দীর দুটি জাল তাম্রপত্রে অগ্রহারিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে যেন কোনো ভিন্ন গ্রাম থেকে করদাতা চাষী বা শ্রমিককে নিজ এলাকায় থাকতে না দেয়।[১] অগ্রহাররূপে প্রাপ্ত গ্রাম কর ও শুল্ক থেকে মুক্ত ছিল। সেজন্য কাছাকাছি গ্রামের অধিবাসীরা করমুক্ত এলাকায় আসতে উৎসুক থাকত। কিন্তু তাদের নিজ গ্রাম ত্যাগ করে আসতে দিলে রাজস্বের হানি হত এবং সেই জন্য তারা যে গ্রাম ত্যাগ করে আসত সেই গ্রামের অর্থব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হতে পারত। অতএব গ্রামের আত্মনির্ভরশীল অর্থব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এই প্রকার প্রতিবন্ধক উপযুক্তই ছিল।

দান দেওয়া হয় নি এমন যে সকল গ্রাম গ্রামপ্রধানদের অধীনে ছিল, সেগুলির অবস্থাও যে ভিন্ন ছিল তা নয়। আমরা দেখেছি যে বাৎস্যায়নের কামসূত্রানুযায়ী গ্রামপ্রধান কৃষকরমণীদের তার ক্ষেতে কাজ করতেই শুধু নয়, তাদের সুতো কাটতেও বাধ্য করতে পারত, যাতে প্রয়োজনের বস্তু বাইরে থেকে কিনতে না হয়।[২] এইভাবে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে কিছু বিক্রয় করাও হত, অবশ্য তার অধিকাংশই স্থানীয় ব্যক্তিদের সাধারণ আবশ্যকতা পূরণ করতেই ব্যয় হয়ে যেত।[৩] মৌর্যকালের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও ব্যবসায় এইভাবে ক্রমশ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে স্থানীয় প্রধানদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকল।

সাধারণ মুদ্রার অভাব গুপ্তকাল থেকে আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থার স্থানীয় কেন্দ্রগুলির উদ্ভবের প্রমাণ বলে গণ্য হতে পারে। সাধারণ মুদ্রার অভাব সূচিত করে যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের অবনতি ঘটেছিল এবং স্থানীয় আবশ্যকতা পূরণের জন্য

১। ক. ই. ই. iii, নং ৬০, প ১১-৩
২। V, ৫'৫
৩। ঐ

স্থানীয়ভাবে ভোগ্যপণ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল।[১] এর ফলে কেন্দ্রের ক্ষমতা কমে যাচ্ছিল এবং কেন্দ্র তার কর্মচারীদের নগদ মুদ্রায় বেতন না দিয়ে, বস্তুর দ্বারা অথবা রাজস্বের অংশবিশেষ দিয়ে বেতন দিতে আরম্ভ করে। ভারতীয় ব্যাক্ট্রিয়াই শাসকগণ বিশেষ করে কুষাণগণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তাম্রমুদ্রা বাজারে ছেড়েছিলেন, সেগুলি স্পষ্টতঃ পাঞ্জাবে বহুলভাবে ব্যবহৃত হত এবং সুদূর পূর্ব বিহারের বক্সারেও পাওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র কুমারগুপ্ত ছাড়া অন্যান্য গুপ্তরাজগণ খুব কমই তাম্রমুদ্রা জারী করেছিলেন। অতএব ফা-হিয়েনের এই বিবরণ সত্য বলেই মনে হয় যে বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম ছিল কড়ি। তামা যদিও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু অপেক্ষা ক্ষয়শীল, তবু তুলনামূলকভাবে গুপ্তকালের তাম্রমুদ্রার বিরল প্রাপ্তিতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে মুদ্রাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সমসাময়িককালে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে রাজা-মহারাজা এবং সাধারণ ব্যক্তিগণও মন্দির ও ব্রাহ্মণ ইত্যাদিকে নগদ মুদ্রায় দান দিতেন কিন্তু গুপ্তোত্তরকালে উক্ত উদ্দেশ্যে আংশিকভাবে ভূমি অনুদানের সাহায্য গ্রহণ করা হত। পূর্ববর্তীকালে সাতবাহন রাজগণ খুব কম ভূমি অনুদান দিয়েছিলেন এবং কুষাণ রাজাগণ ত ভূমি অনুদান দেনই নি। এঁদের রাজত্বকালে শিল্পী ও শ্রমিক সমাজকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নগদমুদ্রা অনুদানরূপে দেওয়া হয়ে থাকত। হর্ষোত্তরকালের এমন একটিও মুদ্রা পাওয়া যায় না যার সম্বন্ধে বলা চলে যে অমুক মুদ্রাটি অমুক রাজা প্রচলন করেছিলেন। এই কালে একমাত্র বলভীর মৈত্রক রাজবংশের কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া যায়, সেগুলিও ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে বলভীকালের মুদ্রা বলে স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং সেগুলির সঙ্গে গুপ্তযুগের মুদ্রার সাদৃশ্য থাকায় সেগুলিকে গুপ্তকালের মুদ্রা বলেই মনে করতে হয়।[২] অবশ্য স্মৃতিগ্রন্থে মুদ্রা প্রচলনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভূমি অনুদান-পত্রে হিরণ্য বা স্বর্ণের দ্বারা কর আরোপ বা আদায়ের উল্লেখ এবং কয়েকটি শিলালিপিতে নির্মাণব্যয় ও ক্রয়মূল্যের হিসাব মুদ্রায় করার উল্লেখ আছে, তা সত্ত্বেও এমন মুদ্রা খুব কমই পাওয়া গিয়েছে যেগুলিকে এ যুগের মুদ্রা বলে স্বীকার করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রার অভাবের দিনে বহু পণ্ডিতের দৃষ্টি

১। মনে হয় মধ্যযুগের প্রারম্ভে দেশের বাইরে উপনিবেশ স্থাপনের এবং বিদেশী বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার তটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্যমী ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা অভ্যন্তরীণ অর্থব্যবস্থার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

২। ডঃ পি. এল. গুপ্ত আমাদের এই কথা বলেছেন।

আকৃষ্ট হয়েছে।[১] সাহিত্যে মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়[২] বটে কিন্তু সেগুলিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া যায় না কারণ সেগুলি অধিকাংশই দশম শতাব্দীর পরবর্তীকালে রচিত। অতএব এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে হর্ষবর্ধনের কাল থেকে মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন কমে গিয়েছিল এবং নাগরিক জীবনও ধ্বংসোন্মুখ হয়েছিল। ভারতের এই অবস্থার সঙ্গে তৎকালীন ইরানের অনুরূপ অবস্থা তুলনীয়।

গুপ্তযুগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সদ্য প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে রোমসাম্রাজ্যের পতন এবং বাইজাণ্টাইনসাম্রাজ্যের সঙ্গে পারস্যসাম্রাজ্যের প্রতি-দ্বন্দ্বিতার কারণে ভারতের ব্যবসায় খুব কমে গিয়েছিল এবং ভারতের আর সেই অবস্থা ছিল না যেমন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল। যে বিষয়ে প্লিনী ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন যে ভারতীয় দ্রব্যের জন্য রোমক মুদ্রা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে।[৩] এই ব্যবসায়ে দুটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বস্তুর একটি ছিল রেশম যা ভারত পারসিক বণিকদের সাহায্যে রপ্তানি করত এবং দ্বিতীয় ছিল মসলা।[৪] বাইজাণ্টাইনসাম্রাজ্য রেশমী বস্ত্রের ব্যবসায় এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সমগ্র দেশে তার মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য জাস্টিনিয়ন (৫২৭-৫৬৫) এমন আইন করেছিলেন যে এক পাউণ্ড রেশমের মূল্য ৮ খণ্ড স্বর্ণের বেশি হতে পারবে না এবং যদি কেউ এই নিয়ম লঙ্ঘন করে তা হলে তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে।[৫] পার্সীরা খুব উচ্চমূল্যে রেশম বিক্রয় করত, ফলে বাইজাণ্টাইনদের মুদ্রা পারস্যে চলে যেত; এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য জাস্টিনিয়ন ইথিওপিয়াকে ভারত থেকে রেশম কিনে ব্যবসা করতে পরামর্শ দেয়। তা হলে ইথিওপিয়ার বেশ লাভ হত বাইজাণ্টাইনদেরও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পারস্যকে মুদ্রা দিতে হত না।[৬] কিন্তু ইথিওপিয়ার পক্ষে ভারতীয় রেশম সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। কারণ আরও পূর্বদিকের বন্দরগুলিতে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজগুলি প্রথমে দাঁড়াত এবং সেখান থেকেই পারস্য বণিকরা সমস্ত রেশম কিনে নিয়ে রেশমের একরকম একচেটিয়া ব্যবসা করত।[৭] এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে ভারত যেমন মসলার ব্যবসায়ে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করত, ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বার্ধে তেমনই রেশমের ব্যবসায়ে

১। সি. জে. ব্রাউন, দি কয়েন্স অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৫০, তুঃ পৃঃ ৫৫
২। জা. নি. সো. ই. XXV, ভাগ ১-এ প্রকাশিত এল. গোপালের প্রবন্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকসূত্রের উল্লেখ আছে।
৩। এস. কে. মাইতি, দি ইকনমিক লাইফ অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া ইন গুপ্ত পিরিয়ড, পৃঃ ১৩৯
৪। ঐ, পৃঃ ১৩৬-৮
৫। ঐ, পৃঃ ১৩৭
৬। রিচার্ড প্যাকহার্স্ট—ইন্টোডাকশন টু ইকনমিক হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৪৬
৭। ঐ, পৃঃ ৪৬-৭

মুদ্রা অর্জন করতে থাকল। প্রথম শতাব্দীতে রোমসাম্রাজ্য থেকে সোনার বহির্গমন আইনের সাহায্যে বন্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু বাইজান্টাইন শাসনকালে তদুপরি কূটনৈতিক সাহায্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও সোনার বহির্গমন রোধ করা যায় নি। এই সমস্যার সমাধান হয়েছিল ৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে, যখন স্থলপথে গোপনে চীন থেকে রেশম উৎপাদনকারী কীট বাইজান্টাইনসাম্রাজ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হল।[১] রেশমকীট পরিপালন ইত্যাদি শিক্ষায় আরও ৫০ বছর লেগে থাকতে পারে এবং মনে হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিক থেকে রেশম সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়ে গিয়ে থাকবে। এর ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিপর্যস্ত হল, বিশেষ করে উত্তর ভারতের বাণিজ্য, কারণ উত্তর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য রেশমবস্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একে গুপ্তকাল পর্যন্ত পশ্চিমোত্তর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য খুব কমে গিয়েছিল, তার উপরে বাইজান্টাইনসাম্রাজ্যে রেশমবস্ত্রের রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যতক্ষণ না অন্য কোনো পণ্য রেশমের স্থান অধিকার করে, ততদিন বৈদেশিক বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, ফলে মন্দা ছিল অনিবার্য।

ইসলামের পতাকাতলে সমবেত আরবদের প্রসারের ফলেও ভারতের বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে। অন্ততঃ গোড়ার দিকে পশ্চিম এসিয়া, মিসর ও পূর্ব ইউরোপের রাজ্যসমূহ আরবদের বিজয় অভিযানের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, যার প্রতিকূল প্রভাব নিশ্চিতভাবে পড়েছিল পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যে। পরে লক্ষিত হবে যে আরবগণ যখন এই সমস্ত দেশে এবং সিন্ধুপ্রদেশে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল অর্থাৎ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে, তখন ভারতের বহির্বাণিজ্যে আবার উন্নতি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে অবনতি রোধ করার কোনো উপায় ছিল না। অতএব গুপ্তযুগের সমাপ্তিকাল থেকে, বিশেষ করে সপ্তম শতাব্দীর পূর্বার্ধ থেকে পশ্চিমোত্তর ভারতের বহির্বাণিজ্য ক্রমে হ্রস্ব হয়ে পড়েছিল, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পরের শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু এর ফলে বাইজান্টাইনসাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছিল তার কতটা পূরণ হয়েছিল তা বলা কঠিন। নবম-দশম শতাব্দীর একটি চৈনিক বিবরণে সপ্তম শতাব্দীতে চীনে ভারতীয় ব্যবসায়ী অবস্থানের কথা জানতে পারা যায়।[২] কিন্তু উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্ভবতঃ বিলাসদ্রব্যের

১। ঐ, পৃঃ ৪৭

২। এন. সি. সেন কৃত একাউন্টস অফ ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড কাশ্মীর ইন দি ডাইনেষ্টিক হিষ্ট্রীজ অফ দি তঙ্গ পিরিয়ড (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিতব্য)

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ভারতে অভ্যন্তরীণ ক্রয়-বিক্রয়ে কড়ির প্রচলন বহির্বাণিজ্যকে নিশ্চয়ই উৎসাহিত করে নি।

শিল্পী ও বণিক সংঘের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্মৃতিগ্রন্থসমূহে যে বিস্তারিত নিয়ম নির্ধারিত করা হয়েছিল তার থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও সামন্তবাদী রূপ ধারণ করেছিল। এই সকল সংঘের নিয়মাবলী শুধু রাজার পালন করলেই হল না অন্যান্যরাও যাতে নিয়মপালন করে তা দেখাও রাজার কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। বৃহস্পতি বলেছেন সংঘ-প্রধানেরা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কোমল বা কঠোর যে ব্যবহারই করুক না কেন, রাজার তা অনুমোদন করা উচিত।[১]

প্রকৃতপক্ষে অবস্থা কিরূপ ছিল তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় পশ্চিম ভারতের তটবর্তী এলাকার রাজাদের দ্বারা বণিকসংঘকে প্রদত্ত সনদসমূহ থেকে। এই সনদ-গুলি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের বছরগুলি অষ্টম শতাব্দীর সুরুর বছরগুলির মধ্যে জারী করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে প্রথম সনদটির অনুবাদ প্রথমে করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সরকার[২] এবং পরে তার টীকাসহ অনুবাদ করেছিলেন দামোদর কোসাম্বী।[৩] ব্যবসায়ীরা কি কি পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায় করতেন তা এই সনদ থেকে জানা যায়। এতে মদ, শর্করা, আদা, নীল, তেল, বস্ত্র, কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যাদি, লৌহ ও চর্ম ইত্যাদির উল্লেখ আছে। পণ্যদ্রব্যের মূল্য এবং মাপ ও ওজনের উপর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ সনদটিতে আছে[৪] তবে সেই নিয়ন্ত্রণ এতটা কঠোর নয় যতটা কঠোর নিয়ন্ত্রণের বিধান কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে দিয়েছেন। সব মিলিয়ে ব্যবসায়ীসংঘ যে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করত তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের অনেক কর থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল এবং অধীনস্থ কর্মচারী ও শ্রমিকদের উপরে যথেচ্ছ ব্যবহারের স্বাধীনতাও তাদের ছিল।[৫] কর্মকার, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার এবং অন্যান্য শ্রমিকশিল্পীদের কাছ থেকে বেগার আদায় করার অধিকারও তাদের দেওয়া হয়েছিল।[৬] কিন্তু ব্যবসায়ীদের সংঘসমূহের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার কোনো অবকাশ ছিল না কারণ একই বাজারে ব্যবসা করার অনুমতি তাদের দেওয়া

১। বৃহস্পতিস্মৃতি, XVII, ১৮
২। এ. ই. XXX, ১৬৩-৮১
৩। জা. ই. সো. হি. ও. ii, ২৮১-৯৩
৪। এ. ই. XXX, নং ৩০, প ১০
৫। ঐ, প ৮
৬। এ. ই. XXX, নং ৩০, প ২৮

হয় নি।[১] অবশ্য কিছু শিল্পীব্যবসায়ীকে সরকারকে বাজারদরের অপেক্ষা অর্ধমূল্যে জিনিস দেওয়ার[২] এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে করের বদলে শ্রম আদায়ের উল্লেখ আছে। তা ছাড়া বণিকদের সীমান্তকর, চুঙ্গি, বিক্রয়কর ইত্যাদিও দিতে হত। তার পরিবর্তে তাদের এই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে তাদের এলাকায় কোনো রাজ-পদাধিকারী প্রবেশ করবে না, বা তাদের জন্য কোনো কর বা খোরাকিও দিতে হবে না।[৩] পুত্রহীন ব্যবসায়ীর সম্পত্তি অধিগ্রহণের অধিকারও সরকার পরিত্যাগ করেছিল, যদিও বৃহস্পতি তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে রাজাকে এ অধিকার দিয়েছেন এবং শকুন্তলম্ নাটকে এর প্রয়োগের উদাহরণও পাওয়া যায়। বণিগ্‌গ্রামকে প্রদত্ত এই সুবিধাগুলি খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে মন্দির ও ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার অনুরূপ এবং এর ফলে তটবর্তী অঞ্চলে স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে এমন কোনো সনদ পাওয়া যায় না, কিন্তু কোঙ্কন অঞ্চলের চালুক্যরাজ ভোগশক্তি দ্বারা অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে জারী করা দুটি সনদে ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব যে অনেক বেড়ে গিয়েছিল তার উল্লেখ আছে। তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের কারবার করতে পারত। একটি ক্ষেত্রে একটি মন্দিরকে আটটি গ্রাম ও প্রচুর ধন দান করা হয়েছিল এবং পাঁচ বা দশ জনের ব্যবসায়ীদলকে তার ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবসায়ীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা বার্ষিক ধর্মীয় শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করবে—তার পরিবর্তে এদের চুঙ্গীকর এবং রাজপদাধিকারীর খোরাকি যোগান দেওয়ার দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল।[৪] অন্য আর একটি ক্ষেত্রে একটি পরিত্যক্ত শহরকে পুনরায় বসতিপূর্ণ করে, তৎসহ সংলগ্ন তিনটি গ্রাম দুইজন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের একপ্রকার নগরপালকের সনদ দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবসায়ীদের ভোগশক্তির সমগ্র রাজ্যে চুঙ্গীকর থেকে চিরকালের জন্য রেহাই দেওয়া হয়েছিল আরও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলেও তাদের সম্পত্তি রাজা বাজেয়াপ্ত করবেন না এবং কোনো রাজপদাধিকারীও তাদের গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না বা তাদের কাছ থেকে কোনো খোরাকি দাবী করতে পারবে না।[৫] অবশ্য যৌন ব্যাভিচার বা

১। কোসাম্বী 'সর্বশ্রেণীনাঙ্ককাপনাক ন দেয়:' (এ. ই. XXX, নং ৩০, প ৬)-এর অর্থ করেছেন—সকল শ্রেণীকে একই প্রকার বাণিজ্যকর দিতে হত না (জা. ই. সো. হি আ. ii, ২৮৬) কিন্তু তার পরের অংশ অর্থাৎ 'সর্বশ্রেণীভিঃ খোবা (?) দানম্ ন দাতব্যম্'-এর প্রতি দৃষ্টি দিলে এরূপ অর্থ সমীচীন বলে মনে হয় না।

২। এ. ই. XXX, নং ৩০, প ২৮

৩। ঐ, প ৬৯

৪। ক. ই. ই. iv, নং ৩১, প ২৫-৪৯, ৫৬-৬২

৫। ঐ, XXXII, প, ২৭-৩৮

দৈহিক আঘাত ইত্যাদির জন্য ব্যবসায়ীদের জরিমানা দিতে হত ; কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে বিচারভার ছিল শহরের আটজন অথবা ষোলজন বরিষ্ঠ ব্যক্তির হাতে।[১]

এই সনদগুলিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। প্রথম—অনুদান কারিগরদের দেওয়া হয় নি বরং ব্যবসায়ীদের দেওয়া হয়েছিল এবং দানে দেওয়া সম্পত্তি বা নগরের ব্যবস্থাপনার অধিকারও তাদের অনেককেই দেওয়া হয়েছিল। এইরূপ ব্যবস্থাপকদের সংখ্যা বৃহস্পতির স্মৃতিগ্রন্থে বিহিত সংখ্যার অনুরূপ। বৃহস্পতির বিধান অনুসারে তিন বা পাঁচ ব্যক্তির মন্ত্রণাসমিতি নিযুক্ত করা উচিত।[২] দ্বিতীয়—এই সনদে গ্রাম-ব্যবস্থাপনার ভারও ব্যবসায়ীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে গ্রামগুলি একটি ক্ষেত্রে মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, আরেকটি ক্ষেত্রে শহরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এই ব্যবসায়ীদের সনদে প্রাপ্ত গ্রামে এমন সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যা সামন্তসর্দারগণ এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অনুদানে প্রাপ্ত গ্রামে ভোগ করতেন। কিন্তু গ্রামের ব্যবস্থাপনায় লিপ্ত থাকায় ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ ব্যবসায়ে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারত না। এই সনদগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে বণিকেরাও জমির মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে যাওয়ায় তারা ক্রমশ সামন্তে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। তৃতীয়—এক-একটি বণিকসংঘের ক্রিয়াকলাপ নিজ এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল যাতে সে অন্য সংঘের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে। এটি মধ্যযুগীয় নিশ্চল অর্থব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য।

প্রায় অনুরূপ একটি চতুর্থ সনদপত্র মহীশূরের ধারওয়ার জেলায় পাওয়া গিয়েছে। বাদামী চালুক্য যুবরাজ বিক্রমাদিত্য পারিগিরি (অর্থাৎ আধুনিক লক্ষেশ্বর শহর) নগরের মহাজনদের (সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ নাগরিক) প্রায় ৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সনদ জারী করেছিলেন। এই সনদে রাজকর্মচারীরা এবং শহরের অধিবাসীদের পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[৩] রাজপদাধিকারীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন রাজকীয় দান ও ঘোষণার মর্যাদা রক্ষা করে, খালি বাড়ি দেখাশোনা করে এবং দানগ্রহীতার ভোগে কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখে।[৪] অন্যদিকে নগরবাসী প্রত্যেক পরিবার জেলাশাসককে কর দেবে সে কথা বলা হয়েছে।[৫] মহাজনসংঘকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে সে গৃহস্থের আর্থিক সামর্থ্যানুযায়ী কর আদায় করতে এবং ছোটখাটো অপরাধের জন্য

১। ঐ
২। XVII, ১০
৩। এ. ই. XIV, নং ১৪
৪। ঐ, ১৮৯
৫। ঐ, ১৯০

দুষ্কৃতকারীকে জরিমানা করতে পারবে এবং নিঃসন্তানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।[১] শহরে অনেকগুলি মহাজনসংঘ ছিল, কারণ প্রত্যেক পরিবারকে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে কাংস্যকারসংঘকে কর দিতে বলা হয়েছে। এই সনদ সংঘের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা ও স্বয়ংনির্ভরতার ইঙ্গিত দেয়। তাদের শহরের অধিবাসীদের কাছ থেকে শুধু ধর্মীয় করই নয়, অন্যান্য-বিষয়ক কর আদায় করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল।

গুপ্তকালে চুঙ্গী বা করের আয় থেকে মন্দিরকে অনুদান দেওয়ার একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। রাজা অথবা সদারগণ ধর্মীয় প্রয়োজনে কিছু নগদ দান করেই সন্তুষ্ট থাকতেন।[২] একবার পাঁচজনের এক সমিতিকে অর্থ সমর্পণ করে দেওয়া হয়েছিল, এই দৃষ্টান্ত থেকে মনে হয় যে কুষাণকালীন রীতি এখনও প্রচলিত ছিল। কুষাণকালে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে বহু মহাজনশ্রেণীব আবির্ভাব হয়েছিল যারা ধর্মীয় প্রয়োজনে প্রদত্ত অর্থ জমা রাখত এবং সুদ দিত।

পশ্চিম ভারতে গুপ্তকালের পূর্বে অসংখ্য শিল্পীসংঘ ছিল—গুপ্তকাল বা গুপ্তোত্তরকালেও তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। কিন্তু তাদের কোনো সনদ দেওয়া হয় নি, যদিও বণিকসংঘকে সনদ দেওয়া হয়েছিল। গুপ্তযুগে জারী করা একটি সনদে দেখা যায় যে মন্দির বা পুরোহিতদের যেমন কর্তৃত্বাধিকার দেওয়া হত, বণিকসংঘকেও তেমনই কারিগরদের উপর অধিকার দেওয়া হয়েছিল। মন্দির ও পুরোহিতদের দানপত্রের মানে গ্রামাঞ্চলে কেন্দ্রীয় অধিকাব পরিত্যাগ আর বণিক-সমাজকে প্রদত্ত শহর অঞ্চলে কেন্দ্রের অধিকার ত্যাগ। প্রথম ক্ষেত্রে দানগ্রহীতার প্রয়োজনে জমির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদেরও হস্তান্তর করা হত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বণিকসংঘেব প্রয়োজনে শিল্পী ও শ্রমিকদের উপর তাদের অধিকার দেওয়া হত। প্রথম ক্ষেত্রে পুরোহিতকে গ্রাম্য অধিবাসীদের উপর কর বসাবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বণিকদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল নাগরিকদের উপর কর বসাবার। যাই হোক, পশ্চিম ভারতে কর্ণাটকের রাজাদের দ্বারা জারী করা সনদের সঙ্গে মধ্যযুগে অনুরূপ সংঘকে প্রদত্ত সামন্তবাদী সনদের তুলনা হতে পারে। এই সনদ-সমূহ এবং ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত বিধানসমূহ থেকে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে বণিকসমাজ ক্রমশ রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছিল।

মৌর্যোত্তরকাল এবং গুপ্তকালে 'নিগম' কর্তৃক মুদ্রা জারী করার ঘটনা স্বতন্ত্র ও-

১। ঐ
২। ক. ই. ই. iii, নং ৫, ৭, ৮, ৯
৩। ঐ, নং ৫, তুঃ জা. ই. সো. হি. আ. ii, ২৮৩

স্বনির্ভর অর্থনৈতিক কেন্দ্রের উদ্ভবের পরিচায়ক। মুদ্রা জারী করা রাষ্ট্রব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—এর ব্যতিক্রমে দেশে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া আমরা দেখতে পাই যে নালন্দার গ্রাম কর্তৃক নিজস্ব সীলমোহর জারী করা এবং গুপ্তযুগেই নিজেকে জনপদরূপে ঘোষণা করা[১] এ কথারই ইঙ্গিত দেয় যে এই গ্রাম কেবল রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও স্বনিভর কেন্দ্রে পবিণত হয়েছিল। গ্রাম দ্বারা জারী করা কমপক্ষে চারটি সীলমোহরকে সনাক্ত করা যেতে পারে। পূর্বে মুদ্রা ও সীলমোহর শুধু নিগমই জারী করত। কিন্তু গুপ্তোত্তরযুগে গ্রাম্য কেন্দ্রগুলিও এইরূপ করতে আরম্ভ করেছিল।

গুপ্তযুগে জলসেচন ব্যবস্থাও স্থানীয় দায়িত্বে পরিণত হতে থাকল। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার সেচনকার্যের জন্য কিষাণদের দেয় কব নির্ধারণ করেছেন। এব দ্বারা বোঝা যায় যে প্রধানতঃ রাজ্যেব দ্বাবাই সেচব্যবস্থা করা হত। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকেও জানা যায় যে বাজ্য সেচনিরীক্ষক নিযুক্ত কবতেন। শক রাজা রুদ্রদমন (আনুমানিক ১৫০ খ্রীঃ) দাবী করেছেন যে প্রজাদের কাছ থেকে কোনো অতিরিক্ত কর বা বেগার আদায় না করেও, তিনি সৌরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সুদর্শন সরোবরের জীর্ণোদ্ধার করেছিলেন। গুপ্তযুগে এ ধরনের কাজের দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের। কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম থেকেই নিজ নিজ এলাকাতে স্থানীর লোকেরা জলসেচন ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করেছিল। ডায়ন ক্রাইসাস্টম (প্রায় ৫০-১১৭ খ্রীঃ) বলেন যে ভারতে ছোট ও বড় নদী থেকে জলসেচনের জন্য স্থানীয় লোকেরা নিজেরাই খাল কেটে নিত।[২] পরে বৃহস্পতির স্মৃতিগ্রন্থে বলা হয়েছে যে জলসেচের ব্যবস্থাব দেখাশোনা সংঘেরই করা উচিত্।[৩] উপাদানের অভাবে আমরা এই প্রক্রিয়ার ইতিহাস জানতে অক্ষম। কিন্তু একবার যখন এই প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়েছিল তখন তার প্রভাব কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে দুর্বলতর করতে থাকল এবং তা গ্রামাঞ্চলে স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার সহায়তা করতে বাধ্য।

এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আমরা কিছু পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত করতে পারি। ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ইংল্যাণ্ডের মত সৈন্য-সরবরাহকারীকে জায়গীর দান করার ফলে ঘটে নি। বরং এখানে ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে

১। মজুমদার ও আলটেকর, দি বাকাটক গুপ্ত এজ, পৃঃ ২৬০

২। ওরেশিও XXXV, ৪৩৪; ম্যাক্রিন্ডল, এনিসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া এ্যাজ ডেস্ক্রাইব্ড ইন ক্ল্যাসিকাল লিটারেচার, পৃঃ ১৭৫

৩। বীরমিত্রোদয় (পৃঃ ৪২৬) মিত্র মিশ্রের মতে এটির পাঠ 'কুল্যায়ননিরোধঃ'। কিন্তু বৃহস্পতিস্মৃতিতে আছে 'কুল্যানামনিরোধঃ'।

ভূমিদানের ফলেই ঘটেছিল। এটাও স্পষ্ট যে ইউরোপের মত ভারতে সামন্তপ্রথার উদ্ভবে বিদেশী আক্রমণের কোনো ভূমিকা নেই।

ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত 'অগ্রহার' ইউরোপীয় 'ম্যানর'র সঙ্গে কিছুটা মেলে। কারণ কোথাও কোথাও গ্রহীতাকে তার প্রজাদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার বেগার নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। বেগারপ্রথার যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল এবং গ্রামপ্রধানগণ কৃষকরমণীদেরও জমিতে ও গৃহে কাজ করতে বাধ্য করত। এইভাবে গ্রামপ্রধানগণ ইউরোপের ম্যানর মালিক লর্ডদের অনুরূপ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সাধারণভাবে ইউরোপীয় কিষাণদের অধিকাংশ সময় ও শক্তি মালিকের ক্ষেতে কাজ করে ব্যয় হত, তেমনি ভারতের কিষাণরা তাদের সময় এবং উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মালিককে বা অন্য মধ্যসত্বভোগীকে দিত। অবশ্য এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে অধিকাংশ কিষাণই মধ্যসত্বভোগীর কবলিত ছিল, বরং স্বাধীন কিষাণদের সংখ্যাই বেশি ছিল বলে মনে হয়। আবার উপ-সামন্তীকরণের প্রক্রিয়া ইউরোপে যতটা ব্যাপক ছিল, ভারতে ততটা নয়, এই জন্য জমিতে যারা কাজ করত, তাদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থেকেই গিয়েছিল।

বংশানুক্রমিক প্রশাসকদের বোঝাতে শিলালিপিগুলিতে যে সকল দুর্বোধ্য শব্দ এবং ভারতের মত বিশাল দেশে এ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সম্বন্ধে অথবা সামন্ত, উপরিক, ভোগিক, প্রতীহার, দণ্ডনায়ক ইত্যাদির পারস্পরিক সম্বন্ধ কি ছিল সে বিষয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে গুপ্তকালের শেষদিকে অর্থাৎ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বংশানুক্রমিক মধ্যবর্তীগণের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং সে কারণে বহু স্বাধীন কৃষকদের অবস্থা অর্ধদাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু এখানকার সামন্ততান্ত্রিক পর্যায়গুলি ইংল্যাণ্ডের মত জটিল এবং বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল না। যদ্যপি ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এখানকার সামন্তগণের অবস্থা ইউরোপীয় সামন্তদের প্রায় অনুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তবু তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা করা কঠিন। শুধু এইটুকুই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তাদের নিজ নিজ প্রভুর জন্য সৈন্যসংগ্রহ করতে হত।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে রাজ্যের সেবা করার পুরস্কার হিসাবে সামন্তদের ভূমিদান করা হত। কিন্তু ভারতে এই প্রথা খুব সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয়। মনুর বাক্য অনুসারে দশটি গ্রামের পদাধিকারীকে ১২ বলদে চাষ করতে পারে এমন জমি অর্থাৎ প্রায় ১০০ একর জমি দেওয়া হত। গুপ্তযুগ হতে এই ধারণা বলবতী হয়ে আরম্ভ

করেছিল যে স্থানীয় জমি শুধু স্থানীয় শাসক বা পদাধিকারীরই ভোগ্য, কিন্তু পূর্বে কেন্দ্রীয়শাসন এত কঠোর ছিল যে এইরূপ মনোবৃত্তি মাথাচাড়া দিতে পারত না। ফা-হিয়েনের বিবরণের একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে রাজার অনুচর এবং দেহ-রক্ষীদের ভূমি অনুদান দেওয়া হত, কিন্তু এই অনুচ্ছেদটির অর্থ বিতর্কমূলক বলে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন। তবে হুয়েন স্যাঙ তাঁর বিবরণে পরে যে এইরকম কথাই লিখেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। হুয়েন স্যাঙ'র বিবরণ অনুসারে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ পেত রাজা এবং বাকি তিন-চতুর্থাংশ যথাক্রমে পুরোহিত, পণ্ডিত ও রাজপদাধিকারীদের জন্য সুরক্ষিত রাখা হত। এর ফলে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় সমস্ত আমলাদের জন্য রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ খরচ করা হত। এই অবস্থা মধ্যযুগের ইউরোপের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেখানেও যে সামন্তের অধীনে যত জমি থাকত তার সম্পূর্ণ রাজস্ব সে ভোগ করত। সর্ত শুধু এই ছিল যে অধীনস্থদের কাছ থেকে আদায় করা কর থেকে নিয়মিতরূপে নিজ প্রভুকে তারা কিছু নজর পাঠাবে।

সংক্ষেপে বলতে পারা যায় যে সামন্তদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুপ্তযুগ এবং বিশেষ করে গুপ্তোত্তরযুগে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ পতিত এবং আবাদী উভয়-প্রকার জমি অনুদান দেওয়া, অনুদানে প্রদত্ত ভূমির সঙ্গে সঙ্গে কিষাণদেরও হস্তান্তরকরণ, বেগারীপ্রথার প্রসার; কিষাণ, কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছ বসবাসে বাধানিষেধ, মুদ্রার অভাব, বাণিজ্যে অবনতি, রাজস্ব-ব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা ধর্মীয় অনুদানভোগীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া, রাজকর্মচারী-দের রাজস্বের অংশদানের মাধ্যমে বেতনদানপ্রথার সূত্রপাত এবং সামন্ততান্ত্রিক দায়দায়িত্বের উদ্ভব। পরবর্তীকালে এই প্রবৃত্তিগুলি কতদূর কার্যকর ছিল অথবা সংশোধিত হয়েছিল পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে তার আলোচনা করা হবে।

২

তিন রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা

(প্রায় ৭৫০—১০০০ খ্রীঃ)

গুপ্তযুগে এবং হর্ষের আমলে ভূমি অনুদানগ্রহীতাদেব যে প্রশাসনিক এবং রাজস্ব-বিষয়ক অধিকার প্রদানের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল, সেটি পরবর্তী রাজাদের সময়েও প্রচলিত ছিল। গুপ্তরাজাবা খুব কমই অনুদান দিয়েছিলেন, তবে মধ্যভারতে তাঁদের অধীনস্থ সামন্ত এবং সর্দারগণ অনেকগুলি গ্রামদান করেছিলেন। কিন্তু পালদের আমলে বাজা স্বয়ং অনুদান দিতেন। তাব প্রথম দৃষ্টান্ত ধর্মপাল, যিনি উত্তববঙ্গে নিজ সামন্ত নারায়ণবর্মণ কর্তৃক শুভস্থলীতে স্থাপিত নন্নারায়ণের মন্দিরকে চাবিটি গ্রামদান কবেছিলেন।[১] এই অনুদানের প্রকৃত ভোক্তা ছিল লাটব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও মন্দিবের অন্যান্য সেবায়েৎগণ—অনুদানভোগীরূপে তাদের উল্লেখ করা হয়েছিল।[২] 'তলপাটক' (খানাখন্দে পূর্ণ জমি) এবং 'হট্টিকা' (হাট) সমেত গ্রাম চিবকালেব জন্য দান কবা হয়েছিল। গ্রহীতাদেব এই অধিকারও দেওয়া হয়েছিল যে তাবা গ্রামেব অধিবাসীদের দশাপবাধেব জন্য জবিমানা করতে পারবে। তা ছাড়া গ্রামগুলি বাজকীয় হস্তক্ষেপ থেকেও মুক্ত ছিল।[৩] ধর্মপাল সম্ভবতঃ নালন্দা অঞ্চলে স্থানীয় জনৈক বৌদ্ধপ্রধানকে একটি গ্রামদান করেছিলেন। এ ক্ষেত্রেও গ্রামটিতে রাজকর্মচারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল এবং দানগ্রহীতাকে চোরকে শাস্তিদানের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল।[৪] অনুদানপত্রেব শেষ বারোটি পঙক্তি ঠিকমত পড়া যায় না, কিন্তু এমন অনুমান করা অসঙ্গত হয় যে গ্রামের অধিবাসীদের দানগ্রহীতার আদেশপালন করতে এবং তা:কে সর্বপ্রকার উচিত করপ্রদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[৫] দেবপালও অনুরূপ সর্তে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত মেসিকা[৬] নামক একটি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন।[৭] এই গ্রামে অবশ্য অধিবাসীদের নয় ক্ষেত্রকারদের (চাষী) দানগ্রহীতার আদেশপালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[৮] ঐ রাজাই সুমাত্রার বালপুত্রদেবের অনুরোধে নালন্দা বিহারকে অনুরূপ সর্তে পাঁচটি গ্রামদান

১। এ. ই. iv, নং ৩৪, প ৩০–৫২
২। ঐ, প ৫০–১
৩। ঐ, প ৫২.৩
৪। এ. ই. xxvii, নং ৪৭, প ১৭–২৪
৫। ঐ, প্লেটের বিপরীত দিকের পঙক্তি ১–২
৬। সম্ভবতঃ দক্ষিণ মুঙ্গেরের লক্ষ্মীসরাই অঞ্চলের আধুনিক মেহস গ্রাম।
৭। এ. ই. xviii, পৃঃ ৩০৪, প ৩৮–৪৪
৮। ঐ, প ৪৫

করেছিলেন।[১] পুনরায় প্রায় ৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুরূপ সর্তে মহীপাল বৌদ্ধদের পূজার জন্য উত্তরবঙ্গে (পুণ্ড্রভুক্তি) তিনটি গ্রাম ও কিছু জমি দান করেছিলেন।[২] এই জমি পূর্বে কৈবর্তরা ভোগ করত। পুনরায় মহীপাল চার বছর পরে উক্ত ভুক্তিতে একই প্রয়োজনে জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রশাসনিক ও রাজস্ব-বিষয়ক অধিকারসমেত একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৩] সম্ভবতঃ পালদের আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে আরও অনুদান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যতগুলির বিবরণ পাওয়া যায় তাতে জানা যায় যে বাংলাদেশ ও বিহারে ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধবিহার ও শৈব মন্দিরগুলি মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। তারা যে শুধু অর্থনৈতিক সুবিধাই ভোগ করত তা নয়, তারা প্রশাসনিক ক্ষমতারও অধিকারী হয়েছিল। অন্যদিকে তার ফলে রাজা ও প্রকৃত জমিচাষী উভয়েরই ক্ষতি হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য যে পালদের দানপত্রে ধর্মীয় অনুদানভোগীকে চোরকে শাস্তি-দানের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মধ্যভারতের গুপ্তকালীন ভূমিদানপত্রে এই অধিকার সাধারণতঃ দাতা নিজেদের হাতেই রাখতেন। তা ছাড়া দশাপরাধের জন্য ও দণ্ডদানের অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছিল। সেই দশটি অপরাধ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—কোনো বস্তু বিনা অধিকারে গ্রহণ, বিচারকের নির্দেশ ছাড়া হত্যা, পরদারগমন, অনুচিত বাক্যপ্রয়োগ, মিথ্যাচরণ, সকল-প্রকার কুৎসা রটনা, অসংলগ্ন উক্তি করা, অপরের সম্পত্তির প্রতি লোভ করা, অলীক বস্তুর চিন্তা করা এবং অসত্যের প্রতি আসক্তি প্রদর্শন।[৪] এই তালিকায় পারিবারিক অর্থনৈতিক এবং ব্যক্তিগত প্রায় সমস্ত অপরাধই এসে যায়। হতে পারে যে শেষ চারটি অপরাধের প্রতি কেউ তেমন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে গ্রামের ভিতর দানগ্রহীতার জ্ঞাতসারে অন্য কোনো অপরাধ হয়ে থাকলে অপরাধীকে অবশ্যই দণ্ড দেওয়া হয়ে থাকত। দশাপরাধ দণ্ডের অর্থ করা হয়ে থাকে যে দশ প্রকার অপরাধের জন্য জরিমানা আদায়।[৫] কিন্তু দণ্ড শব্দটি জরিমানা অর্থ না গ্রহণ করে শাস্তি অর্থেই গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। অতএব স্বীকার করতে হয় যে ভোক্তাগণ এই সকল অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তিকে দৈহিক বা আর্থিক উভয়-প্রকার দণ্ডই দিতে পারত। এইভাবে দানগ্রহীতাগণকে ফৌজদারী মামলার বিচারসম্বন্ধীয় অধিকারদানের এই প্রথা

১। এ ই. xvii, নং ১৭, প ৩৩-৪০
২। ঐ. xxix, নং ১ 'বি', প ২৬-৪৪
৩। ঐ, নং ২৩, প ৩০-৪৯
৪। ক. ই, ই. iii, ১৮৯, পাদটীকা ৪
৫। ঐ, ১৮৯

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে সুরু হয়ে পালসাম্রাজ্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ধর্মকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের হাতে রাজস্ব-বিষয়ক প্রশাসনিক এমন সব ক্ষমতা এসে গিয়েছিল যা নিঃসন্দেহে বিহার ও বাংলাদেশে তারা পূর্বে কখনই ভোগ করে নি।

এই একই যুগে প্রতীহার রাজাগণ উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণদের অনেকগুলি গ্রামদান করেছিলেন। ৫৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভোজদেব কান্যকুব্জভুক্তির কালঞ্জর মণ্ডলে একটি পুরাতন অগ্রহার অনুদানের নবীকরণ করেছিলেন। মূলতঃ জনৈক সামন্ত দ্বিতীয় নাগভট্টের সম্মতি নিয়ে এই অনুদান দিয়েছিলেন। কিন্তু রামভদ্রের রাজ্যকালে স্থানীয় অধিকারীর অক্ষমতার জন্য এই অগ্রহার বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই জন্য ভোজরাজ গ্রামটি সেই ব্রাহ্মণ পরিবারকে পুনরায় দান করেছিলেন এই সর্তে যে তারা ইতিমধ্যে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত উপহার ভিন্ন উক্ত গ্রামের সমস্ত আয় ভোগ করতে পাবে।[১] গুর্জরোত্তরাভূমিতে এই একই রাজা অগ্রহারস্বরূপ আরেকটি গ্রামের অনুদানের নবীকরণ করেছিলেন। তাঁর প্রপিতামহের আমলে অনুদানটি অচল হয়ে পড়েছিল, ভোজরাজ পুনরায় গ্রহীতার নাতিকে গ্রামটি দান করেছিলেন। এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে একবার দান দেওয়া হলে তা নীতি ও ব্যবহার উভয় দিক থেকেই বংশানুক্রমিক হয়ে যেত এবং আদি দাতার বংশধরগণ অনুদানটি সক্রিয় রাখতে সচেষ্ট থাকতেন—এমন কি অনুদানটি সামন্ত-প্রদত্ত হলেও। ভোজের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রপাল তৎকালীন শ্রাবস্তীভুক্তির অন্তর্বর্তী ছাপরা জেলায় গ্রামের সবপ্রকার আয়সমেত একটি গ্রামদান করেছিলেন। ৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মহী-পাল বারানসীতে এক ব্রাহ্মণকে ঐ একই সর্তে একটি গ্রামদান করেছিলেন। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে একই গ্রামটি গোচারণভূমিসমেত দান করা হয়েছিল।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে প্রতীহার রাজাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রদত্ত গ্রাম অনুদানের ক্ষেত্রে কৃষি বা প্রশাসন-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অধিকারের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না; যা পাল অনুদানপত্রে দানগ্রহীতাকে দেওয়া হত। তারা গ্রহীতাকে কেবল গ্রামের সকল-প্রকার আয় দান করত এবং পালদের অনুদানপত্রের মত গ্রামবাসীদের দানগ্রহীতাকে সর্বপ্রকার কর বা শুল্ক দিতে নির্দেশ দিত। প্রতীহার রাজারা এই দান ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এইরূপ দানের ফলে রাজা ও কৃষিজীবীদের মধ্যে এক ভূসম্পত্তিশালী উচ্চবর্গের আবির্ভাব হয়েছিল।

মনে হয় প্রতীহারদের অধীনস্থ সামন্তরাজ্যে এই প্রক্রিয়া আরও প্রবলরূপে

১। ক. ই. ই. xix. নং ২, প ১-১৬

বিদ্যমান ছিল। কাঠিয়াবাড়ে চালুক্য সামন্ত অবনিবর্মণের পুত্র বলবর্মণ ৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তরুণাদিত্যের মন্দিরকে একটি গ্রামদান করেছিলেন। গ্রহীতাকে দশাপরাধে দোষী ব্যক্তিদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়, কর আদায়, বৃক্ষের স্বত্ব ভোগ আর এমন কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছিল যা খুব স্পষ্ট নয়। তা ছাড়া সরকারী কর্মচারীদের সেই গ্রামে প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।[১] একই বংশের অন্য একজন চালুক্য সামন্ত দ্বিতীয় অবনিবর্মণ রাজপদাধিকারী ধিইকের অনুমতি নিয়ে ঐ একই দেবতার নামে ঐ একই সর্তে অন্য একটি গ্রামদান করেছিলেন।[২] ৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কাঠিয়াবাড়ের একজন চাপ সামন্ত ধরণীবরাহ, যে সর্তে চালুক্য সামন্তগণ গ্রামদান করেছিলেন সেইরূপ সর্তে একজন শিক্ষককে পুরস্কার হিসাবে একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৩] ৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চাহমান সামন্তের অনুরোধে উজ্জয়িনীর শাসক মাধব সূর্যমন্দিরকে একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৪] এই অনুদানটিব সর্ত উপরোক্ত অনুদানের সর্ত থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল, কারণ এই অনুদানপত্রে কিছু অতিরিক্ত অধিকাব যেমন জঙ্গল এবং জলাশয়ের আয় ভোগ, 'স্কন্ধক', মার্গনক' ইত্যাদি নতুন কর আরোপের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[৫] তবে এই নতুন কবগুলির অর্থ স্পষ্ট নয়। পরিশেষে আমরা ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলোয়ারে প্রতীহারদের এক গুর্জর সামন্ত কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানের উল্লেখ করতে পারি। তিনি এক মঠের গুরুকে এবং তার উত্তরাধিকারী শিষ্যগণকে একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৬] উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যক্ষভাবে শাসিত প্রতীহার রাজাদের এলাকা অপেক্ষা তাঁদের অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের এলাকাতেই ধর্মীয় অনুদান দেওয়ার প্রথা বেশি প্রচলিত ছিল। দানগ্রহীতাদের গ্রামের শুধু শাসনব্যবস্থা হস্তান্তরিত করা হত না, বরং বিভিন্ন প্রকার কর আদায়ের অধিকারও দেওয়া হত। এই সব কাজের জন্য দানগ্রহীতাকে নিশ্চয়ই কিছু কর্মচারী নিয়োগ করতে হত। এইভাবে গুজরাট ও রাজস্থানের কোনো-কোনো অংশে ধর্মীয় অনুদানভোগীদের ভিতর থেকে এমন এক মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল যাদের হাতে অভ্যন্তরীণ আইন ও শৃংখলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যাপক অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

মনে হয় পাল এবং প্রতীহারদের তুলনায় রাষ্ট্রকূট রাজগণ ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে

১। এ. ই. ix, নং ১ 'এ', প ১-২০
২। ঐ. 'বি', প ৩২-৫৮
৩। ই. এ. xii, ১৯৫, প্লেট ২, প ১-২৪
৪। এ. ই. xiv, নং ১৩, প ১৯-২৫
৫। ঐ, প ২৪-৫
৬। ঐ iii, নং ৩৬, প ৩-১৫

বেশি গ্রামদান করেছিলেন। তার প্রমাণ তাঁদের শাসনকালের প্রারম্ভ থেকেই পাওয়া যায়। ৭৫৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে দন্তিদুর্গ কোলাপুরের এলাকায় একজন ব্রাহ্মণকে একটি প্রতিষ্ঠিত গ্রামদান করেছিলেন এবং তাহাকে ভূমিকর, আমলাদের দেয় শুল্ক ইত্যাদি সমস্ত প্রচলিত কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[১] ৮০৬-৭ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় গোবিন্দ নাসিক অঞ্চলে এক ব্রাহ্মণকে উপরোক্ত অধিকারসমেত একটি গ্রামদান করেছিলেন এবং উক্ত গ্রামে চাট ও ভাটদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন।[২] ৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের পইঠনপত্রে এই সমস্ত অধিকারেরই উল্লেখ আছে।[৩] আবার নাসিক জেলায় প্রাপ্ত তাম্রপত্রে উপরোক্ত অধিকারগুলির পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।[৪] ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে অমোঘবর্ষ কয়েকজন ব্রাহ্মণকে এই সকল অধিকারসহ অনুদান দিয়েছিলেন।[৫] এই-ভাবে তৃতীয় গোবিন্দের সময় থেকে ধর্মীয় গ্রহীতাদের পূর্বাপেক্ষা অধিক অধিকার-সহ অনুদান দেওয়ার যে প্রথা সুরু হল, তা প্রায় শতাব্দীকাল ধরে চলেছিল। কিন্তু পঞ্চম গোবিন্দের ৯৩৩-৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি অনুদানপত্রে গ্রহীতাকে বেগার খাটানোর অধিকার দেওয়া হয় নি বা প্রদত্ত গ্রামে সরকারী পদাধিকারীদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয় নি।[৬] ৯৭২-৩ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় অমোঘবর্ষ এই সকল সর্তে খান্দেশ এলাকায় একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৭] কিন্তু উক্ত গ্রামে নিয়মিত অথবা অস্থায়ী সৈন্যদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয় নি। অনুদানপত্রে দানের সর্তাবলীর পার্থক্য থাকলেও রাষ্ট্র-কূটরাজ্যে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের অনুদানে গ্রামদানের প্রথা দুই শতাব্দীরও অধিক-কাল ধরে চলেছিল। রাষ্ট্রকূটদের সকল তাম্রপত্র উদ্ধার করা যায় নি। কিন্তু যত-গুলি পাওয়া গিয়েছে তাও কিছু কম নয়। তৃতীয় ইন্দ্র সিংহাসনারোহণ উপলক্ষ্যে তাঁর পূর্ববর্তী শাসকগণ কর্তৃক গ্রহীতাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেওয়া ৪০০টি গ্রাম পুনরায় দান করেছিলেন।[৮] চতুর্থ গোবিন্দের ক্যাম্বেপত্র থেকে জানা যায়, যে সিংহাসনারোহণের সময় তিনি ৬০০টি গ্রাম ব্রাহ্মণদের ধর্ম ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন এবং ৮০০টি গ্রাম মন্দিরসমূহকে (দেবকুল) দান করেছিলেন।[৯] এই-ভাবে মাত্র এই দু-জন রাজাই মোট ১৮০০টি গ্রাম ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন।

১। ই. এ. xi, ১১২-৩. প ২৯-৪৪
২। ঐ, ১৫৬-৯, প ৩৪-৫০
৩। এ. ই. iii, নং ১৭, প ৫৩-৫৮
৪। ই. এ. vi, ৬৭-৮, প্লেট ২ 'বি', প ১২-৩
৫। এ. ই. xviii, নং ২৬, প ৬৬-৭
৬। ই. এ. xii, ২৫১, প ৫০-৩
৭। ই. এ. ২৬৬, প ৪৩-৫৭
৮। অ. স. আলটেকর, দি রাষ্ট্রকূটস্ এ্যাণ্ড দেয়ার টাইমস্, পৃঃ ১০০
৯। এ. ই iii, নং ৬, প৪৬-৯

এই সংখ্যাটির প্রামাণিকতায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। কারণ ভূমি অনু-দানের প্রথা এত সাধারণ ও ব্যাপক ছিল যে প্রকৃতপক্ষে দানে প্রদত্ত গ্রামের সংখ্যা আরও বেশি হয়ে থাকতে পারে।

রষ্ট্রকূট রাজাদের প্রশাসকবৃন্দ এবং সামন্তগণও ধর্মীয় অনুদান দিয়েছিলেন। ৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটদের গুজরাট শাখার কর্করাজ সুবর্ণবর্ষ একজন ধর্মীয় শিক্ষককে একটি ভূমিখণ্ড স্থায়ীভাবে দান করেছিলেন। সেই ভূমি নিষ্কর ছিল এবং ভূমিতে নিয়মিত অথবা অনিয়মিত সৈন্য বা রাজপুরুষের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।[১] ৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ শাখারই তৃতীয় ধ্রুব একজন ব্রাহ্মণকে অনুরূপ সর্তে একটি গ্রামদান করেছিলেন। তার উপর দশাপরাধ দণ্ডদানের এবং বেগার খাটানোর অধিকারও তাকে দেওয়া হয়েছিল।[২] এই সামন্তগণ তাঁদের প্রভুর স্বাধীনভাবেই অনুদান দিয়েছিলেন; কিন্তু অমোঘবর্ষের শাসনকালে বনবাসীর প্রশাসক বঙ্কেয় জৈনমন্দিরকে একটি গ্রাম বিভিন্ন গ্রামে ভূমিখণ্ডদানের জন্য নিজ প্রভু অমোঘবর্ষের অনুমতি নিয়েছিলেন।[৩] মোট কথা, রাষ্ট্রকূটরাজগণ এবং তাঁদের সামন্তগণ বিদ্বান ব্রাহ্মণদের যথেষ্টসংখ্যক গ্রামদান করেছিলেন।[৪]

গ্রাম চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হত এবং সেই দানকে কার্যকর রাখা দাতার উত্তরাধিকারীর কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। কিন্তু অনুদান দাতা-পরিবারের পতনের পরেও কায়েম ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্বিতীয় ইন্দ্র গুজরাট শাখার প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্রুব কর্তৃক প্রদত্ত ত্রেণা নামক গ্রামগ্রহীতার উত্তরাধিকারীকে পুনরায় দান করেছিলেন। গ্রহীতার উত্তরাধিকারীগণ এই অনুদান নবীকরণের জন্য চিন্তিত ছিল, কারণ দক্ষিণ গুজরাটে দাতা-পরিবারের আর কোনো ক্ষমতা ছিল না।[৫] আমরা পূর্বেই দেখেছি তৃতীয় ইন্দ্র পূর্ববর্তী রাজাগণ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা ৮০০টি গ্রামের অনুদানকে নবী-করণ করেছিলেন।

পালরাজগণ এবং রাষ্ট্রকূটরাজগণ গ্রহীতাদের সুস্পষ্টভাবে প্রশাসনিক অধিকার দান করেছিলেন; কিন্তু প্রতীহাররাজগণ তা দেন নি। বিশেষ করে রাষ্ট্রকূটরাজগণ দণ্ডদান প্রশাসনের বেশি অধিকার দিয়েছিলেন। পালদের কয়েকটি অনুদানে গ্রামে রাজপদাধিকারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কয়েকটি অনুদানে নিয়মিত ও অনিয়মিত সৈন্যদলের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ-

১। ঐ xxi, নং ২২, প ৪৮-৫১
২। ই. এ. xii, ১৫৪-৫, প্লেট ২ 'বি', প ১-১৯
৩। এ. ই. vi, নং ৪, প ৩৫-৪৯
৪। আলটেকর, স. প্র. পু. পৃঃ ১৮৯
৫। ঐ, পৃঃ ৯৮

কর্মচারী ও সৈনিক উভয়েরই প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই দানগুলিতে গ্রহীতাকে দশাপরাধ দণ্ড দেবার অধিকারও দেওয়া হয়েছে। যদিও চোরকে শাস্তি দেবার অধিকারের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে দশাপরাধ দণ্ডের মধ্যে ঐ অপরাধও এসে যায়। মোটের উপর পাল ও প্রতীহার রাজ্যের তুলনায় রাষ্ট্রকূটদের রাজ্যে ধর্মীয় অনুদান-ভোগীব সংখ্যা ছিল বেশি এবং তুলনায় তাদের বেশি প্রশাসনিক অধিকারও দেওয়া হয়েছিল।

পুরোহিতদের দান দেওয়ার এই প্রথা মধ্যযুগীয় ইউরোপের খ্রীষ্টীয় সংগঠনসমূহকে দান দেওযার প্রথার সঙ্গে তুলনীয়। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে ভারতে ব্রাহ্মণদের মন্দিরগুলি গির্জার মত সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে নি। কিন্তু ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ অনুদান ইউরোপের তুলনায় কম। ভূমি অনুদানরূপে বেতন পায় এমন রাজকর্মচারী ও সামন্তের দৃষ্টান্তও কম। প্রথম পাল অনুদান থেকে জানা যায় যে উত্তরবঙ্গের রাজ্যাধিকারী ছিল দশগ্রামিক নামে একজন রাজকর্মচারী।[১] মনুব মতে দশগ্রামিকের প্রাপ্য ছিল এক 'কুল' জমি।[২] কিন্তু পববর্তীকালে এই পদটিব আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহীপাল কৈবতদের কাছ থেকে ২০০ প্রচলিত পবিমাপের জমি ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। কোনো অনির্দিষ্ট কাজের পরিবর্তে কৈবর্তদের এই জমি দেওয়া হয়েছিল।[৩] মনে হয় এটি ধর্মনিরপেক্ষ অনুদান ছিল। পালদেব ভূমি অনুদানপত্রে উল্লিখিত রাজা, রাজপুত্র, রাণক, রাজরাজনক, মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি ইত্যাদি উপাধিধারীগণ সম্ভবতঃ এমন সামন্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশের সম্পর্ক ছিল ভূমির সঙ্গে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে পরাজিত করার পর অধীনস্থ সামন্তরূপে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করা হয়েছিল। আবার কয়েকজনকে সৈন্যসরবরাহের সর্তে ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য সামরিক সেবাদান উভয়-প্রকার সামন্তেরই কর্তব্য ছিল।

প্রতীহারদের প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানের খুব বেশি উল্লেখ পাওয়া যায় না। ৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ভোজ গোরখপুরে গুণাম্বোধি বা প্রথম গুণসাগর নামক কলচুরি সর্দারকে অনুদানরূপে ভূমি দিয়েছিলেন; কারণ এই সর্দার গৌড়ের শ্রী-সম্পদ অপহরণ করে নিজ অধিস্বামীর যথেষ্ট উপকার করেছিল।[৪] দ্বিতীয় মহেন্দ্রপাল বিদগ্ধের শাসনকালে দুইটি ভূমি অনুদানপত্রে একজন উচ্চ-রাজপদাধিকারী স্বাক্ষর করেছিল।[৫]

১। এ. ই. iv, নং ৩৪, প ৪৭
২। vii, ১১৮-৯
৩। এ. ই. xxix, নং ১ 'বি', প ২৮ ৯
৪। '.ভোজদেবাপ্তভূমিঃ···শ্রীগুণাম্ভোধিদেবঃ যেন···আহৃতা গৌড়লক্ষ্মী।' ক. ই. ই. iv, নং ৭৪, শ্লোক ৯
৫। এ. ই. xiv, নং ১৩, প ১৪, ১৭

মনে হয় এই রাজপদাধিকারী অনুদানরূপে প্রাপ্ত একটি গ্রাম ভোগ করত[১] এবং এই গ্রামটির দাতা সম্ভবতঃ প্রতীহার রাজা ছিলেন। প্রতীহারদের একজন গুর্জর সামন্ত দ্বারা প্রদত্ত একটি অনুদানপত্র থেকে অনুমান করা যায় যে সামন্তটি নিজে ধর্মনিরপেক্ষ অনুদান পেয়েছিল ; কারণ সে তার অধীনস্থ এলাকাকে 'স্বভোগাবাপ্ত বংশপোতক-ভোগ' বলে উল্লেখ করেছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে শাসকবংশের কুটুম্ব হওয়ার ফলে[২] প্রতীহাররাজ তাকে ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য বংশপোতক ক্ষেত্র দান করেছিলেন। তাঁর দানপত্র গ্রহীতাকে গুর্জরোত্তরা ভূমির এলাকাভুক্ত ক্ষেত্রের প্রশাসনিক দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল।[৩]

রাষ্ট্রকূটদের অনুদানপত্রে রাজকর্মচারী এবং সামন্তদের গ্রামদানের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাদেব রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করে আলটেকর মনে কবেন যে বহু রাজকর্মচারীকে বেতনের পরিবর্তে বিনা খাজনায় ভূমিদান করা হয়েছিল।[৪] বিনা খাজনায় না বলে নিষ্কর বলাই এখানে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় কারণ খাজনা সাধারণতঃ প্রজারা তাদের ভূস্বামীকে দিয়ে থাকে। আলটেকর আরও বলেন যে কখনও কখনও রাজকর্মচারীদের বেতন আংশিক নগদে এবং আংশিক ভূমি অনুদানের দ্বারা দেওয়া হত।[৫] যাই হোক রাজস্বব্যবস্থার প্রসঙ্গে দেখা যায় যে রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্য প্রধানতঃ দশটি অথবা দশেব গুণিতক সংখ্যাসমূহে বিভক্ত ছিল।[৬] ধর্মশাস্ত্রের বিধান অনুসারে এইরূপ এক-একটি এককের প্রধান পদাধিকারীকে ভূমি অনুদানের দ্বারা বেতন দেওয়া যুক্তিযুক্ত।[৭] মনে হয় রাষ্ট্রকূট রাজা জেলা ও গ্রামের প্রধানদের বেতনদানের ক্ষেত্রে এই বিধানের অনুসরণ করতেন। জাল গঙ্গশিলা-লিপিতে দেশ-গ্রামকূট-ক্ষেত্র বা জেলাপ্রধানকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির দুবার উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে গ্রামপ্রধান যাকে রাষ্ট্রকূট শাসনকালে গ্রামকূট বলা হত ; তাকেও এইভাবেই বেতন দেওয়া হত। এটা নিশ্চিত যে দক্ষিণ মহা-রাষ্ট্রে গ্রামপ্রধানকে নিষ্কর ভূমি দেওয়া হত। সৌপত্তীর রট্টের এক দলিল থেকে জানা যায় যে কড়োলের গ্রামপ্রধান (গবুণ্ড) ঐ এলাকার প্রধানদের রাজকরমুক্ত জমির মধ্যস্থিত নিজ ২০০ 'মত্তর' রাজস্বমুক্ত জোতজমি কাউকে দান করেছিলেন।[৯]

১। 'শ্রীবিদ্দভোগাবাত্যেধীল্লাপদ্রকগ্রামে' ঐ, প ২১
২। এ. ই. iii, নং ৩৬, প ৪
৩। ঐ
৪। ঐ, পৃঃ ২৬৬-৭
৫। ঐ, পৃঃ ২৪৫
৬। ঐ, পৃঃ ১৮৯
৭। মনু VII, ১৯
৮। •ালটেকর, স. প্র. পু. পৃঃ ১৭৯
৯। ঐ, পৃঃ ১৯৩

এরূপ ক্ষেত্রে যদি রাজস্বপদাধিকারী নিজ অধিকার সীমার মধ্যস্থিত বেতন হিসাবে পাওয়া জমি, কিংবা যে জমির রাজস্ব সে বেতন হিসাবে ভোগ করে থাকে সেটুকু ছাড়া বাকি অংশের হিসাব মালিককে দিতে হত।

রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্যের গুজরাট শাখায় দশমিক এবং ১২ ও ৮৪ গ্রামের রাজপুত প্রথার এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি যে ১২টি গ্রামের একক দানে দেওয়া হত।[১] এবং ৮৪টি গ্রামের একক কিন্তু ৭৫০টি গ্রামের অংশবিশেষ ছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার যে এই ৭৫০ গ্রাম আবার দশটি গ্রামের এককে বিভক্ত ছিল।[২] তৃতীয় অমোঘবর্ষের শাসনকালেও ১২টি গ্রামের এককের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] স্পষ্টতঃই এই সমস্ত ভৌমিক এককগুলি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য সংগঠিত করা হয়েছিল। চাহমানের শাসনব্যবস্থা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে রাষ্ট্রকূট-দেব অধীনস্থ এই সমস্ত এককগুলি সামন্ত বা রাজপদাধিকারীদের জায়গীররূপে দেওয়া হত এবং তারা তাদের অধীনস্থ এককগুলির শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করত।

রাষ্ট্রকূটদের সাম্রাজ্যে সামরিক সেবার পরিবর্তে ভূমি অনুদানেরও কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কখনও কখনও পল্লব রাজা নিজ সেনাপতির বিজয় অভিযানের স্মৃতিকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য তার নামে গ্রামের নামকরণ করতেন এবং সেই গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করে দিতেন।[৪] কিন্তু রাষ্ট্রকূটদের সেনাপতিদের বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ তাদের উপভোগের জন্য গ্রামদান করা হত।[৫] শিলাহারের সেবক গ্রামভোক্তৃ সম্ভবতঃ গ্রাম-উপভোক্তা সেনাপতি। আলটেকরের অনুসারে গ্রামগতি ছিলেন ইনামে (পুরস্কারে) প্রাপ্ত গ্রামের মালিক।[৬] যেহেতু মহারাষ্ট্রে গ্রামপ্রধানকে রাষ্ট্রকূট বলা হত এবং সে গ্রামপতি থেকে পৃথক ছিল, এই জন্য অনুমান করা চলে যে গ্রামপতি সম্ভবতঃ সৈনিক পদাধিকারীই ছিল। যদি বণিক সুলেমানের বিবরণকে বিশ্বাস করতে হয় তা হলে স্বীকার করতে হবে যে তৎকালীন রাজারা সৈন্যদের বেতন দিতেন না। সুলেমানের বিবরণে দেখি যে ভারতীয় রাজাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী থাকত; কিন্তু সৈন্যদের কোনো বেতন দেওয়া হত না। রাজা অবশ্য ধর্মযুদ্ধের সময়ই সৈন্যদের একত্র করতেন। একত্রিত সৈন্যদল রাজার সাহায্য ছাড়াই নিজেদের ব্যয়নির্বাহ করত।[৭] এই বিবৃতি সামন্তের দ্বারা রাজার জন্য প্রেরিত সৈন্যদলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সুলেমান

১। এ. হ. iii, নং ৯, প ১৫-৬
২। ঐ, i, নং ৮, প ৩৫-৬
৩। ই. এ. xii, ২২৬
৪। ঐ viii, ২৭৯-৮০
৫। এ. ই. iii, নং ৩৭, প ৪৭
৬। আলটেকর, স. প্র. পু. পৃঃ ১৮৯
৭। ঐ

এ কথাও লিখেছেন যে আরবদের মত (কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় রাজা অপেক্ষা ভিন্ন) রাষ্ট্রকূট রাজা নিজ সৈনিকদের নিয়মিত বেতন দিতেন।[১] কিন্তু তাদের নগদ বেতন দেওয়া হত, নাকি তারা ভূমি অনুদান পেত, সে কথা সুলেমান স্পষ্ট করেন নি। আলটেকরের মতে সৈনিকদের পরিবারের ব্যয়নির্বাহের জন্য চাষের জমি দেওয়া হত।[২] যাই হোক না কেন, সুলেমানের এই বিবরণ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট রাজাদের নিয়মিত সৈনিকদের সম্পর্কেই প্রয়োজ্য। কিন্তু সামন্তদের দ্বারা সংগৃহীত সৈনিকের সংখ্যা রাজার নিয়মিত সৈনিকের অপেক্ষা সম্ভবতঃ অধিক ছিল।

কিছু পদাধিকারীকে বেতনের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কর দেওয়া হত। রাষ্ট্রকূটদের সময়ে খাদ্যশস্য ও শাকসব্জির উৎপাদন থেকে দ্রব্যে আদায়ীকৃত কর স্থানীয় পদাধিকারীর বেতনের অন্তর্ভূত হয়ে যেত।[৩] আলটেকরের মতে 'উপরিকরের জায়গায় যে ভোগকর প্রচলিত হয়েছিল, তার অর্থ সাধারণ অথবা অতিরিক্ত, দ্রব্যে অথবা নগদে দেয় এমন কর যা মফঃস্বল এলাকায় রাজকর্মচারীদের ভোগেই লাগত।[৪] এই ভোগ-কর আমাদের অন্য এক করপ্রণালীব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা চন্দেল ও গাহব-ওয়ালদের শাসনকালে প্রচলিত হয়েছিল। আবার এই প্রথা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আংশিক সামন্তীকরণেরও আভাস দেয়; কেননা ইউরোপে সামন্তপ্রথায় প্রশাসন চালনাকারী সামন্তগণকে (ব্যারণ) রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে অথবা দ্রব্যে বেতন না দিয়ে তাদের কিছু রাজস্ব প্রদান করত।

সামন্তগণ নিজ রাষ্ট্রকূট প্রভুর কাছ থেকে বড় বড় অঞ্চল পেতেন। সামরিক সেবার পুরস্কারস্বরূপ নতুন নতুন জায়গীর দেওয়া হত। সম্ভবতঃ প্রথম অমোঘবর্ষ কর্ককে নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার পুরস্কারস্বরূপ নর্মদা ও তাপ্তীর মধ্যবর্তী অঞ্চল প্রদান করেছিলেন।[৫] এই অঞ্চল প্রায় ৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূটদের অধীনে থেকে[৬] গুর্জর-প্রতিহারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দুর্গের কাজ করেছিল।[৭] আবার সর্দারগণও নিজ নিজ সামন্তগণকে জায়গীর দান করেছিল। শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে দ্বিতীয় কর্কের অধীনে ৭৫০ গ্রামের একটি অঞ্চল ছিল।[৮] এই অঞ্চলে চন্দ্রগুপ্ত নামে

১। এইচ. এম. ইলিয়ট ও ড্যাসন (সঃ) হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বই ইটস হিস্টোরিয়ানস ১, ৭
২। ঐ, ৩
৩। আলটেকর, স. প্র. পু. পৃঃ ২৫১
৪। ঐ, পৃঃ ২১৬
৫। ঐ, পৃ: ৮৬-৭
৬। ঐ
৭। ই. এ. xii, ১৫৮
৮। এ. ই. i. নং ৮, শ্লোক ২০

এক ব্যক্তি মহাসামন্ত প্রচণ্ডের দণ্ডনায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন।[১] সম্ভবতঃ এই গ্রাম-সমূহ মহাসামন্ত দ্বিতীয় প্রচণ্ড দ্বিতীয় কর্কের কাছ থেকে জায়গীর হিসাবে ভোগ কবত। সাহসিকতা ও আনুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ এই জমি হয়ত প্রচণ্ডের পিতা ধবলপ্প দানে পেয়েছিলেন।[২] প্রকারান্তবে এই জানা যায় যে জায়গীরে প্রাপ্ত অঞ্চলের প্রশাসনব্যবস্থা সামন্ত স্বয়ং করত। রাষ্ট্রকূটদের গুজরাট শাখা কর্তৃক জায়গীব প্রদানের একটি দৃষ্টান্ত তৃতীয় গোবিন্দেব শাসনকালে (৮:৩ খ্রীঃ) পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সম্ভবতঃ পরবর্তী চালুক্যবংশেব সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মহাসামন্ত বুদ্ধবর্ষকে ১২টি গ্রামের এক অঞ্চলের উপর সামন্ততান্ত্রিক অধিকার প্রদান করা হয়েছিল।[৩] এইভাবে সম্ভবতঃ দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে সৌন্দত্তির রট্টগণও যারা পূর্বে রাষ্ট্রকূটদের সামন্ত ছিল ও প:ব চালুক্যদের সামন্ত হয়েছিল, তারাও নিজ অধীনে উপসামন্ত নিযুক্ত করেছিল কারণ এদের দেশকারের প্রভুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] অতঃপর বহু সামন্ত নিজ প্রভুর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিজ নিজ অধীনে উপসামন্ত নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু আঞ্চলিক শাসক ও ক্ষুদ্রতর সামন্তগণ হয় নিজ নিজ প্রভুকে অনুরোধ উপরোধ করে গ্রামদান করাত, অথবা তাঁর অনুমতি নিয়ে স্বয়ং গ্রাম-দান করত। বনবাসীর শাসক বঙ্কেয়র আবেদনে প্রথম অমোঘবর্ষ জৈনমন্দিরকে একটি গ্রামদান কবেছিলেন।[৫] তৃতীয় গোবিন্দের অনুমতি নিয়ে জনৈক চালুক্য সামন্ত জনৈক জৈনমুনিকে অনুরূপভাবে একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৬] ধ্রুবর সামন্ত শঙ্করগণও ঐ একইভাবে একটি গ্রামদান করার জন্য তাঁর অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন।[৭] কিন্তু বড় ও ছোট সামন্তের মধ্যে পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, বাষ্ট্রকূটদের সাম্রাজ্যে উপসামন্ত নিযুক্ত করাব ব্যাপক প্রথা লক্ষ্য করা যায়।

প্রতীহারদের শাসনপ্রণালী একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পালদের শাসনপ্রণালী থেকে পৃথক ছিল। সেটা এই যে প্রতীহারগণ উপসামন্তীকরণে সহায়তা করেছিলেন, কিন্তু পালদের রাজত্বের আলোচ্যকালে উপসামন্তীকরণের কোনো স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় না। ধর্মপালের মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মণ একটি মন্দিরকে নিজ প্রভুর কাছ থেকে বারটি গ্রাম পাইয়ে দিয়েছিলেন[৮] কিন্তু স্বয়ং অনুদান দেওয়ার

১। ঐ. প ৩৪-৫
২। হুলস, ঐ, পৃঃ ৫৩
৩। এ. ই. iii, নং ৯, প ১৫-৯ (তদ্ দণ্ডশিহরক্ষী দ্বাদশ প্রভুজ্যমানে)
৪। ই. এ. xiv, ২৫ ; তুঃ আলটেকর, স. প্র. পু পৃঃ ২৬৩
৫। এ. ই. vi, নং ৪, প ৩৪
৬। ই. এ., xii, ১৮
৭। এ. ই. ix, নং ২৬, প ২৭-৮
৮। ঐ, iv, নং ৩৪, প ৩০-৫২

ক্ষমতা তাঁর ছিল না। যেসমস্ত ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধবিহার ও মন্দির পাল রাজাদের কাছ থেকে অনুদানরূপে গ্রামলাভ করেছিল, তারা নিজ সম্পত্তির ব্যবস্থার জন্য নিজ আয়ের কিছু অংশ বা জমির কিছু অংশ হয়ত উপসামন্তদের প্রদান করেছিল। কিন্তু এইরূপ অনুমানের সমর্থনে আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু প্রতীহারদের সাম্রাজ্যে উপসামন্তীকরণেব যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। ঘোষপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত লিপিতে দেখা যায় যে বৎসরাজের শাসনকালে একজন দাতা গুর্জরোত্তরাভূমিতে অনুদানে প্রাপ্ত নিজ জমির ষষ্ঠমাংশ দানরূপে ভট্টবিষ্ণুকে প্রদান করেছিল।[১] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদানপ্রাপ্ত যে-কোনো ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠান নিজ অধীনস্থ ভূমি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পুনরায় বিনা বাধায় অন্যকে দান করতে পারত। সামন্তরাজগণেব মধ্যে অবশ্য কেউ কেউ স্বাধীনভাবে অনুদান দিত। চালুক্য সামন্ত রাজা বলবর্মা কাঠিয়াবাড়ে তরুণাদিত্যের মন্দিরকে প্রভুর অনুমতি ছাড়াই গ্রামদান করেছিলেন কিন্তু ঐ বংশেবই দ্বিতীয় অবনিবর্মা (৮৯৮) ঐ মন্দিরকেই একটি গ্রামদান করার জন্য প্রতীহার রাজার কর্মচারীর অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন।[২] উভয় ক্ষেত্রেই দানগ্রহীতাকে প্রদত্ত জমি স্বয়ং ভোগ করার অথবা অন্যকে ভোগ করতে দেবার এবং জমি স্বয়ং চাষ-আবাদ করা অথবা অন্যকে দিয়ে চাষ-আবাদ করানোর অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[৩] এর ফল উপসামন্তীকরণের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে চার শ্রেণীর সামন্তেব উদ্ভব হল। উপসামন্তীকরণের অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আলোয়ার অঞ্চলে জনৈক গুর্জর সামন্তরাজার অধীনে পাওয়া যায়। শাসকবংশের এক নিকট সম্বন্ধী সামন্ত মথনদেব কারও অনুমতি ছাড়াই নিজ অধীনস্থ এলাকার মধ্যে একটি গ্রাম মঠের গুরু ও শিষ্যদের দান করেছিলেন।[৪] এই অনুদানের গ্রহীতাকে 'কুর্বতঃ কারয়তো বা'[৫] অধিকার দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ গ্রামের উপর দানগ্রহীতাকে অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছিল, ফলে উপসামন্তীকরণের যথেষ্ট সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল। এই ধরনের একটি দানের দৃষ্টান্ত হল পূর্ব কাঠিয়াবাড়ে জনৈক চাপ সামন্ত কর্তৃক ৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত একটি অনুদানে, যাতে প্রভুর অনুমতি ছাড়াই শিক্ষককে একটি গ্রামদান করা হয়েছিল এবং দান-গ্রহীতাকে এই অধিকারও দেওয়া হয়েছিল যে ইচ্ছা হলে সে এই গ্রাম অন্যকে দান

১। ঐ, নং ২৪, প ৬-৯
২। ঐ ix, নং ১, প্লেট 'এ' ও 'বি'
৩। এ. ই. iv, নং ৩৪, প ৩০-৫২
৪। ঐ v, নং ২৪, প ৬-৯
৫। ঐ ix, নং ১, প্লেট 'এ' ও 'বি'

করতে পারবে।[১] এই সামন্ত তার নিজ জমি অবশ্য প্রতীহাররাজের চরণকৃপায় লাভ করেছিল।[২] চাহমান সামন্ত ইন্দ্ররাজের নির্দেশে তার দ্বারা নির্মিত মন্দিরকে প্রতীহাররাজের উচ্চ-রাজকর্মচারী ও উজ্জয়িনীর শাসক মাধব কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানটি একটি পৃথক ধরনের অনুদানের দৃষ্টান্ত।[৩] এই ভূমি অনুদানপত্রে মাধব অন্য একজন রাজপদাধিকারীর সঙ্গে একযোগে দস্তখৎ করেছিল[৪], যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে প্রতীহাবসাম্রাজ্যের প্রান্তীয় শাসকগণও রাজানুমতি ভিন্ন অনুমতি দিতে পারত না। উত্তরবঙ্গে মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মার অনুরোধে ধর্মপাল দ্বারা প্রদত্ত অনুদানটিব সঙ্গে এই অনুদানটির তুলনা চলতে পারে। উপরের উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে উপসামন্তীকরণের প্রবৃত্তি কেবল সামন্ত রাজাদের অধীনস্থ ক্ষেত্রেই নয় ববং প্রতীহাবরাজদেব প্রত্যক্ষাধীন ক্ষেত্রেও বর্তমান ছিল। তবে এ কথা সত্য যে এই প্রবৃত্তি সামন্তীয় ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রবল ছিল।

বাষ্ট্রকূটদেব শাসনপ্রথায় ধর্মীয় অনুদানে প্রাপ্ত ব্যক্তিরা উপসামন্ত নিযুক্ত করতে পাবত এবং অনুদানে প্রাপ্ত সম্পত্তি অন্যকে দিতে পারত। গ্রহীতাকে এই অধিকারের সঙ্গে গ্রামদান করা হত যে, সে সেই গ্রাম স্বয়ং ভোগ করবে, অথবা অন্যকে ভোগ করতে দিতে পারবে, এবং ভূমি চাষ-আবাদ নিজে করবে, অথবা অন্যকে দিয়ে করাবে।[৫] প্রতীহারদের অতি অল্পসংখ্যক অনুদানপত্রেই এইরূপ উদাব অধিকার দেওয়া হত এবং তাও মাত্র গুজরাট ও রাজস্থানে। আর পালদের অনুদানে এই অধিকাবের কোথাও কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। কিন্তু মনে হয় যে বাষ্ট্রকূটদের অধীনে মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ গুজরাট ও কর্ণাটকে গ্রহীতাদের এই অধিকারদানেব সাধারণ প্রথা প্রচলিত ছিল। রাষ্ট্রকূটদের অনুদানপত্রের একটি বিধানের ফলে এই প্রদত্ত সুবিধা আরও সুদৃঢ় হয়েছিল। উক্ত বিধানে রাজপদাধি-কাবীদের এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, গ্রহীতা গ্রামটি স্বয়ং উপভোগ করুক অথবা অন্যকে উপভোগ করতে দিক, প্রদত্ত ভূমি সে স্বয়ং চাষ-আবাদ করুক অথবা অন্যকে দিয়ে করাক, তার কোনো কাজে রাজকর্মচারী যেন বাধা না দেয়।[৬] এব ফলে দানগ্রহীতার পক্ষে উপসামন্ত নিযুক্ত করার সুন্দর সুযোগের সৃষ্টি হয়েছিল।

১। ই. এ. xii, প্লেট II, প ১-২৪
২। ঐ
৩। এ. ই. xiv, নং ১৩, প ২০-৯
৪। ঐ, প ২৭
৫। ই. এ. xi, ১৫৯, প ৪৯-৫০ ; xii, ১৮৪-৫, প্লেট ২, প ১৯, প্লেট ৩, প ১ ; এ. ই. xxii, নং ১২, প ৫৪-৫ ইত্যাদি।
৬। ঐ

এসব ক্ষেত্রে গ্রহীতাদের জোতদার অর্থাৎ উপসামন্ত প্রধানতঃ এমন সব ব্যক্তি হত, যারা সাধারণ গৃহস্থ ছিল, এবং মন্দির ও ব্রাহ্মণদের এত গ্রামদান করা হত যে সেগুলির চাষ-আবাদের জন্য তারা কৃষক বা গৃহস্থ নিয়োজিত করতে বাধ্য হত। সেই জন্য উপসামন্তগণ সাধারণতঃ গৃহস্থ বা জোতদার হত। ধর্মীয় দানগ্রহীতার দ্বারা নিযুক্ত উপসামন্তের কোনো লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না; কারণ উপসামন্তকে জমিদান করার সময়ে কোনো দলিল দস্তাবেজ বা তাম্রপত্র তৈরি করা সহজ ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে দানগ্রহীতারা উপসামন্ত নিযুক্ত করার সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করত।

পাল অনুদানপত্রে প্রথম দু-ডজন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পদাধিকারীর উল্লেখ আছে যাদের কাছে অনুদানের সংবাদ পাঠাতে হত।[১] হয়ত কোনো না কোনো দিক থেকে রাজস্বব্যবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। পালদের সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর কত পদাধিকারী ছিল তার সংখ্যা অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু 'অশেষ রাজপুরুষাণ'[২] শব্দটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাদের সংখ্যাটি বেশ বৃহৎ ছিল। মনে হয় পাল-সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশ বাংলাদেশ ও বিহারেব শাসনব্যবস্থা স্থায়ী রাজপদাধিকারীর দ্বারা পবিচালিত হত, তারা রাজ্যের নানান স্থানের লোকদেব কেন্দ্রীয় অধিকার সম্বন্ধে সচেতন কবে দিত। প্রতীহারসাম্রাজ্যের পরিস্থিতি কিন্তু ভিন্নরূপ ছিল। প্রতীহার রাজাদের দ্বারা প্রদত্ত অনুদানপত্রে একমাত্র 'নিযুক্ত' নামক পদাধিকারীর উল্লেখ আছে।[৩] যেহেতু তাঁদের রাজকর্মচারীর সংখ্যা অল্প ছিল, সেই জন্য শাসন-ভার এমন সব সামন্তদের দেওয়া হত, যাদের রাজা নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। প্রায়শঃ অনুদান দেবার জন্য মহাসামন্তদেরও রাজানুমতি গ্রহণ করতে হত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাজার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসিত অঞ্চলে যত পদাধিকারীর সংখ্যা দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশিসংখ্যক পদাধিকারী দেখা যায় সামন্ত কর্তৃক প্রশাসিত অঞ্চলে। কিন্তু এখানেও মাত্র ছয় প্রকার পদাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, অথচ পালদের ভূমি অনুদানপত্রে দু-ডজন পদাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। এর থেকে এইরকম মনে হয় যে প্রতীহার সামন্তগণ নিজ অধীনস্থ অঞ্চলের শাসনব্যবস্থার জন্য উপসামন্তের উপর নির্ভর করত। এইভাবে প্রতীহার রাজা অথবা তার অধীনস্থ সামন্ত কেউ-ই শাসনতন্ত্রের বহুল বিকাশসাধন করতে পারেন নি। তার ফলে প্রতীহারসাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রশাসনকার্য সম্ভবতঃ সামন্তরাই চালাতেন।

১। 'ভাগলপুর প্লেট অফ নারায়ণ পাল', ই. এ. xlvii পৃঃ ৩০৪, প ৩০-৬

২। ঐ, প ৩০

৩। ই. এ. xv, ১৩৮

রাষ্ট্রকূটদের শাসসতন্ত্র প্রতীহারদের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা বিস্তৃততর। ৭৭৩-৪'র অনুদানপত্রে কেবল তিন প্রকার রাজপুরুষের উল্লেখ আছে—বিষয়পতি, রাষ্ট্রপতি ও গ্রামকূট।[১] মধ্যপ্রদেশের চন্দা জেলায় প্রাপ্ত প্রথম কৃষ্ণের একটি ভূমি অনুদানপত্রে (৭'২) উক্ত রাজপুরুষদের মধ্যে প্রথম দু-জন এবং ভোগপতি নামে তৃতীয় একজনের উল্লেখ আছে।[২] কিন্তু ৮৯৪'র একটি অনুদানপত্রে 'আয়ুক্তক' ও 'নিযুক্তক'[৩] নামক দু-জন নতুন রাজপদাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের উল্লেখ পরবর্তী প্রায় সব অনুদানপত্রেই পাওয়া যায়।[৪] এইভাবে এখানেও আমরা সবশুদ্ধ পাঁচ প্রকার রাজপদাধিকারীর উল্লেখ পাচ্ছি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে এই যুক্তি দেওয়া চলতে পারে যে অনুদানপ্রসঙ্গে আবশ্যক না থাকায় অন্যান্য রাজপদাধিকারীদের উল্লেখ করা হয় নি।[৫] কিন্তু যদি পাল অনুদানপত্রের প্রতি এই যুক্তি প্রসারিত করা হয় তা হলে দেখা যায় সেখানে দু ডজন পদাধিকারী অনুদানের সঙ্গে যুক্ত ছিল যা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রকূট শাসনপ্রণালীতেও খুব বেশি পদাধিকারীর ব্যবস্থা ছিল না। কারণ প্রতীহারদের মত রাষ্ট্রকূটরাও অধীনস্থ সামন্তদের দ্বারাই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রকূট শিলালিপিতে পুলিস পদাধিকারীদের উল্লেখও এই অনুমানকে সমর্থন করে। কেবল গুজরাটের কর্করাজের অন্ত্রোলী-চরোলী তাম্রপটে 'চোরোধরনিক' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] কিন্তু এখানেও এই যুক্তির কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না যে ভূমি অনুদানপত্রে তাদের উল্লেখ আবশ্যক ছিল।[৭] সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে আইন-শৃংখলা রক্ষার ভার স্থানীয় সামন্তের উপর ন্যস্ত ছিল; যার ফলে রাজকর্মচারী নিয়োগেব কোনো প্রয়োজন হত না।

পাল ও প্রতীহার রাজা ও রাজপুরুষদের উপাধি থেকে সামন্তবাদী সংবন্ধের আভাস পাওয়া যায়। পরবর্তী গুপ্ত রাজা, পাল রাজা এবং প্রতীহাররাজগণ পরম-ভট্টারক, পরমেশ্বর এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। কিন্তু এই উপাধি তাঁদের অধিকারবৃদ্ধির পরিচায়ক ছিল না। এর দ্বারা যদি কিছু প্রকট হয় তা হল এই যে রাজাগণ এই সকল উপাধি গ্রহণের দ্বারা নিজেদের ছোট ছোট রাজা অথবা-

১। ই. এ. ১১২-৩, প ২৮-৯
২। এ. ই. xiv, ন' ৬, প ৪২
৩। ঐ iii, নং ১৭
৪। ই. এ. xi, ১৫৯, প ৩৫-৬ ; vi, ৬৭-৮৮ (তৃতীয় গোবিন্দের প্লেট ২ 'বি' প ৪-৫)
৫। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৬৯
৬। ঐ
৭। ঐ

সামন্তদের সর্বোচ্চ প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। মহাদৌসসাধসাধনিক; মহাকার্তাকৃতিক, মহাসান্ধিবিগ্রহিক[১] ইত্যাদি পাল রাজপুরুষদের পদনামের উপসর্গ হিসাবে 'মহা' শব্দটির সংযোজনার ফলে প্রতীয়মান হয় যে এই সকল রাজ-কর্মচারীরাও ক্রমশ মহাসামন্ত ও মহারাজার শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রতীহারদের সাম্রাজ্যে রাজপদাধিকারীদের সামন্তীকরণের প্রবৃত্তি আরো বেশি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় মহেন্দ্রপালের বলাধিকৃত কোকট্টকে পরমেশ্বরপাদোপজীবী বলা হত।[২] সমসাময়িক তন্ত্রপালকে মাধব এবং মহাদণ্ডনায়ককে মহাসামন্ত বলা হত।[৩] আবার একটি নগরের শাসক উণ্ডভট মহাপ্রতীহারের পদে নিযুক্ত থাকলেও মহাসামন্তাধিপতি উপাধিতে ভূষিত ছিল।[৪] মনে হয় এই উপাধির সঙ্গে কিছু অধিকার ও কর্তব্যও যুক্ত ছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা নেই। যাই হোক এটা স্পষ্ট যে মহাসামন্তের স্থান অতি উচ্চ ছিল এবং তাদের প্রজারা যখন ধর্মীয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করত, তখন স্তম্ভে রাজার সঙ্গে মহাসামন্তেরও উল্লেখ করত।[৫]

রাষ্ট্রকূটদের শাসনকালে রাজপদাধিকারীদের সামন্তীকরণ প্রথা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছিল বলে মনে হয়। ধ্রুবের মহাসান্ধিবিগ্রহিক শ্রীমান্দল্ল পঞ্চবাদ্যের অধিকারসম্পন্ন সামন্ত ছিল।[৬] প্রাদেশিক শাসকদের মহাসামন্ত বা মহামণ্ডলেশ্বর পদ দেওয়া হত[৭] এবং সাধারণতঃ তারা রাজা অথবা রাসা (কন্নড়) উপাধি গ্রহণ করত।[৮] কিছু বিষয়পতিও (জেলাধিকারী) সামন্তরাজাদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।[৯] ভুক্তি বা তালুকের প্রধান পদাধিকারী ভৌগিক বা ভোগপতিরাও কখনও কখনও সামন্ত রাজাদের উপাধি ধারণ করত।[১০] বড় বড় নগরের শাসকরাও অনুরূপ আচরণ করত। কর্ণাটকস্থিত সোরতুরের শাসক কুপ্পে প্রথম অমোঘবর্ষের মহাসামন্ত ছিল।[১১] প্রতীহারদের সাম্রাজ্যে সিয়ডোনী নগরের শাসকও একজন সামন্ত ছিল। সামরিক পদাধিকারীদের বর্ণাঢ্য পোশাক দেওয়া হত। তা ছাড়া তাদের এমন কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত যা শুধু সামন্ত সর্দাররাই ভোগ

১। এ. ই. xvii, নং ১৭, প ২৬-৩৩ ; xxix, নং ১ 'বি', প ৩১-
২। ঐ xiv, নং ১৩, প ১৯-২০
৩। ঐ, প ২০
৪। ঐ i, পৃঃ ১৭৩, প ৫
৫। ঐ iv, নং ৪৪, প ১-১০
৬। ঐ x, নং ১৯, প ৬৫-৬
৭। ঐ xix, নং ৪ 'এ', প ৪
৮। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৭৩
৯। ঐ, পৃঃ ১৭৭
১০। ঐ, পৃঃ ১৭৮
১১। ঐ, পৃঃ ১৮২

করত। চতুর্থ গোবিন্দের অধীনস্থ বিসোত্তর নামক ব্রাহ্মণ দণ্ডনায়ককে ৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় বস্ত্র ও ছত্র দেওয়া হয়েছিল এবং হাতি ও রথ ব্যবহারের অনুমতিও তাতে দেওয়া হয়েছিল।[১] যুবরাজকেও সামন্তদের অনুরূপ উপাধি প্রদান করা হত।[২]

উচ্চ-রাজকর্মচারীদেব নামপদের সঙ্গে সামন্তদের উপাধির সাদৃশ্যের দুটি কারণ হতে পারে—হয় সামন্ত বা মহাসামন্তদেরও উচ্চ-রাজপদে নিযুক্ত করা হত, না হয় উচ্চ-রাজকর্মচারীদেবই সামন্ত উপাধি দেওয়া হয়ে থাকত। প্রথম সম্ভাবনাটি খুব যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না, কারণ রাজপদগুলি পুরাতন, কিন্তু সামন্তদের উপাধিগুলি নতুন। তা ছাড়া প্রতিহারসাম্রাজ্যে এমন অনেক রাজকর্মচারী ছিল, আগে যাদের কোনো সামন্তীয় উপাধি ছিল না যদি প্রথম সম্ভাবনাটিকে সত্য বলে স্বীকার করি তা হলে এটাও স্বীকার করতে হবে যে যুবরাজকেও প্রথমে মহাসামন্তরূপে নিযুক্ত করা হত এবং তারপর তাকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হত। কিন্তু সহজেই অনুমেয় যে এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই অসঙ্গত, কাবণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে অতএব দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। সামন্তীকরণের এই প্রক্রিয়া সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করেছিল এবং রাষ্ট্রকূটদেব রাজ্যে সামন্তরাজাদের অতিরিক্ত সামরিক ও অসামরিক পদাধিকারীদেরও কোনো না কোনো সমন্তীয় মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকত। মনে হয় যে যতক্ষণ না কোনো পদকে সামন্তীয় উপাধিতে ভূষিত করা হত, ততক্ষণ তার কোনো মহত্ত্ব প্রকাশ পেত না।

রাজ্যাধিকারীদের সামন্তীকরণ যে ব্যাপকরূপ ধারণ করেছিল তার একটি পরিচয় রাজা ও সামন্ত এবং রাজা ও রাজপদাধিকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত শব্দাবলী থেকে পাওয়া যায়। যদিও কৌটিল্য তাব অর্থশাস্ত্রের এক জায়গায় 'রাজোপজীবী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন[৩] তবু যেন আলোচাকালেব শিলালিপিতে রাজপদাধিকারী বা সামন্তদের সম্বন্ধে এই শব্দটির অধিক প্রয়োগ হয়েছিল। গুপ্তকালের পরিব্রাজক শিলালিপিতে 'পাদপিণ্ডোপজীবী'[৪] শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এখন পাল শিলালিপি ও অন্যান্য শিলালিপিতেও এই ধরনের বেশ কয়েকটি

১। এ. ই. xiii, ৩৩৪ (শ্লোক ১০)
২। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৫২
৩। অর্থশাস্ত্র II, ৭
৪। ক. ই. ই. iii, নং ২৩, প ১০-১

শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'পাদপদ্মোপজীবী'[১] 'রাজপাদোপজীবী'[২] 'পাদপ্রসাদোপজীবী'[৩] পরমেশ্বরপাদোপজীবী[৪], ইত্যাদি।

হরিভদ্র স্বরি (৭০০-৭০) প্রণীত প্রাকৃত গ্রন্থ 'সমরৈচ্চকহা'[৫] থেকে আমরা জানতে পারি যে সামন্তদের কখনও কখনও ভৃত্য বা সম্বন্ধী হিসাবেও অভিহিত করা হত। ঐ গ্রন্থ থেকে আরও জানতে পারা যায় যে পরাজিত সর্দাররা রাজা ও রাজার সম্বন্ধীতে পরিণত হত।[৬] এইভাবে একই রাজার অধীনস্থ দুই সামন্তের মধ্যে একজন বৈশ্য এবং অপরজন শবর হলেও তারা পরস্পরের সমন্ধিন্ বলে বিবেচিত হত। এই শব্দটিকে ডঃ দশরথ শর্মা কুটুম্ব অর্থে গ্রহণ করেছেন।[৭] কিন্তু তারা এক পরিবারভুক্তও ছিল না, তাদের মধ্যে কোনো বৈবাহিকসম্বন্ধও ছিল না। কিন্তু সমন্ধিন্ শব্দটির প্রয়োগ এই জন্য করতে হত যে প্রভু এবং তার সামন্তের সম্বন্ধের বর্ণনা অন্য কোন শব্দ দিয়ে উপযুক্তরূপে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এক রাজার দুই সামন্তকে পরস্পরের সম্বন্ধী বলা হত। উক্ত গ্রন্থ থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে সীমান্ত অঞ্চলের জনৈক সর্দার নিজ প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ঐ প্রভুর পুত্র নিজ লোকজনদের বিদ্রোহীর প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'বিগ্রহ একজন নগণ্য সর্দার। কিন্তু সে আমার পিতাকে করপ্রদান করত। অতএব সে আমাদের সম্বন্ধী। সেই জন্য তার বিরুদ্ধে কোনো কঠোর সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ নয়'।[৮] রাজকুমার নিজ পিতার ভৃত্য বিগ্রহকে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করত।[৯] অর্থাৎ রাজকুমার ও সামন্ত একই রাজার আশ্রিত ছিল। শাসকবংশের একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার নিজেকে শবর সামন্তের অনুজ ভ্রাতা বলে জ্ঞান করায় এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে বংশপরম্পরা বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, তবু সামাজিক সম্বন্ধ সব সময় তার উপর নির্ভর করত না। মাঝে মাঝে সামরিক বা রাজনৈতিক কারণেও ঐ সম্বন্ধ গড়ে উঠত, যদিও জাতীয় কিংবা পারিবারিক পরিভাষায় সেই সম্বন্ধ ব্যক্ত হত। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে এই সকল আদিবাসী সর্দারদের অনার্য বলা উচিত, কিন্তু তাদের রাজার পুত্ররূপে গণ্য

১। এ. ই. xxii, নং ৪৭, প ১৫
২। ভাগলপুর প্লেট অফ নারায়ণ পাল, ই. এ. xlvii, ৩০৪, প ৩৭
৩। ক. ই. ই. III, নং ৪৬, প ১১
৪। এ. ই. xiv, নং ২৩, প ১৯-২০
৫। প্রোসডিংস অফ টুয়েন্টিফোর্থ সেসন অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী কংগ্রেস (দিল্লী ১৯৬১) পৃঃ ৮০-১
৬। ঐ
৭। ঐ, পৃঃ ৮১
৮। ঐ
৯। ঐ

করা হয়েছে।[১] কিন্তু শিলালিপিতে 'সম্বন্ধী' ও 'ভৃত্য' শব্দ দুটি সামন্তদের প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে। সামন্তসর্দার ও রাজপদাধিকারীদের সাধারণতঃ রাজার 'পাদপদ্মোপ-জীবী'রূপেই বর্ণিত করা হয়েছে।

প্রভুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন এবং প্রভুকে সামরিক সাহায্য দান এই দুটি ছিল সামন্তদের প্রধান কর্তব্য। আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য সামন্তগণ নিজেদের অনুদান পত্রে প্রভুর নাম উল্লেখ করত, যেমন প্রতীহারদের সামন্তরা করে থাকত। চাহমান[২], চালুক্য[৩], গুলিহোত[৪] এবং কলচুরি সামন্তগণ প্রভু প্রতীহাররাজগণকে সামরিক সাহায্য দান করত। দেবপালের সময় থেকে পাল রাজাদের দ্বারা জারী করা সকল অনুদানপত্রে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যে তাঁদের জয়স্কন্ধাবারগুলিতে উত্তর ভারতেব বহু অধীনস্থ নরপতি নিজ নিজ সৈন্যসহযোগে দেবপালের সাহায্যের জন্য উপস্থিত ছিল।[৫] এই বর্ণনায় অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পাল রাজাদের জয়স্কন্ধাবারগুলিতে স্থানীয় সর্দারদের সসৈন্যে উপস্থিত থাকতে হত। এই তথ্যে তো কোন মতবিরোধই নেই যে ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কৈবতদের বিদ্রোহ দমনের সময় পাল রাজা নিজের সামন্তদের কাছ থেকে যথেষ্ট সামরিক সাহায্য লাভ করেছিলেন।

রাষ্ট্রকূট শিলালিপি থেকে আমরা সামন্তদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার এবং তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে পারি। পঞ্চমহাশব্দটির অধিকারী হওয়া সামন্তদের পক্ষে গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত হত। প্রতীহার[৬] এবং রাষ্ট্রকূট[৭] রাজারা নিজেদের কয়েকজন সামন্তকে এই গৌরবজনক উপাধি দিয়েছিলেন। এই উপাধিটি নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক ছিল, কারণ যুবরাজকেও এর থেকে বড়

১। শিলালিপিতে সম্বন্ধী শব্দের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী অর্থবোধক শব্দ হিসাবে 'যথাসম্বধ্য-মানকান'কে গ্রহণ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রকূটদের অনুদানপত্রে এই শব্দটি রাষ্ট্রপতি, বিষয়পতি, গ্রামকূট, যুক্তক, নিযুক্তাধিকারিক, মহত্তর ইত্যাদির বিশেষণরূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। স্পষ্টতঃ এখানে এই শব্দটির দ্বারা কোন সামন্তীয় সম্বন্ধের বোধ জন্মায় না। এটি ভূমি অনুদানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত উক্ত পদাধিকারীদের প্রতি প্রযুক্ত বিশেষণমাত্র।

২। হি. ক ই. পি. IV, পৃঃ ২২-৩, ২৭

৩। ঐ, পৃঃ ২৫

৪। ঐ

৫। উদীচীনানেক নরপতি প্রভৃতি·········পরমেশ্বরসেবা সমায়াতাশেষ জম্বুদ্বীপ ভূপালঃ।
এ. ই. xvii, নং ১৭, প ২২-৩

৬। এ. ই. iv, নং ৪৪, প ১-১০ ; ix, নং ১, প ৩

৭। ঐ xxii, নং ১২, প ৩৯ : ই. এ. xii, ১৮৪, প্লেট ২ 'বি', প ১—এই অনুদানপত্রগুলিতে 'সমাধিগতা-শেষ মহাশব্দ' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে ; কিন্তু এইপ্রসঙ্গে আলটেকরের স. প্র. পু.'র ৪২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত দ্বিতীয় কর্কের অগ্রোলী-হড়োলী দলিলটি দ্রষ্টব্য।

সম্মান দেওয়া হত না। কয়েকজন সামন্ত রাজা পরমভট্টারক মহারাজ পরমেশ্বরের ন্যায় গুরুগম্ভীর উপাধি ধারণের পরেও উক্ত উপাধিটি ত্যাগ করেন নি। তবে এই উপাধিটি আসাম ও উড়িষ্যাতে প্রচলিত থাকলেও পালসাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল না। রাষ্ট্র-কূটদের অধীনস্থ সামন্তদের সামন্তীয় সিংহাসন, চামর, পালকি ও হাতি ব্যবহারেরও অনুমতি দেওয়া হত।[১] কিন্তু পাল ও প্রতীহারদের রাজ্যে এই প্রথার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে উপসামন্ত নিযুক্ত করার গুরুত্ব-পূর্ণ অধিকার সামন্তদের ছিল। এই উপসামন্তদের মধ্যেও কাউকে কাউকে পঞ্চ-মহাবাদ্য ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কোঙ্কণের শিলাহারের সামন্ত মহাসামন্ত বিশ্বদেবরস[২], গুজরাটের রাষ্ট্রকূট-সামন্ত উদ্ধবসের[৩] উল্লেখ করতে পারি। বড় বড় সামন্তদের নিজ প্রভুর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ শুধু কর-প্রদান করতে হত, কিন্তু নিজ নিজ এলাকায় রাজস্ব আদায়ের অবাধ অধিকার তাদের ছিল। তারা যাকে খুশি কর আদায়ের অধিকার[৪] প্রদান করতে পারত। এর জন্য কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করা হত, আবার কখন অনুমতি গ্রহণের অবশ্যকতাই থাকত না। পশ্চিম চালুক্যদের রাজ্যে সামন্তগণ বাজার অনুমতি ছাড়াই গ্রামগুলি বিক্রয়ও করতে পারত।[৫]

প্রভুর প্রতি সামন্তদের সামরিক এবং অসামরিক উভয়-প্রকার কর্তব্যই ছিল। অসামরিক কর্তব্যের মধ্যে প্রধান ছিল প্রভুকে কর প্রদানকরা, কখনও কখনও প্রভু স্বয়ং গিয়ে কর আদায় করতেন। রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ সামন্তদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য নিজ সাম্রাজ্যে দক্ষিণাঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন।[৬] উত্তরকালে রচিত একটি গ্রন্থ 'নীতিবাক্যামৃত' থেকে জানা যায় যে প্রভুর গৃহে পুত্র জন্ম বা বিবাহোৎসবে সামন্তগণ বিশেষ বিশেষ উপহার ভেট দিতেন।[৭] উৎসবকালে বা অন্য সময়ে মাঝে মাঝে রাজদরবারে উপস্থিত থাকাও সামন্তদের অসামরিক কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল।[৮] রাজদরবারে উপস্থিত থেকে তারা রাজভক্তির পরিচয় দিত। প্রভুকে পরামর্শ দেওয়া বা কেন্দ্রের প্রশাসনিক কার্যে সহায়তা করা সামন্তদের কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।

১। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ-পৃঃ ২৬৩
২। এ. ই. xix, নং ৪ 'এ', প ৪-৫
৩। ঐ iii. নং ৯, প ১২-৯
৪। ই. এ. xiii, ১৬০-১, প ৪৫-৫ ; xii, ১৩৬
৫। এ. ই. iii, ৩০৭
৬। ই. এ. xi, ১২৭
৭। XXX, ৩২, আলটেকর কর্তৃক ২৬৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত
৮। ঐ, পৃঃ ২৬৪

সামন্তদের সামরিক কর্তব্যই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং যুদ্ধকালে প্রভুর জন্য সৈন্যসংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব ছিল। রাষ্ট্রকূটদের সামন্তদের নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য-সরবরাহ করতে হত এবং যুদ্ধকালে প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতে হত। গঙ্গদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকূটদের যুদ্ধের সময় তাদের সামন্ত বেঙ্গীর চালুক্য সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল।[১] তৃতীয় ইন্দ্রের সামন্ত রাজা নরসিংহ চালুক্য গুর্জর-প্রতীহাররাজ মহীপালের বিরুদ্ধে ইন্দ্রের যুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে থেকে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।[২] রাষ্ট্রকূটগণ গুজরাটে একটি উপরাজ্য স্থাপন করেছিলেন যা প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট জায়গীর ছিল। এটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল গুর্জর-প্রতীহারদের হাত থেকে মালবকে রক্ষা করা।[৩] এই মালব অধিকারের জন্য পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা ও রাজপুতদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল।

যেমন রাষ্ট্রকূটগণ তাদের সামন্তদের কাছ থেকে সামরিক সেবা দাবী করতেন তেমনি আবার সামন্তগণ নিজ নিজ উপসামন্তদের কাছ থেকে অনুরূপ সেবা দাবী করত। শিলাহার মহামণ্ডলেশ্বর গণ্ডরাদিত্যদেবের কোলাপুর শিলালিপি থেকে আমরা এর প্রমাণ পাই। যদিও শিলালিপিটি ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দের, তবু এটিতে সন্নিবিষ্ট তথ্যকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষ করে শিলাহারগণ যখন রাষ্ট্রকূটদেরই সামন্ত ছিল। এটিতে বিভিন্ন সামন্তদের সঙ্গে মহাসামন্ত নিম্বদেবেরস'র সম্বন্ধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই সামন্তদের মধ্যে ছিল কিছু মিত্রভাবাপন্ন ও কিছু-সংখ্যক শত্রুভাবাপন্ন। এখানে মিত্রভাব ও শত্রুভাব বলতে সম্ভবতঃ নিম্বদেবেরস'র প্রভু গণ্ডরাদিত্যের প্রতি মিত্রভাব ও শত্রুভাবসম্পন্ন সামন্তদের বোঝাচ্ছে। মহাসামন্তের বীরত্বের বর্ণনা করে তাকে বলা হচ্ছে "বিজয়লক্ষ্মীর স্বামী, শত্রুসামন্তদের পত্নীদের সীমান্তশোভা হরণকারী, সমর-বারাঙ্গনা প্রিয়, বৈরী সামন্তরূপী মেঘের বিলয়কারী, নাগল দেবীর পক্ষে মদমত্ত হস্তী, বিদ্বেষী সামন্তদের পক্ষে প্রলয়কাল, যোগ্য সামন্তের পক্ষে গোপাল, তারাসুররূপী বিরোধী সামন্তদের পক্ষে কার্তিকেয়, তোণ্ডসামন্তরূপী কমলকে মর্দনকারী প্রচণ্ড হস্তী, সামন্তশিরোমণি গণ্ডরাদিত্যদেবের দক্ষ দক্ষিণ ভূজায় দণ্ডস্বরূপ"।[৪] মহাসামন্তদের বীরত্বের এই

১। ঐ, পৃঃ ৯১-৪
২। নাগবর্মাকৃত 'কর্ণাটক-ভাষাভূষণ', স. এল. রাইস, ভূমিকা, পৃঃ ১৪
৩। ই. এ. xii, ১৫৮
৪। "বিজয়লক্ষ্মীকান্তম্ রিপুসামন্তসীমন্তিনীসীমন্তভঞ্জনম্ বীরবরাঙ্গনাপ্রিয়ভুজঙ্গম্ বৈরীসামন্ত-মেঘবিঘটনসমীরণম্ নাগলদেবীমদগন্ধবারণম্ বিদ্বিষ্টসামন্ত বিলয়কালম্ সামন্তগণ্ডগোপালম্ তারকসামন্ততারাসুরবীরকুমারম্ সামন্তকেদারম্ টোণ্ডসামন্তপুণ্ডরীকবিরদং প্রচণ্ডদেবদণ্ডম গণ্ডরাদিত্যদেবদক্ষিণভুজাদণ্ডম্...সামন্তশিরোমণি...।" এ. ই., xix, নং ৪ 'এ', প ৫-৮

প্রশস্তি আক্ষরিকভাবে সত্য না হলেও এর দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে শত্রুসামন্তদের দমন করা এবং মিত্রসামন্তদের রক্ষা করা মহাসামন্তের কর্তব্য ছিল।

অধিস্বামী নিজ অধীনস্থ সামন্তদের উপর বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ রাখতেন। রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজাদের নিজেদের কাছে অধিস্বামীর একজন দূতকে পালন করতে হত। রাজদূত মোটামুটিভাবে সামন্তরাজের কাজকর্ম দেখাশোনা করত এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখত। বৃটিশশাসনে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে নিযুক্ত রেসিডেণ্টের সঙ্গে এই রাজদূতের তুলনা করা চলে। স্থলেমানের মতে সর্বোচ্চ শক্তির প্রতিনিধির যেরূপ আদর-অভ্যর্থনা হওয়া উচিত, এই রাজদূত সেইরূপ সম্মান-লাভ করত। রাজা সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহের জন্য অসংখ্য গুপ্তচর নিযুক্ত করতেন। প্রথম অমোঘবর্ষ বিরোধী রাজাদের রাজসভায় বারাঙ্গণাদের দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ এরা সম্রাটের প্রতিনিধির অধীনে কাজ করত।[১] অধিস্বামী সম্রাট নিজ অধিকার বা শক্তি প্রকাশ করবার জন্য যখন-তখন নিজ সামন্তের অধীনস্থ এলাকায় নিজ প্রিয়জনকে গ্রামদান করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় কৃষ্ণ যে নিজ মহাসামন্ত প্রচণ্ডের রাজ্যের অন্তর্ভূত একটি গ্রাম কাউকে দান করেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে।[২] অবিশ্বস্ত সামন্ত রাজাদের অপমান ও প্রতিশোধের ভয় দেখিয়ে বশে রাখা হত। বিদ্রোহে বিফল হলে পরাজিত সামন্তদের নানাভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হত। দ্বিতীয় গোবিন্দ পরাজিত বেঙ্গীর শাসককে আস্তাবল পরিষ্কার করার কাজ করতে বাধ্য করেছিলেন।[৩] বিদ্রোহ করার দণ্ড হিসাবে সামন্তরাজা বিজেতাকে নিজ মূল্যবান রত্নাদি, রাজকোষ, নর্তকীবৃন্দ, ঘোড়া ও হাতি অর্পণ করতে বাধ্য হত।[৪] এমন কি পরাজিত সামন্তদের পত্নীদেরও কারাগারে আবদ্ধ করা হত।[৫] কখনও কখনও পরাজিত সামন্তরাজার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বাজেরাপ্ত করে নিয়ে রাজা নিজ আশ্রিতদের মধ্যে ব্যয়নির্বাহের জন্য ভাগ করে দিতেন। দক্ষিণ আর্কটের চোলদের রাজ্যজয় করার পর তৃতীয় কৃষ্ণ এইরূপই করেছিলেন।[৬]

রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্র সামন্তদের সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা করত সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই। যুদ্ধ বা শান্তি উভয়কালেই রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বে সম্ভবতঃ মহা-

১। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৬৪
২। এ. ই. i, নং ৮, প ৩৩-৫
৩। ঐ, xviii, নং ২৬, শ্লোক ৪৩-৬
৪। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ ২৬৭
৫। ঐ
৬। এ. ই. iv, নং ৪০, শ্লোক ৩৪-৫

সান্ধিবিগ্রহিকই সামন্তদের প্রতি রাজকীয় নীতির পরিচালনা করত। আলটেকরের মতে এই পদাধিকারীই সমস্ত ভূমি অনুদানপত্রের মুসাবিদা করত, কারণ পররাজ্য বিভাগের দপ্তরেই দাতার পরাক্রম ও বংশগৌরব সম্বন্ধে সত্য ও সর্বাধুনিক তথ্যাদি থাকত এবং তা অনুদানপত্রে উল্লেখ করা হত।[১] অনুদানপত্রে দাতা, গ্রহীতা ও প্রদত্ত গ্রামের নাম-ঠিকানা ইত্যাদিব সমান গুরুত্ব ছিল এবং এগুলি রাজস্ববিভাগই সঠিকভাবে দলিলবদ্ধ করতে পারত। বিষ্ণুধর্মপুরাণে বলা হয়েছে যে সান্ধি-বিগ্রহিকের আয়-ব্যয়েব জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন স্থানের লোকদেব সম্বন্ধে ও বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সম্বন্ধেও তাব জ্ঞান থাকা উচিত।[২] স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভূমি অনুদানের সম্পর্কিত কাজেব জন্য এই সমস্ত জ্ঞানের আবশ্যকতা ছিল। সান্ধি-বিগ্রহিককে ভূমি অনুদানসংক্রান্ত কাজ করতে হত, কারণ বিভিন্ন প্রকার সামন্তদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করার জন্য ভূমি অনুদাননীতিব যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটদের প্রভুত্ব সমাপ্তকারী কল্যাণীর চালুক্যবংশীয় রাজা তৃতীয় সোমেশ্বব বচিত 'মানসোল্লাসে' (রচনাকাল ১১৩১) বলা হয়েছে যে সামন্ত, মণ্ডলেশ ও বিশেষ কবে মান্যকদের নিজের সামনে উপস্থিত হতে বাধ্য কবা, তাদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করা এবং তাদের স্থানে নতুন লোক নিয়োগ করা, ইত্যাদি বিষয়ে সান্ধিবিগ্রহিকের বিশেষ জ্ঞান থাকা উচিত।[৩] যেহেতু শান্তিকালে সামন্তদের সঙ্গে শুধু ভূমি অনুদানে প্রদত্ত ভূমিব কর নির্ধারণ বা আদায় করা বা জায়গীরের সীমানা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল সান্ধিবিগ্রহিকের কাজ, এই জন্য সান্ধিবিগ্রহিক শুধু ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানপত্রই নয়, বরং মঠ-মন্দির ও ব্রাহ্মণদের অনুদানপত্রগুলিও প্রস্তুত করত।[৪]

সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও সামন্তগণ মাঝে মাঝে কেন্দ্রের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করত। দ্বিতীয় গোবিন্দের সামন্তগণ তাঁর বিরুদ্ধে করে তাঁর কাকা তৃতীয় অমোঘবর্ষকে সিংহাসন প্রদান করে এবং রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষার জন্য তাঁকে রাজসিংহাসন গ্রহণ করতেই হয়। আলটেকরের মতে 'সামন্তৈরথরট্ট রাজ্যমহি মালম্বার্থমভ্যর্থিতঃ'[৫] বাক্যাংশটির ঐ অর্থ করা হলেও, কথাগুলি রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।[৬] কিন্তু আমরা জানি যে বাংলাদেশের পালবংশীয় এবং উড়িষ্যার সেনবংশীয় রাজাগণ কখনও কখনও নির্বাচনের মাধ্যমে নিযুক্ত হতেন।

১। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৬৬
২। ii, ২৪, ১৬-৭
৩। II, শ্লোক ১২৮
৪। যাজ্ঞঃ মিতাক্ষরা প ৩১৯-২০
৫। এ. ই. iv, নং ৪০, শ্লোক ২১ ; v, নং ২০, শ্লোক ১৯
৬। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৫১

এই দৃষ্টান্ত থেকে তৃতীয় অমোঘবর্ষের নির্বাচন সমর্থিত হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে সামন্তগণ রাজাদের পদচ্যুত বা প্রতিষ্ঠা দুই-ই করতে সমর্থ ছিল। অবশ্য এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল এবং এরূপ কার্য আইনবিরুদ্ধ ছিল।

স্থানীয় শাসন ধীরে ধীরে পারিবারিক পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত হচ্ছিল, তার মধ্যে সামন্ত ও অভিজাত ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১০ বা ১২টি গ্রামের তত্ত্বাবধায়কের পদে জেলাপদাধিকারীগণ নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনকেই নিযুক্ত করত। প্রথম অমোঘবর্ষেব সময়ে ধারওয়ার জেলার জনৈক পদাধিকারী ৩০০ গ্রামের শাসক ছিল, এই ব্যক্তি ১২টি গ্রামেব তত্ত্বধায়ক পদে নিজ কুটুম্বকে নিযুক্ত করেছিল।[১] বনবাসীর শাসক বঙ্কেয় নিজ পুত্র কুন্দট্টকে 'নিডগুগুন্দাগে দ্বাদশ' অর্থাৎ দ্বাদশটি গ্রামেব এককেব প্রশাসক নিযুক্ত কবেছিল।[২] আলটেকরের মতে রথিক, রাষ্ট্রীয়, বাষ্ট্রপতি ও বাষ্ট্রকুট শব্দ স্থানীয় সর্দার, জেলাধিকারী, বড় বড় জোতদার বা জমিদাবদেব সম্বন্ধে ব্যবহৃত হত।[৩] কিছু-কিছু দলিলে বিষয়মহাপাত্র ও রাষ্ট্রমহাপাত্র শব্দেব উল্লেখও পাওয়া যায়।[৪] এরাও সম্ভবতঃ স্থানীয় শাসনব্যবস্থাব সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, কিন্তু যতদূব সম্ভব এই পদ অভিজাত সম্প্রদায় থেকে এবং বংশপরম্পরায় নিযুক্ত হত।

অনুদানপত্রে শুধু গ্রামবৃদ্ধদের উল্লেখ থেকে প্রতীয়মান হয় যে গ্রামীণ ক্ষেত্রে একপ্রকাব সামাজিক বর্গীকরণের অস্তিত্ব ছিল। বাংলাদেশ ও বিহারের অনুদান-পত্রগুলিতে ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল পর্যন্ত গ্রামেব সকল বর্ণের ব্যক্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে রাষ্ট্রকূট অনুদানপত্রে এদের উল্লেখ নেই বরং এদের জায়গায় মহত্তর বা মহত্তরাধিকারীদের উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] এদের মধ্যে আবার কারো কারো পদমর্যাদা বৃদ্ধি হয়ে রাণকে উন্নীত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মহত্তর গোগুরাণকের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ব্যক্তি প্রথম অমোঘবর্ষের একটি অনুদানপত্রের কার্যনিবাহক।[৬] দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে দ্বিতীয় কৃষ্ণের অধীনে সমমর্যাদাসম্পন্ন এক মহত্তর সর্বাধিকারীর উল্লেখ করা যেতে পারে।[৭] মহত্তরদের মর্যাদাবৃদ্ধির ফলে গ্রামীণ এলাকার অন্যান্যদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল বলে মনে হয়। মহত্তরগণ একটি শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল যার মধ্যে থেকে রাষ্ট্রকূট রাজাগণ

১। এ. ই. iv, ১০৭
২। ঐ vii, ২১৪
৩। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৬
৪। ঐ, পৃঃ ১৫৮
৫। ই. এ. xii, ২৫১, প ৪১ ; ২৬৩, প ৫৫-৬
৬। এ. ই. xviii, ২৫৩
৭। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৬০

নিজ উচ্চ-পদাধিকারীদের নির্বাচন করতেন এবং এই শ্রেণীই রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্যে সামন্তবাদের বিকাশে উৎসাহ দিয়েছে।

রাজ্য, শিল্পী ও বণিকসমাজের মধ্যে সামন্তীয় সম্বন্ধের বিকাশসাধন রাষ্ট্রকূট শাসন-প্রণালীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। চালুক্যরাজ জগদেকমল্ল দম্বলের এক বণিকসংঘকে ছত্র, চামর ও রাজকীয় সনদ প্রদান করেছিলেন।[১] রাষ্ট্রকূটদের অধীনেও বণিক ও শিল্পী সংঘের অবস্থা অনুরূপ ছিল বলে মনে হয়; কারণ রাষ্ট্রকূটদের সামন্ত শিলাহারের কোলপুর[২] ও মিরাজে[৩] প্রাপ্ত শিলালিপিতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে বীর-বলঞ্জোদের (সাহসী বণিকসংঘ) ধ্বজায় পর্বত অঙ্কিত ছিল। ছত্র, চামর ও পতাকা রাজার দ্বারা প্রদত্ত অধিকারের প্রতীক ছিল এবং এটি মধ্যযুগীয় ইউরোপে শ্রমিক ও শিল্পী সংঘকে প্রদত্ত সামন্তীয় সনদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন সামন্তদের সৈন্যসরবরাহ করতে হত, তেমনি এই সংঘগুলি রাজাকে সামরিকভাবে সাহায্য করতে বাধ্য ছিল। কোলাপুরে প্রাপ্ত দলিলে বণিকসংঘের সভ্যদের বর্ণনা এরূপ সাহসী বীররূপে করা হয়েছে যে তারা যশস্বী, তাদের হৃদয়ে বাহুবলে বিজিতা জয়শ্রীর চিরবাস এবং তাদের পরাক্রম বিশ্ববিশ্রুত।[৪] চালুক্য রাজ্যের অনুরূপ একটি সংঘের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এদের হৃদয় আবেগ ও সাহসিকতায় পরিপূর্ণ।[৫] এই সব থেকে প্রতীয়মান হয় যে বণিকসংঘ সৈন্যপালন করত এবং সম্ভবতঃ নিজ প্রভুর সহায়তাও করত।[৬]

পালদের কোনো স্থায়ী রাজধানী ছিল না। পাটলিপুত্র[৭], মুদ্গগিরি[৮], রামাবতী[৯] (মালদহ জেলায় আধুনিক গৌড়ের কাছে), বট পর্বতক (ভাগলপুর জেলায় আধুনিক বটেশ্বর পর্বত), বিলাসপুর বা হরধাম[১০], সাহসগণ্ড[১১], কাঞ্চনপুর[১২] ও

১। ই. এ. x, ১৮৮
২। এ. ই. xix, নং ৪, প ১২
৩। ঐ, 'বি', প ৩ (চালুক্য শিলালিপিতেও এইরূপ পতাকার উল্লেখ আছে) দ্রঃ ই. এ. ৮, ৩৪৪
৪। এ. ই, xix, ৩৪
৫। ই. এ. x, ১৮৯
৬। এ. ই. iv, নং ৩৪
৭। অধ্যাপক ব্যসমের মতে চুলবংশের অনুসারে মণিগ্রাম লঙ্কার রাজাকে সৈন্তসরবরাহ করত।
৮। ভাগলপুর প্লেট অব নারায়ণ পাল, ই. এ. xlvii, পৃঃ ৩০৪, প ২৭-৮
৯। 'দি মনহালী কপার প্লেট এট সেটরা'
১০। ই. এ. xiv, ১৬৬-৮; xxi, ৯৭-১০১; এ. ই. নং ২৩, প ২৮
১১। এ. ই. xxvi, নং ১ 'বি', প ২৬
১২। ঐ, নং ৭, প ২৪

কপিলবাসক[১] এইগুলি পালদের জয়স্কন্ধাবাররূপে বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত রাজধানী-গুলিই গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এবং এই গঙ্গানদীই পালসাম্রাজ্যকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কিন্তু বার বার রাজধানী পরিবর্তন কেন্দ্রীয় শক্তির বিচ্ছিন্নতার পরিচায়ক এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ সামন্তীয় ব্যবস্থার পরিচায়ক। এই দিক থেকে প্রতিহারদের স্থায়িত্ব অধিক ছিল, কারণ তাঁদের রাজধানীরূপে উজ্জয়িনী ও মহোদয় অর্থাৎ কনৌজ—মাত্র এই দুটি নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] অধীনস্থ সামন্তসর্দারদের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য তাঁদের কখনও রাজধানী পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় নি।

রাজধানীর দিক থেকে রাষ্ট্রকূটগণ পালদের একেবারে বিপরীত ছিলেন কারণ তাদের মান্যখেড় বা মালখেদ নামে একটিই রাজধানী ছিল। তাঁদের কয়েকটি সৈন্য-শিবির ও সাধারণশিবিরের উল্লেখ অবশ্য আছে[৩], যেখান থেকে তাঁরা ভূমি অনুদানপত্র জারী করতেন। আল মাসুদীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে রাষ্ট্রকূটদের রাজধানী সাধারণতঃ পার্বত্যপ্রদেশে স্থাপিত হত, কিন্তু আলটেকর এ কথা স্বীকার করেন না।[৪] তবু মাসুদীর বর্ণনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বিদ্রোহী সামন্তদের দমন করার জন্য রাষ্ট্রকূটগণ রাজধানী পরিবর্তন করে পার্বত্যপ্রদেশে নিয়ে যেতেন, কারণ ঐ স্থানে প্রতিরক্ষার দিক থেকে অনেক সুবিধা ছিল।

রাজপুতদের রাজ্যব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পুরাতন ও বসতিপূর্ণ গ্রামে অভিজাত পরিবারের আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা। গুর্জরগণ হুণদের ঠিক পরেই মধ্যএসিয়া থেকে এসেছিল। মনে করা হয় যে মধ্যএসিয়ার উসুন জাতিই ভারতে আসবার পর চতুর্থ শতাব্দীতে গুসুর নামে অভিহিত হয়েছিল এবং পরে শব্দটি গুজর এবং এই শব্দটিই সংস্কৃত ভাষায় গুর্জররূপে[৫] রূপান্তরিত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা আরও একটু সংযোজন করে বলতে পারি যে গুসুরগণ বহু পূর্বেই ভারতে এসেছিল। অব্বোতাবাদে প্রাপ্ত তৃতীয় শতাব্দীর একটি শিলালিপিতে 'মকের পুত্র বা গসুর গোষ্ঠী বা শ্রেণীর সদস্য শফর' এই উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] মক ও শফর দুটিই বিদেশী নাম,

১। ঐ xxxiii, নং ৪৭, প ২

২। মেরতায় প্রতীহারদের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এই স্থানটি মণ্ডোর থেকে ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অধুনা রাজধানী শব্দের অনুরূপ অর্থে শব্দটির প্রয়োগ মধ্যকালে দক্ষিণ ভারতে হয়েছিল। (দি আর্লি হিস্ট্রী অফ দি ডেকান ; I-VI, সঃ জি. ইয়াজদানী, পৃঃ ৫১)

৩। ঐ xi, ১৫৯, প ৩৭ ; এ. ই. vii, নং ১৩, প ৩২

৪। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৪৮

৫। পি. সি. বাগচি, ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল এসিয়া, পৃঃ ১৩৮-৯

৬। এ. ই. xxx, ৬১

গম্বুর শব্দটিও তাই। গম্বুর শব্দটিকে ক্রোরয়িনে 'গুম্বুর' ও কুচী সংস্কৃতের 'গোম্বুর' শব্দটিব পর্যায়বাচী শব্দরূপে গ্রহণ কবা হয়েছে এবং এর অর্থ উচ্চ-কুলোদ্ভব ব্যক্তি বা অভিজাত গোম্বুব কুলোদ্ভব ব্যক্তি।[১] এব দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গোম্বুব বা গুর্জবগণ ভারতে বিজেতারূপে এসেছিল এবং সম্ভবতঃ তাদেব সংখ্যা খুব কম ছিল। বহিরাগত হলেও তারা এদেশে বসতিপূর্ণ গ্রামগুলিতে আধিপত্য বিস্তার কবেছিল। গোষ্ঠীপ্রথা অনুসারে বিজেতা সর্দারগণ বিজিত গ্রাম ও অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তি নিজেদেব মধ্যে ভাগ কবে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ৮৪টি গ্রামেব একক পেয়েছিল। বাষ্ট্রকূটদের অধীনে আমরা গুজরাটে ১২ এবং ৮৪টি গ্রামের একক দেখেছি। এব কাবণ সম্ভবতঃ এই যে গুজরাট গুর্জবদেব বাসভূমি ছিল।[২] গুর্জর-প্রতিহাবদের সাম্রাজ্যে এ ধরনেব এককেব পরিচয় প্রথমে প্রতীহাবদের একজন চালুক্য সামন্তের নবম শতাব্দীব শিলালিপিতে পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু চাহমান, পবমাব ও চালুক্যদের শিলালিপিতে বাবো বা বারোর গুণিতকেব অনেক এককের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] এর কাবণ সম্ভবতঃ এই তিন গোষ্ঠীরই গুর্জর-প্রতীহারদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ছিল। চারণদেব যে অনুশ্রুতিতে এই তিন জাতিকে আবু পাহাড়ের এক অগ্নিকুণ্ড থেকে উৎপন্ন বলা হয়েছে, তার থেকে এইরূপই অনুমিত হয়। মধ্যএসিয়ায় প্রাচীন উপজাতীয় সংগঠনগুলি গ্রামকে বিভিন্ন এককে বিভক্ত করার প্রথা জানত কিনা সেটা গবেষণাব বিষয়। ইউচিরা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে তহিয়া (তুখারিস্থান) জয় করে সমস্ত বিজিত এলাকা পাঁচজন সর্দারের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল।[৫] কিন্তু পূর্বমধ্যকালে মধ্যএসিয়ার উপজাতিদের মধ্যে ২৪টি গ্রামের এককের অধিক প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তুখারিস্থানে এর প্রাচীনতম ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যখন চৈনিকদের সাহায্যে ঐ অঞ্চলের তুর্কীশাসক এলাকাকে ২৪টি জেলায় বিভক্ত করেছিলেন।[৬] মধ্যএসিয়ার অধিবাসী ওগজ জগতি যাদের ইতিহাস অষ্টম শতাব্দী থেকে জানতে পারা যায়, তাদের অভ্যন্তরীণ সংগঠন পূর্বরূপ ছিল। সুরুতে ওগজ জাতি ৯টি

১। ঐ
২। পশ্চিমোত্তর ও মধ্যভারতের স্থানগুলির নাম থেকে গুর্জরদের বিস্তারের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় এবং মুসলমান ও ইংরাজ শাসনকালে গ্রামএককেব থেকে তাদের মূল প্রকৃতির আঁচ পাওয়া যায়।
৩। এ. ই. ix, নং ১এ, প ১০
৪। রামশরণ শর্মা, 'ল্যাণ্ড গ্রাণ্টস ভ্যাসলস এ্যাণ্ড অফিসিয়ালস ইন নর্দার্ন ইণ্ডিয়া' জা. ই. সো. ও. iv, ৯০-১, ৯৪
৫। পি. সি. বাগচি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২১
৬। ঐ, প ২২-৩

উপজাতিতে বিভক্ত ছিল[১], কিন্তু তারা অন্যান্য পরাজিত ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে থাকল, ফলে তাদের উপজাতির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে একাদশ শতাব্দীতে ২২টিতে পৌঁছেছিল।[২] পরে এই সংখ্যা ২৪-এ উঠেছিল, কারণ সলজুক-কালের কিনিক জাতিকে ওগজ জাতির ২৪টি উপজাতির একটি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] সম্ভবতঃ মধ্যএসিয়ায় নিজ জাতির গোষ্ঠীসংখ্যা বৃদ্ধি করার এই প্রথা মধ্যযুগীয় ভারতে গৃহীত হয়েছিল। কবিপ্রসিদ্ধি থেকে জানা যায় রাজপুত জাতি ৩৬টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, যদিও সুরুতে এই জাতি ১২ অথবা ২৪টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। মনে হয় কোন নতুন অঞ্চল বিজিত হলে, সেই অঞ্চলের অন্তত একটি করে গ্রাম বিজেতা জাতির এক-একটি গোষ্ঠীকে দান করা হত। ফলে ১২ ও ২৪টি গ্রাম-এককের উদ্ভব হয়েছিল। পরে অবশ্য এই এককগুলি একটি প্রথার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং গোষ্ঠীপ্রধান অথবা শাসকসর্দারগণকে ১২টি বা তার গুণিতকে গ্রাম দেওয়া হতে থাকল।

দ্বাদশমিক প্রথার বৈশিষ্ট্য কি ? পালদের রাজত্বে রাজস্ব আদায় করবার জন্য গ্রামপতি ও দশগ্রামিকেব অধীনে যথাক্রমে একটি ও দশটি গ্রামের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকত।[৪] এই প্রথা মনুর কাল থেকে চলে আসছিল এবং পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতেও এই প্রথাব উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ' গ্রন্থে এই সকল পদাধিকারীদের গ্রামেশ বা গ্রামস্যাধিপতি, দশগ্রামাধিপ বা দেশপাল, শতগ্রামাবিধ বা শতেশ এবং বিজয়েশ্বর বলা হয়েছে।[৫] মনে হয় দশমিকপ্রথায় রাজার দ্বারা নিযুক্ত পদাধিকারী নিজ অধীনস্থ অঞ্চলের প্রশাসনকার্য প্রত্যক্ষতঃ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে করত। পালদের অধীনস্থ রাজকর্মচারীদের বাহুল্যের কারণও বোধকরি এই, যদিও রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বেও সামন্তরাজা ও তাদের আত্মীয়ের অধীন কয়েকটি দশমিক অংশ থাকত। দ্বিতীয়তঃ দশমিকপ্রথার অন্তর্গত পদাধিকারীদের বেতন হিসাবে ভূমি দেওয়া হত, এই জমি ছিল তাদের অধীনস্থ জমির ক্ষুদ্র অংশমাত্র। অপরপক্ষে চাহমান শিলালিপি থেকে জানা যায় যে দ্বাদশমিক প্রথার অন্তর্গত গ্রামের শাসন সাধারণতঃ নিয়মিত রাজকর্মচারীদের হাতে থাকত না, বরং সামন্তদের হাতে থাকত। অবশ্য এই সামন্তগণ সাধারণতঃ শাসক বংশোদ্ভূতই হতেন। আরো দেখি যে দশমিকপ্রথা উত্তর-পূর্ব

১। সি. ই. বসওয়ার্থ, দি গজনবীডস, পৃঃ ২১০
২। ঐ, পৃঃ ২১০-১
৩। ঐ, পৃঃ ২৯৮, পাদটীকা ৪৪
৪। এ. ই. iv, নং ৩৪, প ৪৭; দশগ্রামী শব্দটির উল্লেখ সর্বপ্রথম কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়।
৫। এইচ. সি. রায়চৌধুরী, দি আর্লি হিষ্ট্রী অফ ডেকান, খণ্ড ১-৪, জি. ইয়াজদানী সম্পাদিত।

ভারতে প্রচলিত ছিল, সেটা অষ্টম শতাব্দী থেকে দক্ষিণ ভারতেও প্রচলিত হয়ে গেল, কারণ সেখানে অধিকসংখ্যায় বহিরাগত ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে নি। অপরপক্ষে দেখা যায় যে দ্বাদশমিক প্রথা রাজস্থানের কিছু অংশে এবং গুজরাটে প্রচলিত ছিল। পরে উত্তরপ্রদেশেও এর প্রচলন হল।[১] কালক্রমে এই রাজপুত গ্রামএককগুলির শাসকগণ নিজেদের এগুলির উপভোক্তা মনে করতে লাগলেন; এবং এই ভূমিকে স্বভোগভূমি নামে অভিহিত করতে থাকলেন।

ভূসম্পত্তিসম্পন্ন মন্দিরের ও বিহারের পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের সংখ্যায় বৃদ্ধি, সামন্ত ও রাজপুরুষদের বেতন হিসাবে ভূমিদান, রাজা ও রাজকর্মচারীদেব উপাধির সামন্তবাদী, বারে বাবে রাজধানী পরিবর্তন, রাজপুত পরিবারের মধ্যে পুরাতন গ্রামের বিভাজন; এই সমস্তই উত্তর ভারতে মধ্যযুগীয় রাজ্যব্যবস্থায় সামন্তপ্রথা প্রচলনের অঙ্গ। তবে সব মিলিয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি পালদের রাজ্যব্যবস্থা অপেক্ষা প্রতীহারদের রাজ্যব্যবস্থায় অধিক বিগুমান ছিল। রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্যে রাজস্ব ও প্রশাসনসম্বন্ধীয় অধিকার ভোগকারী ধর্মীয় উপভোক্তার সংখ্যা ছিল বেশি; সামন্তদের দ্বারা উপসামন্ত নিযুক্ত করাব প্রথাও ছিল বেশ ব্যাপক, সামন্তদের কর্তব্য ও অধিকারের সীমা ছিল সুনির্দিষ্ট; এরা কখন কখন রাজাকেও পদচ্যুত করতে পারত, এবং বণিক ও শিল্পীদের সংঘকেও সামন্তের মর্যাদা দেওয়া হত। রাজকর্মচারীদের সংখ্যা ছিল কম এবং এরাও ক্রমশ সামন্তে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল। স্থানীয় শাসন সাধারণতঃ সামন্তের অনুরূপ কর্মচারী, সামন্ত অথবা তাদের পরিবাবের হাতেই থাকত এবং গ্রামের মহত্তরদের সঙ্গে এদের কিছু সম্বন্ধ থাকত। কিন্তু রাষ্ট্রকূটদের রাজধানী ছিল স্থায়ী এবং তাঁদের সাম্রাজ্যে বারো বা ষোলটি গ্রামের রাজপুত এককের পরিবর্তে সাধারণতঃ দশমিকপ্রথাই প্রচলিত ছিল।

৩

তিন রাজ্যে সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

(প্রায় ৭৫০—১০০০ খ্রীঃ)

মধ্যস্বত্বভোগী জোতদারের আবির্ভাব, কৃষক ও শিল্পীদের স্থানান্তরে গমনাগমনে বাধা, ব্যবসায়ে অবনতি ইত্যাদি গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালের অর্থব্যবস্থায় দেখা দিয়েছিল; পরবর্তীকালে পাল, প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের সময়ে তার আরও অবনতি দেখা দিয়েছিল। পালরা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ভূমিদান করেছিলেন। এই অনুদানগুলির উপভোক্তা ছিল বৈষ্ণব[১] ও শৈবগণ[২] কিন্তু এদিক থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল বৌদ্ধবিহারগুলির।[৩] এগুলির মধ্যে সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নালন্দাবিহারের অধীনে ছিল দুইশত গ্রাম।[৪] নবম শতাব্দীতে দেবপালের আমলে আরও পাঁচটি গ্রাম নালন্দাবিহারকে দেওয়া হয়েছিল।[৫] অনুরূপভাবে উদ্দন্তপুরী, বিক্রমশীলা ও জগদ্দল বিহারগুলির অধীনেও শত শত গ্রাম ছিল। তা ছাড়া বহু ব্রাহ্মণকেও যে ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।[৬] বলা হয় যে বাংলাদেশে চাষের উপযুক্ত খুব কম জমিই অনুদান দেওয়া হয়েছিল। ফলে সাধারণ চাষীসম্প্রদায়ের উপর তার কোনো প্রভাব পড়ে নি।[৭] কিন্তু এরূপ চিন্তাধারা সম্ভবতঃ ঠিক নয়, কারণ হর্ষের সময়ে শিক্ষাসম্বন্ধীয় ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ অনুদান দেওয়া হত এবং এই প্রথা সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে প্রচলিত ছিল। যাই হোক না কেন পালদের যেসব অনুদানপত্র এখনও পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় যে পুরোহিত, মন্দির এক মঠের অধীনে বহু গ্রাম ছিল।

অবশ্য আমরা এমন কোনো ইঙ্গিত পাই না যে প্রতীহারদের রাজ্যে বড় বড় ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হাতে অসংখ্য গ্রাম ছিল, কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে তাঁদের রাজত্বে যথেষ্টসংখ্যক গ্রাম অগ্রহাররূপে[৮] দান করা হয়েছিল।

১। এ. ই iv, নং ৩৪, প ৩০-৫২
২। ই. এ. xlvii, পৃঃ ৩০৪, প ৩৯-৪৭
৩। এ. ই. xxiii, নং ৪৭, প ১৭-২৪
৪। জে. তককুসু (অনুঃ)—এ রেকর্ড অফ দি বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়ন (ইৎসিঙের বিবরণ) পৃঃ ৬৫
৫। এ. ই. xviii, নং ১৭, প ৩৩-৪০
৬। ঐ
৭। পি. সি. চক্রবর্তী, হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল (আর. সি. মজুমদার সম্পাদিত)। পৃঃ ৬৪৭
৮। এ. ই. xix, নং ২, প ১-১৬ ; নং ২৪, প ৬-৭

তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ পুরোহিত ও মন্দির প্রতীহার রাজা ও সামন্তদের কাছ থেকে প্রচুর গ্রাম অনুদান পেয়েছিল।

কিন্তু পাল ও প্রতীহার রাজ্যে যুক্তভাবে মন্দির ও ব্রাহ্মণদের হাতে যত গ্রাম ছিল, এককভাবে রাষ্ট্রকূটদের রাজ্যে তার চেয়ে বেশি গ্রাম তাদের অধীনে ছিল। বিক্ষিপ্তভাবে দান করা গ্রামগুলি ছাড়াও এই বংশের একজন শাসক ৪০০টি গ্রাম পুনরায় দান করেছিলেন।[১] অন্য একজন রাজা ১৪০০টি গ্রাম, তাব মধ্যে ৬০০টি অগ্রহাবরূপে এবং ৮০০টি দেবকুলরূপে দান করেছিলেন।[২] এইভাবে দেখা যায় যে রাষ্ট্রকূটদের কালে ব্যক্তিগত পুরোহিতগণ নয় বরং তাদেব প্রতিষ্ঠানগুলিই বিশিষ্ট ভূম্যধিকারীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু পাল ও প্রতীহার রাজ্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। মহারাষ্ট্রে এই ব্যবস্থা সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যের প্রভাবজাত, কারণ সেখানে পুবোহিত অপেক্ষা মন্দিরের অধীনেই অধিক ভূসম্পত্তি থাকত।

পাল, প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বে বহু ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানও দেওয়া হয়েছিল। সামন্ত ও রাজকর্মচারীদের তাদেব রাজসেবাব পুরস্কারস্বরূপ গ্রামদান করা হয়েছিল। অবশ্য শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ধর্মীয় অনুদানের অপেক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানেব সংখ্যা ছিল বেশ কম। কিন্তু যখন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ও পুবোহিতদের পুরস্কৃত করবার জন্য ভূমি বা গ্রাম দান কবাব প্রথা প্রচলিত ছিল এবং মুদ্রার অপ্রতুলতা ছিল, তখন বাজসেবার জন্যও আব কি-ই বা দেওয়া যেতে পারত? হয়ত এই সকল ধর্মনিবপেক্ষ অনুদানের সংখ্যা ধর্মীয় অনুদানের সংখ্যার সমান ছিল, হয়ত বা বেশিই ছিল, কিন্তু এই সকল দান অনির্দিষ্টকালের জন্য দেওয়া হত না, অতএব এগুলির দানপত্র তালপাতা ও কাপড়ে লেখা হত এবং কালক্রমে বিনষ্ট হয়ে যেত। তা ছাড়া ধর্মীয় অনুদানগুলি ধর্মনিরপেক্ষ দান অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ধর্মীয় অনুদানগুলি সকল-প্রকার কর থেকে মুক্ত ছিল[৩], কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের দানগ্রহীতাকে কিছু কর বা শুল্ক দিতে হত, প্রথম শ্রেণীর দান চিরকালের জন্য দেওয়া হত, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর দানের ক্ষেত্রে দানগ্রহীতা ততদিনই দান ভোগ করত যতদিন সে রাজার প্রতি তার দায়িত্বপালন করত। এই দুই প্রকার অনুদানের মধ্যে পার্থক্য যাই থাকুক না কেন এ কথা স্পষ্ট যে এই দুইয়ে মিলে রাজা ও প্রকৃত চাষীদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে

১। এ. এস. আলটেকর, দি রাষ্ট্রকুটস এ্যাণ্ড দেয়ার টাইমস, পৃঃ ১০০
২। এ. ই. vii, নং ৬, প ৪৬ ৯
৩। উড়িষ্যায় ধর্মীয় অনুদানভোগীদেরও কিছু কর দিতে হত।

এই সকল দানগ্রহীতারাই গ্রামের মালিকে পরিণত হয়ে এক ভূস্বামী সর্দার শ্রেণীর পত্তন করেছিল এবং ভূমি রাজার হলেও একরকম রাজার অনুমতি নিয়েই রাজার অধিকার ক্রমশ বিলীয়মান হচ্ছিল।

অনুদানপত্রের সর্তের সুযোগে দানগ্রহীতা নিজ চাষের জমির সীমা বাড়িয়ে নিতে পারত, অথবা নতুন জমি নিজ এলাকায় সংযোজিত করতে পারত। অনুদানপত্রে সাধারণতঃ দানে দেওয়া গ্রামের সীমা নির্দিষ্ট করা থাকত না, দানগ্রহীতা সেই সুযোগে গ্রামের সীমা বাড়িয়ে নিতে পারত। কিন্তু রাষ্ট্রকূটদের অনুদানপত্রে সাধারণতঃ গ্রামের সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হত।[১] ফলে দানগ্রহীতা নিজ কৃষিক্ষেত্রের সীমা বাড়িয়ে দিতে পারত না। পালদের কয়েকটি অনুদানপত্রসম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। উত্তরবঙ্গে ধর্মপাল যে চারটি গ্রামদান করেছিলেন সেগুলির সীমা নির্ধারিত ছিল, ফলে চাষযোগ্য জমির সীমা বাড়ান কঠিন ছিল। কিন্তু যেখানে সীমা এইরকম নির্ধারিত ছিল না সেখানে দানগ্রহীতা অর্থবলের সাহায্যে কৃষিজমির সীমা বাড়িয়ে নিতে পারত। পাল ও প্রতীহারদের অধিকাংশ দলিলে গ্রামের চৌহদ্দী নির্ধারিত করা থাকত না। কেবল এইটুকু নির্ধারিত থাকত যে অমুক গ্রামের সীমা গোচারণভূমি বা ঝোপঝাড় পর্যন্ত নির্দিষ্ট থাকল (স্বসীমাতৃণযুতি গোচরপর্যন্তঃ)। ফলে দানগ্রহীতা নিজ জোতজমার সীমা বাড়িয়ে নিতে পারত।

আর একটি কারণে দানগ্রহীতা নিজ জমির সীমা বাড়িয়ে নিতে পারত। প্রতীহার রাজ্যের রাজস্থানের কিছু অঞ্চলে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আলোয়ার অঞ্চলের স্থানীয় প্রতীহার মণ্ডলেশ্বর মথনদেব কর্তৃক জারী করা অনুদানপত্রে অনুদানভোগীকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে যদি কোন ব্যক্তির কন্যার কোনো সন্তান না থাকে (অপুত্রিকাধন)[২] অথবা তার সম্পত্তির কোনো পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকে (নাস্তিভর্তা ?)[৩] তা হলে অনুদানভোগী সেই সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে বেওয়ারিস সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার রাজার হাত থেকে অনুদানভোগীর হাতে চলে গিয়েছিল। অবশ্য এইরূপ অধিকার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত খুব কম।

গ্রামীন সমাজের ভূমিসম্বন্ধীয় অধিকার যেমন হ্রাস পেতে লাগল, জমির

১। এ. ই. xxiii, নং ১২, প ৪২-৫ ; নং ১৩, প ৫৬-৮ ; ই. এ. vi, ৬৮ ; এ. ই. xviii, নং ২৬, প ৬৪-৫

২। এ. ই. iii, নং ৩৬, প ১২, এস্থলে তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে অপুত্রক ব্যক্তি তার পৌত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করতে পারবে।

৩। ঐ, এই শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়।

উপর ব্যক্তিগত মালিকানাও বাড়তে থাকল। গুপ্তকালে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদানের জন্য জমি স্থানীয় সমাজের প্রতি শুধু বাহ্য সম্মানই দেখানো হত। যদিও তাঁরা অধীনস্থ সামন্ত বা কর্মচারীদের সঙ্গে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, সমস্ত গ্রামবাসীদের সম্মতি (মতবস্তু) চাইতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল একটা প্রথামাত্র। গ্রামবাসীরা সম্মতি দেবেই এবং এই সম্মতিদানেব প্রথাপালনের ব্যাপাবে গ্রামবাসীদের কোনো লাভের যথেষ্ট লোকসান হত। গুপ্তকালে একমাত্র বাকাতক অনুদান-পত্রেই খনি, চামড়া ও গোচারণভূমি উপভোগের অধিকার দানগ্রহীতাকে দেওয়া হত এবং তাও পবোক্ষভাবে, কারণ প্রদত্ত গ্রামের খনিজ, চামড়া ও গোচারণভূমি করমুক্ত করে দেওয়া হত।[১] এখন এই সমস্ত অধিকারগুলি প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া হতে থাকল এবং এই প্রথা মধ্যভাবতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, বরং পূর্ব ভারত, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজবাট এবং সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্রেও প্রসারিত হয়ে গেল। পাল[২] ও প্রতীহারদের[৩] রাজ্যে গোচারণভূমি, ফলবান বৃক্ষ, কূপ ও সরোবর, ঝোপঝাড়, জঙ্গল, পতিত জমি, খানাখন্দ, নাবাল জমি প্রায়শঃ জলমগ্ন জমি ইত্যাদি সমস্ত কিছু উপভোগ করার অধিকার দানগ্রহীতাকে দেওয়া হত। গুপ্তোত্তর অনুদানপত্রে গ্রামের আয়ের এই সমস্ত উৎসগুলির উল্লেখের অর্থ এই যে, এ সমস্ত অনুদানভোগীর উপভোগের জন্য প্রদত্ত হত।

• কিন্তু রাষ্ট্রকূটদের রাজ্যে বৃক্ষপংক্তি (সবৃক্ষমালাকুলম্)[৪] ছাড়া গ্রামের আয়েব অন্য কোনো উপায় প্রত্যক্ষভাবে দানগ্রহীতাকে হস্তান্তরিত করা হত না এবং বৃক্ষপংক্তি হস্তান্তরের উল্লেখও পরবর্তী অনুদানপত্রগুলিতেই পাওয়া যায়। পাল ও প্রতীহার দাতাদের ন্যায় রাষ্ট্রকূট দাতা প্রদত্ত গ্রামের অধিবাসীদের সম্মতি প্রার্থনা করতেন না এবং তাদের অনুদানদাতাকে কর দিতে অথবা তার আদেশ-পালন করতেও নির্দেশ দিতেন না। এমন কি হস্তান্তরিত গ্রামের অধিবাসীদের গ্রাম হস্তান্তরের কোনো সূচনা দেওয়ার প্রয়োজনও তাঁরা বোধ করতেন না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে তাঁরা গ্রামবাসীদের অধিকারকে খুব সামান্যই স্বীকৃতি দিতেন। প্রতিহারদের অনুদানপত্রের স্বরূপ থেকে যে অর্থই ধ্বনিত হোক না কেন কোনো সন্দেহ নেই যে পাল ও প্রতীহার দাতা ভূমি-বিষয়ক সমস্ত অধিকার দান-গ্রহীতাকে প্রদান করতেন।

এইরূপ হস্তান্তরের ফলের কোনো প্রভাব গ্রামবাসীদের উপর পড়ত কি?

১। ক. ই. ই. iii, নং ৫৬, প ২৮-৯ ইত্যাদি
২। এ. ই. xix, নং ১ 'বি', প ৪১-২
৩। ঐ iii, নং ৩৬, প ১০-১ , ই. এ. xviii, পৃঃ ৩৪, প ৫-৬
৪। এ. ই. vii, নং ৬, প ৫৩

ভূমি-বিষয়ক ক্ষমতা হস্তান্তরের অধিকার রাজার অবশ্যই ছিল, কিন্তু অনুদানপত্রে তাঁর সেই অধিকারের এমন কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে তিনি স্বয়ং সেই অধিকার প্রয়োগ করতেন। আবার অন্যদিকে গুপ্তকালে ভূমির সমুদায় প্রভুত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা দেখে মনে হয় যে এই অধিকার থেকে গ্রামবাসীদেরই লাভ হত, কারণ তারা গোচারণভূমি, পুষ্করিণী, জঙ্গল ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারত এবং তার জন্য রাজাকে কোনো কর দিতে হত না এবং তারা নিজ নিজ আবাদী জমির সীমাও বাড়িয়ে নিতে পারত। কিন্তু ভূমি-বিষয়ক অধিকারগুলি অনুদান-গ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গেলে, অনুদানগ্রহীতাকে একেবারে কিছুই না দিয়ে গ্রামবাসীরা সমস্ত সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারত না। অনুদানভোগীরা তাদের প্রাপ্ত অধিকারগুলির কি কি সুযোগ গ্রহণ করত এবং কৃষকদের উপরই বা তার কি প্রভাব পড়ত, তার পরিচয় উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত কিছু-কিছু রাজস্ব-সম্বন্ধীয় প্রাচীন প্রথা থেকে জানা যায়। অযোধ্যার কোনো অঞ্চলে, যেখানে প্রচুর মূল্যবান কাঠ পাওয়া যেত, রাজা বহিরাগতদের কাছ থেকে সেই কাঠ কাটার জন্য কুঠার কর আদায় করতেন।[১] এই অঞ্চলেই ভূস্বামীরা কেবল যে কর আদায় করতেন তাই নয় তদুপরি অনাবাদী জমি থেকে উৎপন্ন দ্রব্য যেমন ঘরের চাল ছাওয়ার খড়, ফল, পুকুরের মাছ ইত্যাদি থেকেও বেশ লাভ করত।[২] উনবিংশ শতাব্দীর এই সকল প্রথা থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে আলোচ্য-কালেও অনুদানভোগীরা জঙ্গল, গোচারণভূমি, মৎস্যক্ষেত্র, ফল ইত্যাদির উপর কর আরোপ করত। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে অনুদানভোগী পতিত জমিকে নিজ পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারত এবং এর ফলে ক্রমবর্ধমান পরিবারের ভরণপোষণে বিব্রত গ্রামবাসী নিজ জোতজমা বাড়াতে পারত না। এইভাবে একদিকে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ক্রমবিকাশ এবং তার ফলে অন্যদিকে ভূমির উপর সামূহিক অধিকারের বিলোপ—একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

একদিকে রাজা জনসাধারণের অধিকার অনুদানভোগীকে প্রদান করে ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে উৎসাহিত করছিলেন, আবার অন্যদিকে কখনও কখনও জনসাধারণও নিজেদের সম্পত্তির সংযুক্ত অধিকার মন্দিরকে দান করে দিত। গোয়ালিয়রের অধিবাসীবৃন্দ কর্তৃক স্থানীয় মন্দিরকে কয়েক টুকরা ভূমিদানের ঘটনাটি[৩] জনসাধারণের সম্মিলিত সম্পত্তি কিভাবে সামন্তীয় সম্পত্তিতে

১। বেডেন পাওয়েল, ল্যাণ্ড সিস্টেম অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া i, ১২৮-৯

২। ঐ ii, ১০৫

৩। এ. ই. i, নং ২০, দ্বিতীয় শিলালিপি, প ২-৯

পরিণত হচ্ছিল তার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সকল দানের ক্ষেত্রে ভূমির সঙ্গে সঙ্গে চাষীদেরও হস্তান্তরিত করা হত।[১] সেনাপতি অল্প কর্তৃক নির্মিত নবদুর্গা ও বিষ্ণুমন্দিরকে নাগরিকগণ অনুদান হিসাবে কয়েকটি জমিদান করেছিল[২]—অবশ্যই এই দান করা হয়েছিল ঐ সেনাপতির চাপে পড়ে। আমরা দেখি যে সিয়ডোনী নগরীব দক্ষিণপ্রান্তে জনৈক বণিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীনারায়ণ ভট্টারকের মন্দিরকে সমগ্র নগর ২০০ হাত চওড়া ২২৫ হাত লম্বা জমিদান করেছিল।[৩] এই দানটি অবশ্য কোনো চাপে পড়ে দেওয়া হয় নি—কিন্তু দুটি দৃষ্টান্তেই জনসাধারণের সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল ; এবং এর ফলে ভূসম্পত্তির সামন্তীকরণ হচ্ছিল , কারণ স্পষ্টতঃই দেবতারা বা পুরোহিতগণ নিজেরা জমিচাষ করতে পারতেন না, জমিচাষ করাতে হত অন্যদের দিয়ে।

প্রতীহাররাজ্যের ন্যায় রাষ্ট্রকূটরাজ্যেও স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক সম্পত্তি মন্দিরকে দান করার প্রথা প্রচলিত থাকায়, ভূমির ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হচ্ছিল। প্রথম অমোঘবর্ষের শাসনকালে ৮৬৫ সালে আধুনিক ধারওয়ার জেলাস্থিত এলপুণ্‌সের চল্লিশজন মহাজন জনৈক পণ্ডিতকে ৮৫ মত্তর জমিদান করেছিল।[৪] সৌনদণ্ডিতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে ৫০ জন কৃষক কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে একটি জৈনমন্দিরকে অনুদান দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] ৯৫১-৫২ সালে চতুর্থ কৃষ্ণের সময়ে ধারওয়ার জেলায় সম্ভবতঃ উক্ত ৫০ জন মহাজনের সম্মতিতে যাদের সংরক্ষকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে ১২ মত্তর জমি মঠ ও শিক্ষার প্রয়োজনে দান করা হয়েছিল।[৬] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে কর্ণাটকে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি যাদের মহাজন বলা হত , নিজেদের এজমালী জমির কিছু অংশ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এবং কখনও কখনও শিক্ষার উদ্দেশ্যে দান করত। কিন্তু প্রদত্ত জমির ব্যবস্থাপক সাধারণতঃ সেই জমির উপর নিজ ব্যক্তিগত অধিকারস্থাপন করার চেষ্টা করত।

ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভূমিদানপ্রথা। এই প্রথায় কৃষক জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকত বটে, কিন্তু জমির অধিকার পেত না। পাল, প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বে প্রদত্ত গ্রামের কৃষকগণের অবস্থাও অবশ্য ভিন্নরূপ ছিল না। কৃষকদের অবস্থার অবনতির একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল

১। ঐ, প ৮
২। ঐ, প ৩ ও ৬
৩। ঐ i, নং ২১, প ১-৪
৪। এ. ই. vii, নং ২৮ 'ডি', প ৭ ও ১৬
৫। জ. ব. ব্রা. বা. এ. সো. x, ২০৮, আলটেকরের পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থের ৩৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
৬। ই. এ. xii, পৃঃ ২৫৮, প ১০-২

উপসামন্তীকরণের প্রবৃত্তি। উত্তর বিহারের একটি পাল অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে জনৈক রাজপদাধিকারী নিজ প্রভু তৃতীয় বিগ্রহপালের (১০৫৫ ৭০) অনুমতি নিয়ে নিজ জমির কিছুটা অংশ দান করেছিল। ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানভোগী হওয়ার ফলে সম্ভবতঃ সে রাজার বিনা অনুমতিতে জমিদান করতে পারত না। কিন্তু ধর্মীয় অনুদানভোগীগণ বিশেষ করে বড় বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকগণ, যেমন নালন্দা, নিজেদের জমি অন্যদের দিয়ে চাষ করাত এবং গোমস্তাদের দিয়ে কর আদায় করাত।

প্রতীহাররাজ্যে দানগ্রহীতা শুধু যে উপসামন্ত নিযুক্ত করতে পারত তাই নয় নিজ ভূমির জোতদারদের উৎখাত করতেও পারত। প্রতিহারসাম্রাজ্যে বিশেষ করে রাজস্থান, মালব ও গুজরাটে গ্রহীতা দানলব্ধ ক্ষেত্রে স্বয়ং চাষ করার অথবা অন্যকে দিয়ে করানোর, ঐ জমি স্বয়ং ভোগ বা অন্যকে ভোগ করতে দেবার অধিকাবী ছিল।[১] পূর্বে বলভীর মৈত্রক রাজাদেব অনুদানে এই সর্তগুলি থাকত।[২] বাষ্ট্রকটদের রাজত্বেও এই অধিকারসহ অনুদান দেওয়ার প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। তাৎপর্য এই যে রাজস্থান, গুজরাট, মহাবাষ্ট্রে রাজা এবং তাঁর ধর্মীয় অনুদানভোগীগণ জোতদার-দের জমি থেকে উৎখাত করতে পারতেন। আলটেকর বলেন যে উৎখাতের কোনো উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।[৩] কিন্তু অনুদানের সর্ত থেকে অনুমিত হয় যে অনুদত্ত জমিতে অস্থায়ীভাবে জোতদার নিযুক্ত করা হত এবং দানগ্রহীতা তাদের বরখাস্ত করতে পারত, অন্য কোনো জোতদার নিযুক্ত করতে পারত। যে গ্রাম রাজার খাস দখলে থাকত, সেখানে রাজাও উৎখাতের অধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন বটে, কিন্তু অনুদত্ত জমির সঙ্গে দানগ্রহীতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকার ফলে দানগ্রহীতা এই অধিকার ভালভাবে প্রয়োগ করতে পারত। এই জন্য প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বে জমির উপর কৃষকদের অধিকারে কালসীমা সুরক্ষিত ছিল না। অতএব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির প্রকৃত অধিকারী জমি চাষ-আবাদ করত না। পূর্ব-মধ্যযুগীয় ভারতের ভূমিব্যবস্থার সম্বন্ধে ব্যাসস্মৃতির বর্ণনাকে সঠিক বলে গ্রহণ করলে স্বীকার করতে হবে যে রাজা ও প্রকৃত চাষীদের মধ্যে ভূমির মধ্যস্বত্বভোগীর চারটি শ্রেণী বিরাজমান ছিল।[৪]

শাসকগোষ্ঠীর সকল সদস্যরাও জমির মালিকানার বিষয়ে কোনো বিশেষ

১। ই. এ. ix, নং ১, প্লেট 'এ' প ১৯ ; প্লেট 'বি' প ৫৩
২। ক. ই. ই. ix, নং ২, প ৬ ; নং ১১, প ১৩
৩। আলটেকর, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৩৬-৭
৪। 'ক্ষেত্রগৃহিত্বা যঃ কশ্চিৎঃ চ কারয়েৎ স্বামিনে চ ষড়ভাগোরাকেঃ দণ্ডম্ চ তৎসমম্' ব্যবহারময়ূখ ৮৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত

সুবিধার অধিকারী ছিল বলে মনে হয় না। কালক্রমে গুর্জর কৃষকগণও সামন্তপ্রথার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। সাধারণস্থানীয় কৃষকদের মতো তাদেরও সমস্ত-প্রকার করপ্রদান করতে বাধ্য করা হত। ৯৬০ সালে গুর্জর-প্রতীহারবংশীয় জনৈক সামন্ত রাজা[১] কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে নিজ বংশপোতকভোগ থেকে একটি গ্রাম-দান করেছিল, সেখানে বহুসংখ্যক গুর্জর কৃষক বাস করত। এই অনুদান একজন গুরু ও তার উত্তরাধিকারী শিষ্যদের দান করা হয়েছিল। তাদের গ্রামবাসীদের কাছ থেকে উচিত অনুচিত সর্বপ্রকার কর ছাড়াও আরও ৬টি কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, যেমন ভাগ (উৎপন্ন ফসলের অংশ), খলভিক্ষা (খামার কর), প্রস্থক (পদাধিকারীদের জন্য দেয় কর), স্কন্ধক, মার্গন্নক এবং নাস্তিভর্তা ও অপুত্রিকা-ধন। স্পষ্টত ই প্রতীয়মান হয় যে এই সমস্ত কর গুর্জর কৃষকদের আগের প্রভুও আদায় করতেন, গ্রাম হস্তান্তরের পর নতুন মালিক গুরু এই সকল কর আদায়ের অধিকারী হয়েছিল। এই অনুদান থেকে এটাও বোঝা যায় যে সামন্তগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমপদস্থ অন্যান্য সামন্তদের শোষণ করতে দ্বিধা করত না এবং চাষের জমির সঙ্গে ভূমিচাষীদের হস্তান্তর করতে পারত। আবার দেখা যায় যে দানগ্রহীতা চাষীদের উপর উচিত অনুচিত সর্বপ্রকার কর আরোপ করতে পারত এবং তার ফলে চাষীদের অবস্থা ভূমিদাসে পরিণত হয়ে যেত। এইভাবে শুধু যে একদিকে গুর্জর-প্রতিহার ও বিজিত জাতির মধ্যে সামন্তপ্রথার উদ্ভব হল তাই নয়, অন্যদিকে বিজিত জাতির নিজেদের মধ্যেও সামন্ততান্ত্রিকব্যবস্থার উদ্ভব হল কারণ কালক্রমে বিজেতা জাতি নিজ আত্মীয়স্বজনকে বিজিত সম্পত্তির সমান অধিকারীরূপে স্বীকার না করে তাদের প্রায় ক্রীতদাসে পরিণত হতে বাধ্য করেছিল এবং পূর্ববর্তী গোষ্ঠীনেতাদের লাভের জন্যই এদের পরিশ্রম করতে হত।

রাজস্থানের চাষীদের জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না, কিন্তু তারা স্বেচ্ছায় হস্তান্তরিত জমির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগও করতে পারত না। একদিকে অনুদানভোগীকে এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে সে কৃষকদের উচ্ছেদ করতে পারবে অন্যদিকে হস্তান্তরিত জমি পরিত্যাগ করার কোনো অধিকার কৃষকদের ছিল না। তাদের পক্ষে এই ব্যবস্থা নিতান্তই পরস্পর-বিরোধী, কিন্তু এর ফলে অনুদানভোগীদের স্বার্থসিদ্ধি হত। তারা নিজেদের ইচ্ছানুসারে কৃষকদের উৎখাত করতে বা বহাল রাখতে পারত। ভূতপূর্ব ভরতপুর রাজ্য প্রতিহারসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূর্ত ছিল, অন্তত প্রথম ভোজের সময় ত নিশ্চয়ই। এই

১। শ্রীগুর্জরবাহিত সমস্ত ক্ষেত্র সমেতঞ্চ। ঐ. পৃঃ ১২ সকল অধিবাসীই গুর্জর ছিল কিনা তা স্পষ্ট নয়।

রাজ্যে প্রাপ্ত আনুমানিক ৯০৫-৬'র মধ্যে স্থানীয় দেবতা শিবের নামে দেওয়া হয়েছিল।[১] ষষ্ঠ দলিলটিতে বলা হয়েছে যে উন্তট নামে এক ব্যক্তি নিজ অধীনস্থ গ্রামের তিন 'হল' পরিমাণ জমি দান করেছিল। এই জমি পূর্বে সহল্ল, জজ্জ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা চাষ করত এবং পরে এডুবাক নামক হলচাষীই চাষ করত।[২] এই দলিল থেকে জানা যায় যে কখনও কখনও উচ্চতম বর্ণের লোকদেরও সাধারণ কৃষকদের মত কাজ করতে হত। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে গ্রামের সামন্ত মালিকরাও প্রভুর অনুমতি ছাড়াই নিজ অধীনস্থ জমি হস্তান্তরিত করতে পারত এবং জমির সঙ্গে সঙ্গে যারা লাঙ্গল দিত বা চাষীদেরও হস্তান্তরিত করতে পারত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রতীহারদের অধীনস্থ রাজস্থানে ভূমিদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। আবার সাধারণ সামন্তরাও যখন জমির সঙ্গে সঙ্গে জমিচাষীদেরও হস্তান্তরিত করতে পারত, তখন অনুমান করা যেতে পারে যে এই প্রথা বেশ ব্যাপক ছিল।

কৃষকদের ভূমিদাসে অবনত হওয়ার আর একটি কারণ ছিল বেগারপ্রথার বিস্তার পালদের অনুদানপত্রে 'বিষ্টি' (অর্থাৎ জোর করে শ্রম আদায় প্রথা) শব্দটির প্রয়োগ হয় নি, কিন্তু তারা সর্বপীড়ার ভাগী ছিল এবং ব্রাহ্মণ, মন্দির বা বিহারকে প্রদত্ত গ্রামে রাজা নিজ সর্বপীড়ার অধিকার পরিত্যাগ করতেন।[৩] অবশ্য দানগ্রহীতাগণ গ্রামবাসী চাষীদের উপর সর্বপীড়ার প্রয়োগ করতেন কিনা তা স্পষ্ট জানা যায় না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পূর্ব কাথিয়াবারে প্রতীহার সামন্তদের গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বেগার আদায় করার অধিকার ছিল। এখানে এই প্রথা 'বিষ্টি' নামে অভিহিত হত এবং অনুদানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে বিষ্টির অধিকারও প্রদান করা হত।[৪] এই প্রথা বলভীর মৈত্রকদের রাজ্যেও প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল এবং পরে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট উভয় রাজ্যেই এই প্রথা খুবই প্রচলিত হয়েছিল। 'সোতপদ্যমান বিষ্টিক' (অর্থাৎ বেগারের সাহায্যে উৎপাদিত বস্তু) শব্দের প্রয়োগ সর্বপ্রথম মৈত্রকদের অনুদান পত্রে হয়েছিল এবং এই শব্দসমষ্টি যথাযথভাবে পরে রাষ্ট্রকূটগণ গ্রহণ করেছিল।[৫] প্রকৃতপক্ষে প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের রাজত্বকালে গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে যেরূপ ব্যাপকভাবে বেগারপ্রথা প্রচলিত ছিল তেমন ব্যাপকভাবে এই প্রথার প্রচলন আর কোথাও কোনোকালেই ছিল না। বিস্ময়ের কথা এই যে এই প্রথা সেই সকল অঞ্চলেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল যেখানে দানগ্রহীতাকে দানলব্ধ

১। এ. ই. xxiv, ৩২৯-৩৩
২। 'এডুবক্কোধুনা যত্র বাহয়তেব হালিকঃ।' এ. ই. নং ৪৫, প ১৯-২০
৩। এ. ই. xxix. নং ১ 'বি', প ৪২
৪। ই. এ., xii, পৃঃ ১৯০, প্লেট ১১, প ১-২৪
৫। এ. ই. xviii, নং ২৬, প ৬৬-৭ ; xxii, নং ১৩, প ৫৯

ভূমি অথবা স্বয়ং চাষ করা অথবা অন্যকে দিয়ে চাষ করানোর এবং ভূমি স্বয়ং উপভোগ করা অথবা অন্যকে উপভোগ করতে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, যেখানে মনুষ্যশক্তির অভাব থাকে সেখানেই বেগারপ্রথার সম্ভাবনাও থাকে। কারণ ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে বলপ্রয়োগের দ্বারা বেগার খাটানো সম্ভব হয় না। এ প্রথার প্রচলনের কারণ যাই হোক না কেন এ কথা নিশ্চিত যে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন বিদ্যমান ছিল। তবে রাষ্ট্রকূট অনুদানপত্রে উল্লিখিত নানাবিধ রাজস্বের বিকল্পে এর প্রচলন ছিল, এমন মনে হয় না। সম্ভবতঃ এটি রাজস্বের একটি অতিরিক্ত উপায় ছিল এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'প্রযুক্ত বিষ্টি' শব্দের ভট্টস্বামীকৃত ব্যাখ্যায় প্রতীয়মান হয় যে[১] এই প্রথার সাহায্যে রাজা দুর্গ ইত্যাদির নির্মাণকালে শ্রমিক সংগ্রহ করতেন। অবশ্য এ কথা স্পষ্ট নয়, যে অনুদানগ্রহীতা ইউরোপীয় সামন্তদের ন্যায় বলপূর্বক কৃষকদের দ্বারা নিজ জমিচাষ করাত অথবা শুধু সার্বজনিক কাজেই তাদের বেগার শ্রমের সাহায্য গ্রহণ করত। অতএব অনুদত্ত গ্রামগুলিতে বেগারপ্রথার (উতপদ্যমান বিষ্টি) কি ভাবে প্রয়োগ হত, তা সঠিক বলা কঠিন। তবে এ কথা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রকূটদের অধীনস্থ অনুদানভোগীরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বেগার আদায়েব অধিকার পেত এবং পালদের অধীনে যখন কোনো গ্রামদান করা হত, তখন রাজ্য ঐ গ্রামের উপর নিজ 'সর্বপীড়ার' অধিকার ত্যাগ করতেন। কিন্তু রাজ্য দ্বারা পরিত্যক্ত ঐ অধিকার দানগ্রহীতা প্রয়োগ করতে পারত কিনা তা স্পষ্ট করে বলা হয় নি।

এমন কোনো শিলালিপি পাওয়া যায় নি যার উপর নির্ভর করে আমরা বলতে পারি যে প্রতীহারদের কালে কৃষকদের উপর কোনো চাপ বৃদ্ধি করা হয়েছিল কিনা; কিন্তু গাহরবালদের অধীনস্থ কৃষকদের উপর আরোপিত করের যে দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায় তার থেকে এমন ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায় যে কৃষকদের করভার বৃদ্ধি পেয়েছিল। পালদের অনুদানপত্রে মাত্র কয়েকটি করের উল্লেখ আছে; অন্যান্য কর 'আদি' শব্দটির অন্তর্ভূত।[২] এইভাবে অনুদানগ্রহীতা দানলব্ধ গ্রামের অধিবাসীদের উপর কর আরোপের যথেষ্ট সুযোগ পেত। অনুদানপত্রে গ্রামবাসীদের এই নির্দেশ দেওয়া হত যে তারা অনুদানভোগীকে সর্বপ্রকার কর (সমস্ত প্রত্যায়) দেবে, কিন্তু করের কোন স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় দানগ্রহীতা নতুন নতুন কর সহজেই আরোপ করতে পারত। এই একই প্রণালী ছিল প্রতীহারদের অনুদানপত্রে, কারণ সেখানেও রাজস্বের সর্বপ্রকার মাধ্যম (সর্ব আয়সমেত)

১। জা. বি. ও. রা. সো. xii, ভাগ ১, ১৯৮
২। এ. ই. xxix, নং ৭, প ৪২

হস্তান্তরিত করা হত, কিন্তু সেগুলির নাম উল্লেখ করা হত না। প্রতীহারসাম্রাজ্যের কিছু অংশে (রাজস্থানে) গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দানগ্রহীতাকে উচিত-অনুচিত সর্বপ্রকাব কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।[১] এই অধিকার থাকায় দানগ্রহীতা প্রচলিত কর ছাড়াও নতুন কর আরোপ ও আদায় করতে পারত।

পাল ও প্রতীহারদের অনুদানপত্রের বিপরীত রাষ্ট্রকূটদের অনুদানপত্রে রাজস্বের মাধ্যমগুলির স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার ফলে দানগ্রহীতার পক্ষে প্রচলিত কর ছাড়া নতুন কর আরোপ বা আদায় করার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু স্পষ্ট উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও গ্রামবাসীদের এমন কিছু লাভ হত না; কারণ স্পষ্টত ই তাদের উপর সাত-আটটি কর চাপিয়ে দেওয়া হত। এই করগুলি হল উদরঙ্গ, উপরিকর, ভূতবাত, প্রত্যায়, ধান্য, হিরণ্য, দণ্ডদশাপরাধ এবং তা ছাড়া উপপদ্যমানবিষ্টি ত ছিলই। এই শব্দগুলির সঠিক অর্থ যাই হোক না কেন প্রত্যেকটি শব্দই করের দ্যোতক এবং সব মিলিয়ে এটা স্পষ্ট হয় যে রাষ্ট্রকূটদের অধীনস্থ কৃষকদের মাথায় গুরুভার করের বোঝা চাপান হয়েছিল। গ্রাম অনুদানে দেওয়া হলেও কৃষকরা ঐ সকল করপ্রদানে বাধ্য ছিল। অবশ্য রাষ্ট্রকূটদের অধীনস্থ দানগ্রহীতাদের এবং পাল ও প্রতীহারদেব অধীনস্থ দানগ্রহীতাদেব মত কর আদায়ের ততটা স্বাধীনতা ছিল না।

অনুদানভোগীদের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার ফলে কৃষকদের ভূমি-বিষয়ক প্রচলিত অধিকারগুলি ত গেলই, তা ছাড়া উপসামন্তীকরণ ও উপ-পাট্টাপ্রথার জন্যও তাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। তা ছাড়া উৎখাতের ফলে রায়তী স্বত্বের অনিশ্চিত অবস্থা, বেগার আদায়, অতিরিক্ত কর আরোপ, জমির সঙ্গে বাধ্যতামূলক সম্বন্ধস্থাপন ইত্যাদির ফলে কৃষকদের অবস্থার অবনতি হয়েছিল। কোনো-কোনো অঞ্চলে কৃষকদের জাত থেকে উৎখাত কবা অথবা জমির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে বাধ্য করা, উভয়-প্রকার অধিকারই দানগ্রহীতাকে দেওয়া হয়েছিল। এই দুটি অধিকার পরস্পর বিরোধী বলে মনে হলেও, এই অধিকার দানগ্রহীতার স্বার্থের অনুকূল ছিল, কারণ সে যখন খুশি জমি বেদখল করতে পারত, আবার প্রয়োজন হলে কৃষককে জমিতে বহাল থাকতেও বাধ্য করতে পারত। এই সকল কারণে ইউরোপীয় ভূমিদাসদের অনুরূপ, এখানকার কৃষকরাও আর্থিক দিক থেকে নিতান্তই পরাধীন হয়ে গেল।

অনুদানপত্রগুলিতে কৃষকদের পক্ষে এমন কিছু ছিল না, যাহার সাহায্যে তারা দানগ্রহীতার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগগুলির সমাধান করতে পারে। পাল ও

১। এ. ই. xii, নং ৩৬, প ১২

প্রতীহারদের সকল অনুদানপত্রে গ্রামবাসীদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তারা দানগ্রহীতার প্রতি তাদের কর্তব্যপালন করবে, তাকে সকল-প্রকার করপ্রদান করবে এবং তার আজ্ঞাপালন করবে। অনুদানপত্রে রাজার উত্তরপুরুষদের ও শক্তিশালী ব্যক্তিদের অপ্রাকৃত শক্তির ভয় দেখিয়ে অনুদানপত্রে প্রদত্ত সকল-প্রকার সর্তপালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশপালন করাও হত কারণ আমরা দেখি যে বাজা ভোজ তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রদত্ত দুটি অগ্রহার গ্রাম, যা দানগ্রহীতার হস্তচ্যুত হয়েছিল, পুনরায় দানগ্রহীতাকে দান করেছিলেন। কিন্তু অধীনস্থ গ্রামবাসীদের প্রতি দানগ্রহীতার কোনো কর্তব্যের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। যদি নতুন কর আবোপ কবা হত, বা প্রচলিত করের হার বৃদ্ধি করা হত, তা হলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোন উপায় ছিল না কৃষকদের। অতএব দানগ্রহীতা কোনো দমনমূলক কাজ করলে, কৃষকগণ যে নিতান্তই অসহায় বোধ করত তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তাদের পরাধীনতার মাত্রাও বেড়ে যেত।

ধর্মীয় অথবা ধর্মেতর প্রয়োজনে প্রদত্ত গ্রামগুলি ছাড়া, অন্যান্য গ্রামগুলি থেকে কব আদায় কবত রাজপুরুষেরা। রাজপুরুষেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যয়নির্বাহের জন্য গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নানাপ্রকার কর আদায় করত কিনা তা আমরা জানি না; কিন্তু পালদের সময়ে রাজপরিবারের ব্যয়নির্বাহের জন্য, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে কিছু শুল্ক আদায় করা হত নিশ্চিত। তা ছাড়া নিয়মিত ও অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী এবং আরক্ষীবাহিনী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নিজেদের বেতনের অতিরিক্ত খোরাকীও আদায় কবত। তা নাহলে অনুদত্ত গ্রামে সরকারী ব্যক্তিদের প্রবেশ নিষেধের কোনো মানে হয় না। বাংলা, বিহার ও বুন্দেলখণ্ডে গুপ্তদের কাল থেকেই গ্রামবাসীদের চাট ও ভাটদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হত এবং আলোচ্যকালে চম্বার গ্রাম্য অধিবাসীদেরও এই ভার বহন করতে হত। প্রাক্‌গুপ্তকালে এই প্রথা ছিল কিনা তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু চম্বা শিলালিপি (৯৭৫) থেকে জানা যায় যে দেশের অন্যান্য স্থানেও যে গ্রাম রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল সেগুলিকে সরকারী আমলাদের আহার, বাসস্থান, পরিবহন, ইত্যাদির জন্য প্রচুর ব্যয় করতে হত। চম্বা শিলালিপি থেকে জানা যায় যে চাট ও ভাটরা কৃষকদের বাড়িতে প্রবেশ করে তাদের কাছ থেকে কাঁচা-পাকা ফসল, আখ, লবণ এবং গো-দুগ্ধের একাংশ জোর করে আদায় করত। তা ছাড়া তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য কৃষকদের আসবাব কাষ্ঠাদি, ইন্ধন, ঘাস, ভুসি ইত্যাদি দখল করে নিতে পারত।[১]

১। আর. স. রি. ১৯০২-৩, পৃঃ ২৫২-৩, প ২১-৪

দেশের অন্যান্য স্থানেও তারা অনুরূপ ব্যবহার করত কিনা, তা বিশ্বাস করার কোনো সঙ্গত কারন নেই।

পাল ও প্রতীহারদের রাজ্যের অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সামন্তীকরণ লক্ষিত হয়। ধর্মপালের অধীনস্থ চারিটি গ্রামের সংযুক্ত হাটটি জনৈক ব্যক্তিকে দান দেওয়া হয়েছিল।[১] স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে হাটের ব্যবসায়ীরা রাজ্যের কাছ থেকে যেসকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত, দানগ্রহীতা ততটা সুযোগ-সুবিধা তাদের দিত না। পালদের আমলে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল ৩৪ জন অশ্ববিক্রেতা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পেহোয়াতে সমবেত হয়েছিল এবং প্রতিটি অশ্বাদি পশু বিক্রয়ের উপর ৬টি মন্দিরকে দুই 'দ্রম্ম' দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।[২] এই অশ্ববিক্রেতারা মন্দিরকে প্রদত্ত অর্থের অতিরিক্ত রাজাকেও কোনো কর দিয়েছিল কিনা তা অবশ্য স্পষ্ট জানা যায় না। সম্ভবতঃ রাজকীয় প্রভাবে আমদানীশুল্ক আদায়ের ভার মন্দিরকে দেওয়া হয়েছিল। সিয়ডোনীর শাসক উন্দভট বহিরাগত বস্তুর উপর আরোপিত আমদানীশুল্কের একটা নির্দিষ্ট অংশ বিষ্ণুমন্দিরকে দান করেছিলেন।[৩] আবার ঐ একই বিষ্ণুমন্দিরকে স্থানীয় বণিকগণ ৬টি দোকানের সম্পূর্ণ আয় হস্তান্তর করেছিল।[৪] রাজস্থানে লচ্ছুকেশ্বর মন্দিবকে প্রদত্ত একটি ভূমি অনুদানপত্রে বিক্রির জন্য বাজারে আনা প্রতি বস্তা শস্যের জন্য তিন 'বিংশোপক' এবং বাজারের দোকানপ্রতি মাসিক দুই 'বিংশোপক' শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল।[৫] রাষ্ট্রকূটদের সাম্রাজ্যে শিল্পীদের কাছ থেকে আদায়ী শুল্ক অনুদানে দেওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থানীয় শিল্পীসংঘ কর্তৃক তাদের আয় ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দান করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৭৯৩ সালে লক্ষ্মেশ্বরের তন্তুবায় সমাজের প্রধান তাদের উৎপাদিত বস্তুর একটি নির্দিষ্ট আনুপাতিক অংশ ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।[৬] ৮৮০ সালে অনুরূপ একটি দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে ৩৬০টি নগরের কর্মিসংঘের চারজন প্রধান অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।[৭] পাল ও প্রতীহার রাজাদের ন্যায় অন্যান্য রাজারাও সম্ভবতঃ অনুরূপ দান দিতেন। নিজের সামন্ত বা রাজপদাধিকারীদের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে, রাজা কখনও কখনও চুঙ্গী ও

১। এ. ই. iv, নং ৩৪, প ৫১-৩
২। আর. স. রি. ১৯০২-৩, পৃ: ২৫২-৩, প ২১-৪
৩। এ. ই. iv, নং ৩৪, প ৫২-৩
৪। ঐ, প ১৩-৩৪
৫। ঐ iii, নং ৩৬, প ২২-৩
৬। ঐ vi, নং ১৬, প ১-১২
৭। জা. ব. ব. র. এ. সো. x, ১৯২, পূর্বে উদ্ধৃত

আমদানীশুল্কের আয় তাদের দান করতেন কিনা, তা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু পারলৌকিক লাভের আশায় এই আয় যে মন্দিরকে হস্তান্তরিত করা হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আদায়ীকৃত আয় অনুদানরূপে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত করার নতুন প্রথাটি এই সময়ে প্রচলিত হয়েছিল। মৌর্যোত্তর ও গুপ্ত কালে বণিক-সংঘের নিকট নগদ অর্থ জমা রাখা হত এবং তার সুদ থেকে ধর্মীয় প্রয়োজন মিটত। ফলে দানকৃত অর্থের ব্যবস্থাপনার উপর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকত না। এই প্রথা প্রতীহারদের সময়েও প্রচলিত ছিল; তবে বণিকসংঘের নিকট অর্থ না রেখে, সংঘপ্রধানের নিকট রাখা হত। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে এই সময়ে জিনিসপত্র ও বাজারের উপর আরোপিত কর মন্দিরকে হস্তান্তরিত করার প্রথা সুরু হয়েছিল। এইভাবে বণিক ও শিল্পীসম্প্রদায়ের আয়ের উপর মন্দিরের একটা নিয়ন্ত্রণক্ষমতার উদ্ভব হল, যা সে নিজ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারত।

স্থানীয়ভাবে স্থানীয় প্রয়োজনের পরিপূর্তিই সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থার ভিত্তি নিল, ফলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন হত না। পাল ও প্রতীহারদের আমলে গ্রামগুলির এই অবস্থাই ছিল। জাতকে শিল্পীদের গ্রামের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু পালদের আমলের গ্রামবাসিন্দাদের সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি, তার থেকে দেখি যে শুধু চাষীরাই নয়, বরং গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থেকে নিয়ে মেদ, অন্ধ্র, চণ্ডাল, সকল শ্রেণীর লোকই ছিল।[১] একটি দানপত্র থেকে জানা যায় যে আলোয়ারের নিকবর্তী একটি গ্রামে শিল্পী, চাষী ও বণিক—সকল শ্রেণীর লোকেরই বসতি ছিল।[২] পাল ও প্রতীহারদের আমলের শুল্কের যে তালিকা পাওয়া যায়, তার থেকে প্রতীয়মান হয় যে সকল-প্রকার কর যে চাষীদের কাছ থেকেই আদায় করা হত তা নয়। সম্ভবতঃ কর ও হিরণ্য শুধু বণিকরাই দিত। এইভাবে গ্রামের আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য গ্রামের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন করতে পারে এমন সকল শ্রেণীর ব্যক্তিরই আবশ্যকতা ছিল। এমন কি অনুন্নত এবং উপজাতীয় ব্যক্তিদেরও গ্রাম্য অর্থনীতিতে আবশ্যকতা ছিল। পালদের আমলে চণ্ডালেরা সম্ভবতঃ চামড়া আহরণ করত এবং গ্রামবাসীদের জন্য জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত করত। মেদ ও অন্ধ্ররা সম্ভবতঃ কিষাণের কাজ করত।

বিহার ও মঠের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর্থিক অঞ্চল কিছু বৃহৎ আকারে ছিল। নালন্দা

১। জাতকে উল্লিখিত শিল্পীদের গ্রাম এবং অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত যোদ্ধাদের গ্রাম।
২। এ. ই. iii, নং ৩৮, প ৫-৬, ২২-৩

অনুদানপত্র অনুসারে দেবপাল ভিক্ষুদের পূজার সামগ্রী পরবার ও বিছাইবার জন্য বস্ত্রাদি, অন্ন ও ঔষধ সংগ্রহ ও বিহার মেরামতের জন্য পাঁচটি গ্রামদান করেছিলেন।[১] এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে সবগুলিরই ব্যবস্থা গ্রাম থেকে আদায় করা নগদ অর্থের দ্বারা সামাধা হত। সম্ভবতঃ কোনো গ্রাম ফসল, কোনো গ্রাম বস্ত্র, এবং কোনো-কোনো গ্রাম মন্দির মেরামতের জন্য শ্রমিক দান করত। অথবা এমনও হতে পারে যে সব গ্রামই এই সমস্তের কিছু-কিছু অংশ দান করত। খুঁটিনাটি ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, বিহার ও মঠকে বিভিন্ন প্রকার সেবা করে তাদের আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থাকে সঞ্জীবিত রাখতে গ্রামগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

রাজস্থানের প্রতীহারদের অধীনস্থ কোনো-কোনো মন্দির স্বনির্ভরতা অর্জন করবার জন্য ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত নিজ জমিগুলিকে সংহত করেছিল[২] এবং এমন ব্যবস্থা করেছিল যাতে শিল্পীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের সরবরাহ নিয়মিতভাবে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে তেলীরা স্বেচ্ছায় খনিপ্রতি নিশ্চিত মাত্রায় তেল মন্দিরকে দান করত।[৩] যারা স্বেচ্ছায় না দিত মন্দিরের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য তাদেরকে দান করতে বাধ্য করা হত। প্রতীহার শাসক মথনদেব রাজস্থানের লচ্ছুকেশ্বর মন্দিরের জন্য তেল ও ঘিযের ঘড়াপ্রতি তিন পালিকা শুল্ক আরোপ করেছিলেন এবং প্রত্যেক চোল্লিককে পঞ্চাশটি করে পত্র প্রদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৪] এ কথা স্পষ্ট যে এই সকল বস্তুর জন্য ব্যয় করার মত নগদ অর্থ দাতা বা গ্রহীতা কারো কাছেই ছিল না। এই কারণে শিল্পী ও কারিগরদের তাদের প্রস্তুত বস্তুর একাংশ মন্দিরকে প্রদান করতে হত।

কোনো-কোনো নগরও আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর ছিল। কারণ তাদের অধীনে যে চাষের জমি ছিল, তা থেকে তারা অন্নাদি আহার্য সংগ্রহ করতে পারত। এইরূপ নগরের অধিবাসী শিল্পীদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা ছিল না। প্রতীহারদের রাজত্বে তেলী তাম্বুলী, কল্পপাল (মদ চোলাইকারী) ও মালাকারদের প্রধানরা অনুদান দিত; আবার কখনও কখনও তারা নিজ সংঘের পক্ষ থেকে গচ্ছিত অর্থও গ্রহণ করত।[৫] পূর্ববর্তী শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এই প্রকার গচ্ছিত অর্থ শিল্পীসংঘের নিকট রাখা হত, কিন্তু প্রতীহার শিলালিপি থেকে জানা যায় যে সংঘপ্রধানের নিকটই রাখা হত। রাজপদাধিকারীদের পরামর্শ

১। ঐ xxiii, নং ৪৭, প ৩৯-৪০
২। ঐ xiv, পৃঃ ১৭৭
৩। ঐ i, নং ২১, প ২৭-৮, ৩০-১
৪। ঐ iii, নং ৩৬, প ২২-৩
৫। ঐ, নং ২০, দ্বিতীয় শিলালিপি প ১১-২০

অনুসারে সংঘপ্রধান নিজ সমাজের শিল্পীদের উপর কর আরোপ করতে পারত এবং তাদের পক্ষ থেকে আদান-প্রদানও করতে পারত। বক্তব্য এই যে নগরস্থ শিল্পীগণ নিজ ইচ্ছানুসারে ব্যবসা করতে পারত না। যেমন চাষীদের চলতে হত নিজেদের মালিকেব ইচ্ছানুসারে তেমনি শিল্পীদেরও চলতে হত নিজ নিজ প্রধানের ইচ্ছানুসারে। এমন কি শিল্পীরা নিজ ইচ্ছামত বসবাসের পরিবর্তনও করতে পারত না। এইগুলি সীমাবদ্ধ নাগরিক অর্থব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল।

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার মাপ আর ওজনের ব্যবহার থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে বিশেষ করে প্রতীহারসাম্রাজ্যে স্থানীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল। সিয়ডোনীতে শিলালিপিতে এই প্রকার মাপ ও ওজনের কিছু উল্লেখ আছে। মনে হয় মণি, তালি ও তুলা এইগুলি স্থানীয় ওজনের পরিমাপ ছিল।[১] গোয়ালিয়র অঞ্চলে জমি মাপার জন্য তাদের নিজস্ব পরিমাপক ছিল।[২] এই স্থানীয় পরিমাপগুলি রাজাব (পরমেশ্বরীয়) হাতের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ অনুসারে নির্ধারিত হত।[৩] গুপ্ত ও সেনদেব আমলে পূর্ব ভারতে প্রচলিত পরিমাপ পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদেব কিছু জানা আছে। পালদের আমলেও ঐ একই পদ্ধতি প্রচলিত হওয়া সম্ভব হয় নি। ফলে রাষ্ট্রব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যও ব্যাহত হয়েছিল।

এইকালে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা যে খুব ভাল ছিল না তার পরিচয় মুদ্রা ব্যবহারের হ্রাস হওয়া থেকেই পাওয়া যায়। একমাত্র যে অনুদানপত্রে দ্রম্ম মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হল ধর্মপালের শিলালিপি, তাতে উল্লেখ আছে গয়ায় ৩০০০ দ্রম্ম ব্যয় করে ৮০:টি জলাশয় নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো মুদ্রা সম্বন্ধেই আমবা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না যে অমুক মুদ্রাটি অমুক পালরাজার। আধুনিক কালে ভাগলপুরের নিকটবর্তী কহলগাঁও নামক স্থানে পুরনো জায়গায় খনন করে কিছু কড়ি পাওয়া গেলেও কোনো মুদ্রা পাওয়া যায় নি। প্রায় চাব শতাব্দী ধরে পাল-সাম্রাজ্য অব্যাহত থাকলেও তাদের সাম্রাজ্য ক্ষেত্রে[৪] কোনো মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নি। এর কোনো কারণ নির্দেশ করা কঠিন। কিন্তু আমরা যদি তৎকালীন পূর্ব ভারতে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তা হলে পালসাম্রাজ্যের মুদ্রা না পাওয়ায় বিস্ময়েব কোনো কারণ ঘটবে না।

১। বি. এন. পুরী, দি হিস্ট্রী অফ দি গুর্জর-প্রতীহারস, পৃঃ ১৩৬-৭
২। এ. ই. i, নং ২০, প ৮-৯
৩। ঐ, প ৪
৪। হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল i, পৃঃ ৬৬৮, এইকালে আসামে স্বর্ণমুদ্রার বহুল ব্যবহার ছিল বলে মনে করা হয়, কিন্তু কেবলমাত্র শিলালিপির সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিতভাবে খুব বেশি কিছু বলা কঠিন।

প্রতীহার শিলালিপিতে বহুপ্রকার মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন দ্রম্ম, পাদ, বিংশোপক, রূপক, পণ, কাকীনী, কপর্দক ইত্যাদি।[১] এদের মধ্যে শেষটির অর্থ কড়ি যার ব্যবহার কোনো বড়ো কেনাবেচায় সম্ভব ছিল না। সুলেমানের মতে রুহমী দেশে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেও এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল।[২] দ্রম্মের ব্যবহারই প্রতীহারসাম্রাজ্যে স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার পরিবর্তনে সহায়তা করেছিল। মনে হয় ৭ম শতাব্দী থেকেই রাজস্থানে দ্রম্ম প্রচলিত ছিল। মারওয়াড়ে প্রাপ্ত ৬০৮ সালের একটি শিলালিপিতে দ্রম্মের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু ৯ম শতাব্দীর পূর্বে প্রতীহারসাম্রাজ্যে দ্রম্মের প্রচলনের কোনো পরিচয় আমরা পাই না। রৌপ্যনির্মিত ও আদিবরাহ অঙ্কিত দ্রম্ম রাজা মিহিরভোজের (৮৩৬-৮৮৫) প্রচারিত বলে জানা যায় এবং নিম্নমানের ধাতুনির্মিত দ্রম্মসম্বন্ধে বলা হয় যে সেগুলি মিহিরভোজের পরবর্তী দু-জন উত্তরাধিকারী মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯০০) ও দ্বিতীয় ভোজের (৯০০-৯১৪) দ্বারা প্রচারিত। কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। সম্প্রতি মিহিরভোজের পৌত্র বিনায়কপালের (৯১৪-৯৪৩) কিছু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।[৪] সেগুলিকে পরে ঠক্কুর ফেরুকৃত[৫] 'দ্রব্যপরীক্ষা' গ্রন্থে প্রথম ভোজ প্রবর্তিত বরাহমুদ্রার অনুরূপভাবে বিনায়কমুদ্রারূপে অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে এই দুটি মুদ্রা বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু অদ্যাবধি প্রাপ্ত দ্রম্মমুদ্রার সংখ্যা খুব কম। এইভাবে সাহিত্য ও শিলালিপির সূত্র থেকে জানা যায় যে ৯ম শতাব্দীর পূর্বে দ্রম্ম খুব বেশি প্রচলিত ছিল না। ১০ম শতাব্দী থেকেই এর প্রচলন বৃদ্ধি পায় এবং তাও সিয়ডোনী ও অন্যান্য কয়েকটি নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ৯ম শতাব্দীর পরবর্তীকালের যে দ্রম্ম পাওয়া গিয়েছে সেগুলির সংখ্যা খুব বেশি নয়। লখনৌ মিউজিয়ামে ২০০টি আদিবরাহ ও বিগ্রহপাল মুদ্রা রক্ষিত আছে। রূপা ও তামার প্রায় ২০টি আদিবরাহ মুদ্রা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে আছে এবং কিছু বরোদা মিউজিয়ামেও আছে।[৬] মৌর্যোত্তরকালের এবং গুপ্তরাজ্যকালের বহুসংখ্যক মুদ্রার সঙ্গে তুলনায় এই স্বল্পসংখ্যক মুদ্রা নিতান্তই নগণ্য। যাই হোক

১। পুরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৩৪-৬

২। ঐ, পৃঃ ১৩৬

৩। আনুমানিক ৮ম শতাব্দীতে রচিত নারদস্মৃতির ভাষ্যে অসহায় বলেন একলক্ষ দ্রম্মের উল্লেখ করেছেন (জা. নি. সো. ই. xvii, ৬৬)। বক্সলী পাণ্ডুলিপিতে দ্রম্মের উল্লেখ সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন।

৪। জা. নি. সো. ই. x, ২৮-৩০

৫। ঐ, ২৯

৬। ঐ, পৃঃ ১৫৩

তাদের সংখ্যা এত বিপুল ছিল না যার দ্বারা তারা ক্ষেত্রীয় সীমাবদ্ধ অর্থব্যবস্থার প্রাচীন ভেদ করতে পারেন।[১]

এ কথা বলা হয়েছে যে-কোনো মুদ্রাকেই নিশ্চিতরূপে পালযুগের মুদ্রারূপে চিহ্নিত করা যায় না এবং যেগুলিকে প্রতীহারযুগের মুদ্রা বলে থাকি সেগুলোও সংখ্যায় খুব কম। অতএব এই যুগের যেসকল মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে এবং সমকালীন শিলালিপিতে যেগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি সম্ভবতঃ সেই সকল স্থানীয় সংস্থা ও বণিকসমাজ দ্বারা জারী করা মুদ্রা যার অধিকার তারা পেয়েছিল নিজ নিজ শাসকের কাছ থেকে। গধইয়া পয়সা সম্পর্কেও এই একই অনুমান করা যেতে পারে। এই পয়সা সম্ভবত. রাজস্থানে সর্বপ্রথম ১০ম শতাব্দী থেকে প্রচলিত হয়েছিল এবং ১১শ ও ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ১০ম শতাব্দীর সিয়ডোনী শিলালিপিতে যে পঞ্চীয়ক দ্রম্মের উল্লেখ আছে সেগুলি ভাণ্ডারকারের মতে স্থানীয় পঞ্চায়েৎ কর্তৃক ঢালাই করা মুদ্রা।[২] পূর্ববর্তী কিছু দ্রম্মে যে স্থানীয় নাম অঙ্কিত থাকত তা পরবর্তীকালের 'ভিল্লমান' বা 'শ্রীমালীয়' দ্রম্ম থেকে অনুমান করা যেতে পাবে।[৩] কোনো সন্দেহ নেই যে স্থানীয় সংস্থা, নগর বা বণিকসম্প্রদায় কর্তৃক জাবী করা মুদ্রা কেন্দ্রীয় শক্তিব ক্রমহ্রাস এবং স্থানীয় অর্থব্যবস্থার অস্তিত্বের সাক্ষ্যপ্রদান করে।

শিলালিপিতে দোকান ক্রয়ের উল্লেখ থেকেই মুদ্রাব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজস্থানে ৮৬৪ থেকে ৯০৪ পর্যন্ত যে আটটি শিলালিপি পাওয়া যায় সেগুলিতে মন্দিরেব ব্যবস্থাপকগণ দ্বারা নগদ মূল্যে দোকান ক্রয়ের উল্লেখ আছে।[৪] কিন্তু এই সময়ে প্রচলিত কোনো মুদ্রাসম্বন্ধে আমরা একটা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না যে এগুলি পাল, প্রতীহার অথবা রাষ্ট্রকূট রাজার দ্বারা জারী করা হয়েছিল! অন্যান্য ছোট ছোট রাজাদের তো বাদই দেওয়া গেল। এইরূপ ব্যাপার ইন্দো-গ্রীক, কুষাণ, সাতবাহন, ক্ষত্রপ এবং সর্বোপরি গুপ্তদের কাল সম্পর্কে চিন্তা করা যায় না। যাই হোক প্রাপ্ত মুদ্রা এবং প্রতীহার শিলালিপিতে তাদের উল্লেখ থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রতীহারদের অর্থব্যবস্থা পালদের অনুরূপ ছিল না। কিন্তু অন্য বিষয় থেকেও আর্থিক আদান-প্রদানের সংকেত পাওয়া যায়। প্রতীহারসাম্রাজ্যে কমপক্ষে দুটি স্থানে অন্তত, ব্যবসায়ীগণ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে একত্র হত ; অশ্ববিক্রেতাগণ পেহোয়াতে একত্র হত এবং সাধারণ ব্যবসায়ীগণ আহারে। তা ছাড়া কিছু ব্যবসায়ী

১। বর্তমান আলোচনায় কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। মনে হয় সেখানে মুদ্রা বহুল প্রচলিত ছিল।

২। জা. নি. সো. ই. xvii, ৭০-১। এখন এটিকে ১/৪ দ্রম্ম ধরা হয়।

৩। ঐ, ৭৪-৫

৪। এ. ই. xix, নং ৭, পৃঃ ৫২-৮

স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে ব্যবসা করত। ব্যবসায়ীদের এই গতিশীলতা প্রতীহারদের অধীনস্থ সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে নিশ্চিতরূপে দুর্বল করেছিল।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে যদিও রাষ্ট্রকূটগণ ২০০ বছরেরও অধিককাল রাজত্ব করেছিল যদিও তাদের রাজ্যসীমা সমুদ্রতট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং যদিও তাদের ভূমি অনুদানপত্রগুলিতে বার বার হিরণ্য শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, তবু আজ পর্যন্ত তাদের একটিও মুদ্রা পাওয়া যায় নি। আলটেকর এই ব্যাপারটিকে বিস্ময়কর বলে মনে করেন।[১] কিন্তু পালদেরসম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য করা চলে। যদিও তারা প্রায় ৪০০ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল, তবুও কোনো মুদ্রাকে নিশ্চিতরূপে পালযুগের মুদ্রারূপে চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু আলটেকর যখন বলেন যে গঙ্গ ও চোল রাজ্যের মত রাষ্ট্রকূটসাম্রাজ্যেও ভূমিকর বস্তুর দ্বারা দেওয়া হত, তখন রাষ্ট্রকূট মুদ্রার অভাবের কারণ স্বয়ংই ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন।[২] অবশ্য চতুর্থ গোবিন্দের ক্যাম্বেপত্রকে রাজস্বস্বরূপ ৭ লক্ষ স্বণপ্রদানকারী[৩] ১৪০০ গ্রামদান (৬০০ অগ্রহার ও ৮০০ গ্রাম) করার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু অনুমিত হয় যে বস্তুব মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজস্বকেই এখানে মুদ্রার মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র; সম্ভবত, কর নির্ধারিত হত মুদ্রায় এবং আদায় করা হত দ্রব্যে। মধ্যকালীন স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুদ্রার অভাব কিছু আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় না।

পাল ও প্রতীহারদের সাম্রাজ্যে ব্যবসায়ীদের দ্বারা যেসকল বস্তুর কারবারের উল্লেখ করা হয়েছে, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সেগুলির কোনো সম্পর্ক ছিল না। পান ঘোড়া ইত্যাদির ব্যবসায়ের সঙ্গে গ্রাম্য অর্থনৈতিক জীবনের নিশ্চয়ই কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। গ্রামীন অধিবাসীদের একটিমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবসার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল লবণ। সিয়ডোনী শিলালিপি থেকে এই ধারণা জন্মে যে প্রতীহারসাম্রাজ্যে ব্যবসায়ীদের মধ্যে লবণ ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব বেশী ছিল। এটিতে সাতজন লবণ বণিকের উল্লেখ আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মন্দির স্থাপন করেছিল এবং কেউ কেউ মন্দিরকে অনুদান দিয়েছিল। যদি তৎকালীন অর্থব্যবস্থা স্বনির্ভর না হত তা হলে শস্য ও বস্তুর ব্যবসায়ীদেরই গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী হত। এমন কি নগরের অধিবাসীদের মধ্যেও অনেকের নিকটবর্তী গ্রামে জমিজমা থাকত এবং তারা সেই জমিতে উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভর করত।

১। দি রাষ্ট্রকূটস এ্যাণ্ড দেয়ার টাইমস, পৃঃ ৩৬৪
২। ঐ, পৃঃ ২২৭, তুঃ পৃঃ ১৪০
৩। এ. ই. vii, নং ৬, প ৪৭-৯

সিয়ডোনী[১] ও গোয়ালিয়রের[২] ব্যবসায়ী অধিবাসীদের পক্ষেও এ কথা সত্য বলে মনে হয়। অন্যান্য ব্যবসায়ী অপেক্ষা লবণ ব্যবসায়ীর গুরুত্ব অধিক থাকাটাই প্রতীহারসাম্রাজ্যে গ্রামীন স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থার অস্তিত্বের সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। প্রতীহার শিলালিপিতে অন্য যে ব্যবসায়ীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল তৈলিক বা তৈল ব্যবসায়ী। কিন্তু এটির গুরুত্বও স্বনিভর অর্থব্যবস্থারই পরিচায়ক। সম্ভবতঃ সকল গ্রাম নিজ রান্না ও আলোর প্রয়োজন অনুযায়ী তৈল উৎপাদন করতে পারত না এবং তেলীরা সেই অভাব পূরণ করত।

সংক্ষেপে পূর্ব-মধ্যকালীন অর্থব্যবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম—ভূমির উপর রাজকীয় ও সামূহিক অধিকারের ক্রমহ্রাসমানতা, এবং ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ। দ্বিতীয়—উপসামন্তীকরণ, জমি থেকে উৎখাত, নতুন নতুন কর আরোপ ও বেগারপ্রথার জন্য কৃষকদের অবস্থাব ক্রমাবনতি। তৃতীয়—ব্যবসায় ও শিল্প থেকে কিছু আয়ের জায়গীরে পরিণতি। চতুর্থ—স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থা, মুদ্রার অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহার, ব্যবসায়ের অবনতি ইত্যাদি যার অস্তিত্বের প্রমাণ। এই সমস্তই পাল, রাষ্ট্রকূট ও প্রতীহার সাম্রাজ্যের প্রচলিত অর্থব্যবস্থাব বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে ভূম্যধিকারী মধ্যবর্তী শ্রেণীর অস্তিত্বও পূর্ব থেকেই লক্ষিত হয়ে আসছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে আলোচ্য সময়ে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল। অনুরূপভাবে কৃষকগণও পূর্বাবধিই নানাপ্রকার কর ও বিধিনিষেধ আরোপের ফলে হীনাবস্থায় উপনীত হয়েছিল। তবে পার্থক্য এই যে রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্রে ইজারাদারী, বেদখলী ও বেগার খাটানোর প্রথা আরও ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু গ্রামীণ সাধারণের ভূমি-বিষয়ক ও সার্বজনিক অধিকারগুলির হ্রাস ও তাব পরিণামস্বরূপ ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশ, শিল্প ও ব্যবসায়ের সামন্তীকরণ, মুদ্রার অভাব, এইগুলি এইকালের অর্থব্যবস্থার নতুন বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে কয়েকটিকে, বিশেষ করে ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশকে ভাল করে বুঝবার জন্য পূর্ব-মধ্যকালীন অনুদানগুলির আইনগত দিকগুলির অধ্যয়ন আবশ্যক।

১। এ. ই. i, নং ২১, প ৩-৪
২। ঐ. নং ২০, দ্বিতীয় শিলালিপি ১৩

৪

পূর্ব-মধ্যকালে ভূমি-বিষয়ক অধিকার

(প্রায় ৫০০—১২০০ খ্রীঃ)

প্রাচীন ভারতের ভূমি-বিষয়ক অধিকারগুলির প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তা-বাদী ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল। ইংরেজের প্রবর্তিত ভূমি-বিষয়ক আইনগুলির সমর্থনের জন্য কয়েকজন প্রশাসক ঐতিহাসিক মতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে প্রাচীন ভারতে সমস্ত ভূমিই রাজার সম্পত্তি ছিল।[১] তা ছাড়া বুহ্‌লর[২] হপকিন্‌স, ম্যাকডানল, কীথ ও ভিনসেণ্ট স্মিথের[৩] ন্যায় প্রাচ্য-বিশারদগণ এই সিদ্ধান্তের সমর্থন কবেছেন। ১৯০৪-এ ভিনসেণ্ট স্মিথ নিজ বিখ্যাত পাঠ্যপুস্তকে লিখেছেন 'ভারতের দেশীয় আইনে চাষের জমিকে রাজার সম্পত্তিরূপে গণ্য করা হয়েছে'।[৪] এই একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে দুইজন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক পি. এন. ব্যানার্জী ও কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল[৫] এই দুইজনের মধ্যে। এরা সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মত খণ্ডন কবে প্রাচীন ভারতে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন।[৬] উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইংবেজ শাসকগণ বড় বড় জমিদারী হরণ করতে থাকল তখন এইরূপ মতবাদের দ্বারাই তাব প্রতিরোধ কবা সম্ভব ছিল। জয়সওয়ালের জাতীয়তাবাদী সিদ্ধান্তগুলিব বিরোধিতা করেছেন ঘোষাল; কিন্তু নিজ মতবাদের সমর্থনে জয়সওয়াল যেসকল উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঘোষাল সেগুলির ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন নি।[৭] সম্প্রতি অন্যান্য পণ্ডিতগণও এ বিষয়েও আলোচনা[৮] করেছেন কিন্তু তাঁদের আলোচনা নিতান্তই নীতিগত। যদিও

১। কানের মতে ভূমির উপর রাজ্যের প্রভুত্বের সিদ্ধান্ত ইংরাজ সরকারের স্বার্থের পক্ষে সুবিধাজনক ও লাভজনক ছিল; অতএব তারা ভূমি-বিষয়ক নীতি ও আইন সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিল। হি. ধ. সা. II, ৮৬৬

২। স্যা. বু. ই. XXV, ২৫৯-৬০, মনুস্মৃতির টীকা ৮, ৩৯

৩। আর্লি হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া (অক্সফোর্ড ১৯০৪) পৃঃ ১২৩; অক্সফোর্ড হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া (অক্সফোর্ড ১৯০৪) পৃঃ ৯০

৪। আর্লি হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া (অক্সফোর্ড ১৯০৪) পৃঃ ১২৩

৫। পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৭৯

৬। হিন্দু পোলিটী, ২য় সং, পৃঃ ৩৪৩-৫১

৭। দি বিগিনিং অফ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রীওগ্রাফি এ্যাণ্ড আদার এসেজ, প্রবন্ধ সংখ্যা ৬, পৃঃ ১৫৮-৬৬

৮। এস. কে. মাইতি, ইকনমিক লাইফ অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া ইন গুপ্ত পিরিয়ড, পৃঃ ১১-২৩; গোপাল, জা. ই. সো. হি. ও. iv, ২৪৬-৬৩

এই সমস্ত আলোচনার ফলে ভূমিসম্বন্ধীয় অধিকারের আইনসূত্রগুলি ও সাহিত্য সম্বন্ধে জানতে পারা গিয়েছে, কিন্তু সেই যুগের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির বিচার কিংবা কালক্রমিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করা হয় নি। এ কথা বিচার করে দেখা হয় নি যে ভূমি-বিষয়ক অধিকারের কালে কালে কেন পরিবর্তন হয়েছে। এই বিষয়ে প্রাচীনকাল ও মধ্যকালের (আমাদের মতে যার আরম্ভ গুপ্তকালের সমাপ্তি থেকে) মধ্যে কোনো সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় নি। আধুনিক আলোচকগণ নিজকালের ভূমি-ব্যবস্থার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। এই কারণেই তাঁদের আলোচনার মধ্যে ভূমির উপর এক বা অপর পক্ষের অখণ্ড অধিকারই প্রমাণ করার প্রয়াস লক্ষিত হয়। তাঁরা এই সম্ভাবনার প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করেন নি যে একই ভূমিখণ্ডের উপর বিভিন্ন পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন অধিকার থাকতে পারে এবং সেই অধিকারের ভিত্তি কোনো আইনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না থেকে রীতি-পরম্পরায় সুসমর্থিত হতে পারে।

আজ পর্যন্ত এই বিষয়ের বিচারে মধ্যকালের প্রারম্ভের প্রমাণ ও সাক্ষ্যের উপর বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা হয় নি এবং এই কারণেই আমাদের আলোচনাও এই সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হল। যদি সাম্প্রদায়িক, রাজকীয় ও ব্যক্তিগত সকল-প্রকার ভূমি-বিষয়ক অধিকারের উপর একে একে আলোচনা করা যায়, তা হলে প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়।

বৈদিককাল থেকে আরম্ভ করে গুপ্তকাল পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে জমির উপর সাম্প্রদায়িক অধিকারের আভাস পাওয়া যায়। উত্তর বৈদিককালের গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে যে যখন বিশ্বকর্মণ ভৌবন পুরোহিতদের যজ্ঞের জন্য ভূমিদান করেছিলেন তখন পৃথ্বী তার বিরোধ করেছিলেন।[১] মনে হয় সেকালে গোষ্ঠীর অনুমতি ব্যতীত ভূমিদান করা যেত না।[২] বিশ্বকর্মণ ভৌবন'র উদাহরণটি ছাড়া গোষ্ঠীর অনুমতি ব্যতীত ভূমি অনুদানের অন্য কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বেদোত্তর-কালের ধর্মশাস্ত্রকার গৌতম বিধান দিয়েছিলেন যে যোগক্ষেম অর্থাৎ জীবিকার্জনের মাধ্যম যে সম্পত্তি তার বিভাজন হতে পারে না।[৩] স্পষ্টতঃই সম্পত্তির মধ্যে ভূমিও অন্তর্ভূত এবং এই বিধানানুযায়ী পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও বিভাজন অনুমোদিত ছিল না। গৌতম ধর্মসূত্রের ঐ অনুচ্ছেদে যোগক্ষেম শব্দের অর্থ ধর্মার্থ ও যজ্ঞার্থ সম্পত্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মনে হয় এটি পরবর্তীকালে আরোপিত অর্থ।[৪]

১। ৮ ২১
২। কৈ. হি. ই. i, ১১৮
৩। ২৮'৪৬
৪। সে. বু. ই. ii, সূত্র ২৮-এর পাদটীকা XXVIII, ৪৬

বেদোত্তরকালে ভূমির উপর গোষ্ঠীর অধিকারের সঙ্গে বাইরের লোকেরও অধিকারের বিকাশ ঘটতে থাকল। যখন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও পেশার লোক একসঙ্গে মিলে গ্রামের পত্তন করতে লাগল তখন ভূমির উপর সমগ্র গ্রামের কিছু অধিকার বর্তিয়েছিল। ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানাও কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ভূমি সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক সম্পত্তি এবং তা হস্তান্তরিত করা যায় না—এই প্রাচীন চিন্তাধারাটি সম্ভবতঃ প্রাক্‌মৌর্যকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল।[১]

জৈমিনীর মীমাংসাসূত্রেও জমির উপর সম্প্রদায়ের অধিকারের সমর্থন পাওয়া যায়। গ্রন্থটি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত। এটিতে বলা হয়েছে যে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে যজমানকে সমস্ত সম্পত্তি দান করার নিয়ম থাকলেও, এমন কি সম্রাটও তাঁর অধীনস্থ সমগ্র ভূখণ্ড দান কবতে পারেন না। পৃথিবীর উপর সকলের আছে সমান অধিকার।[২] পৃথিবী সকলের, পণ্ডিতেরা এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন যে ভূমির উপর প্রত্যেকের পৃথক পৃথক অধিকার আছে।[৩] কিন্তু এখানে ভূমির উপর কোনো ব্যক্তিবিশেষের অধিকারের সঙ্গে বহুজনের অধিকারের প্রভেদ করা হয়েছে। শবরস্বামী চতুর্থ শতাব্দীতে এই অনুচ্ছেদটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে পৃথিবীর উপর রাজার যেমন অধিকার আছে তেমনি আছে অন্যান্য সকলের।[৪] এর দ্বারা ভূমির উপর সংযুক্ত অধিকারের সিদ্ধান্তের সমর্থনই পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর সার্বজনিক অধিকার প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে ভূমি ও জল সগোত্রদের সাধারণ সম্পত্তি এবং হাজারপুরুষ পর্যন্ত তার বিভাজন হতে পারে না।[৫] স্পষ্টতঃই এই বিধান প্রাকগুপ্তযুগের, কারণ প্রাক্‌গুপ্তকালের কোনো আইনগ্রন্থে দায়ভাগ প্রকরণে ভূসম্পত্তিবিভাগের ব্যবস্থা দেওয়া হয় নি। কিন্তু গুপ্তকালের বা গুপ্তোত্তর-কালের ধর্মশাস্ত্রে ভূসম্পত্তি বিভাজনের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতএব মধ্যযুগীয় স্মৃতিতে ভূমির অবিভাজ্যতার পুরাতন বিধান অসঙ্গত বলে মনে হয়। 'মিতাক্ষরা'[৬] ও 'মদনপারিজাতে'[৭] এই যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে ব্রাহ্মণ গোত্রের

১। কৈ. জয়সওয়াল, হি. পো. ২য় সং, পৃঃ ৩৪৫
২। VI, ৭৩, ধর্মকোষ i, ৭৯৩-এ উদ্ধৃত
৩। কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল, হিন্দু পোলিটী ২য় সং, পৃঃ ৩৪৫
৪। জৈমিনী VI, ৭৩-এর টীকা, ধর্মকোষের i, ৭৯৩-এ উদ্ধৃত
৫। ধর্মকোষ i, ১২৩১
৬। 'যত্তু,সানপা ক্ষেত্রধাবিভাজ্যমনুক্রমবিস্তাজামিতী তদ ব্রাহ্মণোৎপন্ন ক্ষত্রিয়াদি পুত্রবিষয়ম।' ধর্মকোষ i, ১২৩২
৭। ঐ

ভূমির অবিভাজ্যতার নিয়ম ব্রাহ্মণের উৎপন্ন ক্ষত্রিয় বা অন্য জাতীয় পুত্রের উপরই প্রযুক্ত হবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ পুত্রগণ নিজেদের মধ্যে জমি ভাগ করে নিতে পারবে। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে ভূমির উপর গোত্রীয় অধিকারের এমন কৌশল-পূর্ণ ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে জমির উপর ব্যক্তিগত অধিকার সমর্থন পেয়েছিল, যদিও ব্রাহ্মণজাত ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য বর্ণের ব্যক্তিদের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল নিছক জাতের জন্য। আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর ধর্মশাস্ত্রকার দেবন্নভট্ট মিতাক্ষরার ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে আলোচ্য অনুচ্ছেদটি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে স্পষ্ট বলেছেন যে জমির বিভাজন করা চলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, সকল দায়াদদের (অখিলদায়াদানুমত্যে) অনুমতি নিয়েই জমি বিভক্ত করা চলতে পারে।[১] এইভাবে মিতাক্ষরায় যে কথা পরোক্ষে বলা হয়েছে দেবন্নভট্টের 'স্মৃতিচন্দ্রিকা'য় তা প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। অতএব এ কথা বলা চলে যে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে চাতুর্বর্ণের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের ভূসম্পত্তি বিভাজনের যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে তা সম্ভবতঃ অন্যান্য বর্ণের পরিবার সম্পর্কেও প্রযুক্ত ছিল।

সীমানা বিরোধের নিষ্পত্তি এবং ভূমি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে গ্রামের অধিবাসীদের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রে ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে সীমানাবিরোধে কুটুম্ব ও প্রতিবেশীরা মধ্যস্থ করতে পারে এবং সেই সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে চাষী, শিল্পী এবং ব্যাধদের সাক্ষ্য গ্রহণীয়। তাঁদের মতে কোনো ব্যক্তি নিজ গ্রাম, জ্ঞাতি এবং দায়াদদের সম্মতি গ্রহণ করে তবেই জমি বিক্রয় করতে পারে।[২] জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ শ্রেণীর ক্রেতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রথা ছিল। প্রথমে নিকট কুটুম্ব, পরে প্রতিবেশী তার পরে ধনী ব্যক্তি[৩] এবং তারও পরে দূর কুটুম্বদের (সকুল্য) জমি ক্রয়ের সুযোগ দেওয়া হত। এদের মধ্যে সকলেই জমি ক্রয়ে অনিচ্ছুক হলে তখনই ভিন্ন জাতির ব্যক্তির নিকট জমি বিক্রয়ের বিধান ছিল।[৪]

বৃহস্পতিস্মৃত্রে বিধান দেওয়া হয়েছে যে যখন রাজা ভূমিদান করবেন (ধর্মার্থ অথবা ধর্মেতর প্রয়োজনে সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি) তখন তাঁকে চতুর্বেদজ্ঞ, বণিক, মহত্তর, সকল গ্রামবাসী, উক্ত ভূমির মালিক তথা রাজপুরুষদের সে কথা জ্ঞাপন

১। ঐ
২। ধর্মকোষ i, ৯০১ (স্বগ্রামজ্ঞাতি সামন্ত দায়াদানুমতেন চ)
৩। ঐ, ৯০০-তে উদ্ধৃত ভরদ্বাজস্মৃতি।
৪। ঐ

করতে হবে।[১] এই নির্দেশপালন প্রায় সকল অনুদানপত্রেই করা হয়েছে। এর থেকে এ কথাও অনুমিত হয় যে জমির উপর গ্রামবাসীদেরও কিছু অধিকার ছিল। গুপ্তকালে এমন এক উদাহরণ পাওয়া যায় যে ধর্মীয় প্রয়োজনে জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে গ্রামসভার অনুমতি আবশ্যক হত। এইভাবে নবম শতাব্দীতে গোয়ালিয়রের নিকটে একটি নগর একটি মন্দিরকে এমন কিছু জমিদান করেছিল যার উপর সকল নগরবাসীর সংযুক্ত অধিকাব ছিল। সাম্প্রদায়িক অধিকার প্রয়োগের এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে শক্তিশালী রাজারাও এই নিয়ম রক্ষা করেছেন। অনুদানেব সূচনা তাঁবা কেবল যে নিজ রাজপুরুষগণ ও সামন্তদেরই দিতেন তা নয়, উপবস্তু সাধাবণ ব্যক্তিদেবও দিতেন, যাদের মধ্যে চণ্ডাল, মেদ ও অন্ধ্রাও থাকত। বাংলা ও উড়িষ্যায় কয়েকটি অনুদানপত্রে ভূমিদানের জন্য সকলের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছে এবং অন্য কয়েকটি অনুদানপত্রে গ্রামবাসীদের অনুদানের সূচনামাত্র দেওয়া হয়েছে; এই প্রথার মধ্যে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক অধিকারের চিহ্ন পাওয়া যায় যখন ভূমি গোত্রবিশেষেব সংযুক্ত সম্পত্তিরূপে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু যখন গোত্র বা গোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে জাতের রূপ গ্রহণ করল এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন গোত্রের লোকে মিলিতভাবে গ্রামের পত্তন করল, তখনও এই পুরাতন প্রথার প্রচলন অব্যাহত ছিল।

পুরোহিত ও মন্দির সাম্প্রদায়িক মঙ্গলবিধানের অজুহাতে ভূমি উপভোগ করত। ধর্মীয় প্রয়োজনে জমি বিক্রয়েব অধিকারও ঐ একই অজুহাতে দেওয়া হয়েছিল। মন্দিরকে বলি ও সত্রের জন্য ভূমিদান করা হত এবং বলি ও সত্র রূপে দেবতাকে যা কিছু উৎসর্গ কবা হত, তার ভাগীদার যে শুধু পুবোহিতরাই হতেন তাই নয়, সাধারণ ভক্তজনও তার ভাগ পেত। আজও দৈনিক অথবা সাময়িক উৎসবে দেবতাকে উৎসর্গীকৃত প্রসাদাদি সমবেত গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়ে থাকে, সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে উৎসর্গীকৃত বস্তুর একটা বড় ভাগ ভক্তজনের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হত। কালক্রমে পুরোহিতগণই বৃহত্তর অংশ নিজেদের ভোগে লাগাতে আরম্ভ করল এবং সাধারণ ব্যক্তি, যার নামে জমি, তাকে জমির উৎপন্নের একটা ক্ষুদ্র অংশই দেওয়া হত।

গোচারণভূমি সম্পর্কে প্রাকগুপ্তযুগের দু-জন স্মৃতিকার মনু ও বিষ্ণু স্পষ্ট বলেছেন যে গোচারণভূমির বিভাজন হতে পারে না। উদকের বিভাজন হতে পারে না।

১। 'রাজ্ঞা ক্ষেত্রং দত্ত্বা চাতুর্বৈদ্য বণিজ্যতারিক সর্বগ্রামীণতন্ মহত্তর স্বামীপুরুষাধিষ্ঠিতং পরিচ্ছিন্দয়াৎ।' হিস্ট্রী অফ ধর্মশাস্ত্র i, ৯৪৯-এ উদ্ধৃত।

এই ব্যবস্থা থেকে জলাশয়াদির উপর সার্বজনিক অধিকারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১] শিলালিপি থেকেও পরোক্ষভাবে জানা যায় যে সাধারণে এইপ্রকার সার্বজনিক অধিকার ভোগ কবত কিন্তু পরবর্তীকালে যেমন বিধান দেওয়া হতে থাকল, এবং যে যে সর্তে অনুদান দেওয়া হতে থাকল, তাব ফলে সার্বজনিক অধিকারের ক্রমশ হ্রাস হতে থাকল।

ভূমির উপর সার্বজনিক অধিকার রাজাই সর্বপ্রথম বিঘ্নেব সৃষ্টি করেছিলেন। পূর্বে আমরা যেখানে বিশ্বকর্মণ ভৌবন সম্পর্কীয় যে অনুচ্ছেদটির আলোচনা করেছি ; তার থেকে এ কথা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়েছে যে এই প্রক্রিয়া বৈদিকযুগের সমাপ্তির পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। যদিও এই অনুচ্ছেদটি থেকে জানা যায় যে রাজা কর্তৃক ভূমি-বিষয়ক অধিকারগুলি ক্রমশ হবণ করাটা সমাজ সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীবে রাজাই সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে সামাজিক অধিকার পেয়ে গেলেন। তথাপি জমির উপর অখণ্ড ও নিরঙ্কুশ অধিকার তিনি পান নি। যাই হোক না কেন পূর্ব-মধ্যকাল পর্যন্ত ভূমিব উপব যতকিছু গোত্রীয় ও সাম্প্রদায়িক অধিকার অবশিষ্ট ছিল তাবও মূল রাজকীয় ও ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশের ফলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাব সাক্ষ্য স্মৃতিগ্রন্থ ও ভূমি অনুদানপত্রগুলিতে পাওয়া যায়।

যাঁরা প্রাচীন ভারতে ভূমির উপর রাজার একছত্রাধিকারের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তাঁরা নিজেদের যুক্তির সমর্থনে প্রদত্ত প্রমাণগুলি প্রাচীনকাল ও মধ্যকাল উভয়কালেই প্রযুক্ত বলে বিবৃত করেছেন। কিন্তু যেসকল গ্রন্থে ভূমির উপর রাজার অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই যে পূর্ব-মধ্যকালে রচিত সেদিকে এইসকল পণ্ডিতদের দৃষ্টি যায় নি। কৌটিল্য কৃষির উপর রাজার নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন[২], কিন্তু তার ফলে তিনি যে ভূমির উপর রাজাব অধিকার সমর্থন করেন তা প্রমাণিত হয় না। মনে হয় মনুই প্রথম ভূমির উপর রাজার সর্বোচ্চ অধিকারের কথা বলেন, কিন্তু সর্বাধিক অধিকারের অর্থ যে ভূমির একছত্র মালিকানা তা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। তাঁর মতানুসারে খনিজধাতুর অর্ধাংশের অধিকারী রাজা কারণ তিনি পৃথিবীর অধিপতি এবং পৃথিবীকে রক্ষা করেন। পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদের অনুসারে রাজা লোকদের রক্ষা করতেন, এই কারণেই কর আরোপ করতে পারতেন। ভূমির উপর রাজকীয় প্রভুত্বের প্রথম স্বীকৃতি গুপ্তকালে কাত্যায়নকৃত স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। কাত্যায়নের মতে রাজা ভূস্বামী, অতএব উৎপন্ন ফসলের

১। ধর্মকোষ, ১২০৪, ১২০৬, ১২০৯
২। অর্থশাস্ত্র ii, ২৪

এক-চতুর্থাংশের তিনি অধিকারী।[১] কিন্তু তিনি এ কথাও স্বীকার করেছেন যে মানুষ ভূমির উপর বাস করে, অতএব তাকেও ভূমির মালিক বলা যেতে পারে।[২] এই-ভাবে তিনি ভূমির উপর রাজার অধিকার স্বীকার করেও, সাধারণ ব্যক্তির অধিকারও যে থাকতে পারে সে কথা বলেছেন। প্রায় অনুরূপ কথা নারদও বলেন। তিনি কৃষকদের জমি ও বাসগৃহ থেকে বঞ্চিত করার অধিকার অবশ্য রাজাকে দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে বিরত থাকার নির্দেশও দিয়েছেন, কারণ জমি ও গৃহ উভয়ই জীবিকানির্বাহের উপায় মাত্র।[৩] নারদের দ্বিতীয় নির্দেশটির ব্যাখ্যায় অসহায় বলেন যে কৃষকদের বীজ ইত্যাদি প্রদান করে রাজার নিজ স্বত্বগ্রহণ করা উচিত।[৪] এর অর্থ এই যে রাজা কৃষকদের সাহায্যদান করেন, তাই উৎপন্ন ফসলের রাজকীয় অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কৃষকদের সমর্থনে এই যুক্তিটির উল্লেখ নরসিংহ পুরাণে পাওয়া যায় না বরং সেখানে রাজাকে ভূমির প্রকৃত অধিকারী বলা হয়েছে।[৫] দ্বাদশ শতাব্দীর একজন টীকাকার ভট্টস্বামী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের টীকাপ্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছেন। এখানে শাস্ত্রকারগণ এ কথা স্বীকার করেন যে রাজা ভূমি ও জল দুইয়েরই প্রভু এবং সাধারণ ব্যক্তি এ দুটির অতিরিক্ত অন্যান্য যে-কোনো বস্তুর মালিক হতে পারে।[৬] এই অনুচ্ছেদের বিবৃতির সঙ্গে নরসিংহ পুরাণের ভাষ্যকারের মতের খুব সামঞ্জস্য আছে এবং রাজা ও প্রজার অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে।[৭] এখানে এ কথা বলা হয় নি যে প্রজার ভূমি-বিষয়ক অধিকারগুলি রাজার অধীন, বরং এ কথাই বলা হয়েছে যে প্রজার ভূমি-বিষয়ক অধিকারই নেই। জলসেচনকর প্রসঙ্গে এই অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছেন ভট্টস্বামী। তাই এ কথা মনে করা খুবই সঙ্গত যে ভূস্বামিত্বের ভিত্তিতেই কর আরোপের অধিকার প্রমাণ করার জন্য ভট্টস্বামী অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করেছেন।

১। কাত্যায়নস্মৃতি, শ্লোক ১৬
২। ঐ, শ্লোক ১৭
৩। xi, ২৭, ৪২
৪। নারদস্মৃতি XIV, ৪২-এর টীকা, ধর্মকোষ, ৯৪৯-এ উদ্ধৃত
৫। এম. এ. বককৃত, 'ইকনমিক লাইফ ইন এন্সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া' ii, পৃঃ ২৪-এ উদ্ধৃত 'লীজ ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড লেবার অফ ইণ্ডিয়ার ১১১-৪ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত। সেনকৃত হিন্দু জুরিস প্রুডেন্সের ৫২ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১·৩১৮ মিতাক্ষরার টীকা থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়। এর অনুসারে ভূমিদান করার নিবন্ধের অধিকারী প্রান্তীয় শাসক বা জেলাধিকারী ছিল না—এই বিশেষ অধিকার ছিল একমাত্র রাজার।
৬। অর্থশাস্ত্র (চতুর্থ সং) অনুঃ পৃঃ ১৪৪
৭। ঘোষালকৃত হিস্ট্রিওগ্রাফি এ্যাণ্ড আদার এসেজ পৃঃ ১৮০। মানসোল্লাস i (গা. ও. সি. ২৮), পরিচ্ছেদ ৩, শ্লোক ৩৬১-এ রাজার অধিকারের সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে রাজাকে সমস্ত সম্পত্তির বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ সমস্ত কিছুর প্রভু (ঈশ্বর) বলা হয়েছে।

যদিও পঞ্চম শতাব্দী থেকে সাধারণ ব্যক্তিরাও নিজ জমি ইজারা দিতে পারত, তবু রাজা ভূমির উপর নিজ সর্বোচ্চ অধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন। যাজ্ঞবল্ক্য (ii, ১৫৮) বিধান দিয়েছেন যে, কোনো চাষী যদি চাষের জমি গ্রহণ করে সেই জমি চাষ না করে, তা হলে সে জমির মালিককে প্রাপ্য অংশ দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু এখানেও রাজার প্রাপ্য সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। তবে বৃহস্পতি[১] ও ব্যাসের[২] মতানুসারে এইরূপ পরিস্থিতিতে চাষী শুধু যে জমির মালিককেই তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে তাই নয় বরং অনুরূপ জরিমানা রাজাকেও দেবে। কৃষিকার্যের উপেক্ষার ফলে রাজস্বের হানি অবশ্যই হত; কিন্তু তার জন্য ভূস্বামীকেই দায়ী করা উচিত; চাষীদের নয়। কিন্তু রাজা ভূস্বামীকে দায়ী না করে চাষীদের সঙ্গে যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধস্থাপন করতেন তার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ভূমির উপর রাজার সাধারণ অধিকার বর্তমান ছিল। তিনপুরুষ ধরে ভোগ করছে এমন জমির উপর সেই পরিবারের আইনগত অধিকার নারদ সমর্থন করেছেন। কিন্তু সেখানেও রাজকীয় অধিকার ব্যক্তিগত অধিকারকে অতিক্রম করে, কারণ রাজার প্রসাদে (কৃপায়) সেই জমিও অন্যকে হস্তান্তরিত করা যেতে পারত। এইভাবে একদিকে রাজাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে তিনি কোনও ব্যক্তিকে তার জমি ও বাড়ি থেকে বঞ্চিত করতে পারবেন (সেই জমি বা বাড়ি ৬০ বছর ধরে তার দখলে থাকলেও) অন্যদিকে সেই জমি তিনি অন্য কাউকেও হস্তান্তরিত করতে পারবেন সে অধিকারও তাঁর ছিল। অর্থাৎ একজনের জমি অন্যকে হস্তান্তরিত করার অধিকার রাজার ছিল।

গুপ্তকাল ও গুপ্তোত্তরকালে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হুয়েন সাঙ্ তাঁদের বিবরণে লিখেছেন যে ভূমি রাজার সম্পত্তি ছিল। বিভিন্ন রাজার বাস্তব পরিস্থিতিতে সামান্য ইতর-বিশেষ হলেও, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে পূর্ব-মধ্যকালে নীতিগতভাবে ভূমির উপর রাজার অধিকারই বর্তমান ছিল। কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল প্রাচীন ভারতে ভূমির উপর রাজকীয় প্রভুত্বের সিদ্ধান্তটিকে সামন্তবাদী বিধানেরই অঙ্গ বলে মনে করেন[৩] কিন্তু গুপ্তকালীন ও গুপ্তোত্তরকালের স্মৃতি ও ভাষ্যে ভূমির উপর রাজার প্রভুত্বের যে সমর্থন পাওয়া যায়, সেগুলিকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না। তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী জৈমিনী মতের সমর্থক একমাত্র শবরই এই সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেছেন।

১। ধর্মকোষ i, ৯৫৪
২। ঐ, ৯৬১
৩। হিন্দু পোলিটি (দ্বিতীয় সং) ৩৪৯। তিনি উইলস্ (হিস্ট্রী অব মাইসোর ১৮৬৯)-কে উদ্ধৃত করে বলেছেন যে উইলসের অনুসারে ভূমির উপর রাজার প্রভুত্বের সামন্তবাদী সিদ্ধান্তকে হিন্দু আইনের অনুরূপে গ্রহণ করার কোনো ভিত্তি নেই।

বলা যেতে পারে যে ভূমির উপর রাজার কেবল ভোগাধিকার ছিল, সে অধিকার তিনি অনুদানভোগীদের হস্তান্তরিত করে দিতেন এবং প্রারম্ভিক অনুদানগুলিতে রাজস্বের উ সগুলিও দানগ্রহীতাদের হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু গুপ্তোত্তর-কালের অনুদানপত্রে জল, পথ, উর্বর, অনুর্বর ও নাবাল জমি, বৃক্ষ, খড় ইত্যাদি সমস্ত কিছুর অধিকারসমেত গ্রামদান করা হত। মারাঠা অনুদানপত্রের সম্বন্ধে আধুনিক-কালে ভারতীয় আদালত অর্থ করেছেন যে এতে গ্রহীতার নামে জমির সর্বাঙ্গীন মালিকানা হস্তান্তরিত হত।[১] অপরপক্ষে যেখানে অনুদানপত্রে এই সমস্ত বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে সেখানে তার অর্থ এই করা হয়েছে যে রাজা কেবল রাজস্বের উৎসটিকে[২] হস্তান্তর করেছেন। এই ব্যাখ্যা পূর্ব-মধ্যকালীন অনুদানসম্পর্কেও প্রযুক্ত হওয়া উচিত। যদি জমির উপর রাজার নিজের প্রভুত্ব না থাকত তা হলে তিনি অন্যকে তা কি ভাবে হস্তান্তর করতে পারতেন ?

হতে পারে যে সমাজপতি হবার কারণে রাজা ভূমিসংক্রান্ত অধিকারপ্রাপ্ত হতেন, কিন্তু পূর্বমধ্যকালে তাঁর এইরূপ কোনো মর্যাদা ছিল না। তা ছাড়া রাজার প্রভুত্বের সঙ্গে রাজ্যের প্রভুত্বকে এক করে দেখা চলে না। যখন রাজা ভূমিদান করতেন তখন তিনি নিজ অথবা নিজ পূর্বপুরুষের জন্য পুণ্যার্জনের নিমিত্তই ঐরূপ করতেন, তখন রাজ্য বা রাজ্যের প্রজাদের কোনো আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য তিনি ঐরূপ করতেন না। অর্থাৎ তিনি নিতান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থেই সাধারণ ভূস্বামীর ন্যায় ভূমি অনুদান দিতেন।

বৈদিক ও বেদোত্তর, মৌর্য ও মৌর্যোত্তর কালের, সাহিত্যে সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা চাষযোগ্য ভূমির অধিকার ভোগ করার উল্লেখ পাওয়া যায়, তার দ্বারা অনুমিত হয় যে ভূমির উপর সাধারণ ব্যক্তির মালিকানা সে যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মারকগুলিতে ধর্মীয় প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অপরকে জমি হস্তান্তর করার অধিকার দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না। কর্ষণযোগ্য ভূমি বিক্রয় করা, বন্ধক দেওয়া, বিভক্ত করা, ইত্যাদি অধিকার চাষীদের ছিল না। মালিকানার এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ গৌতম[৩] ও মনু[৪] ইত্যাদি প্রাক্‌গুপ্তকালীন ধর্মশাস্ত্রকারগণ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বা আপস্তম্ব, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ ও বিষ্ণু ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্রকারগণ দান, বিক্রয়, বন্ধক বা বিভাগ ইত্যাদির দ্বারা নিজ জমি অপরকে দান

১। হি. ধ. শা. ii, ৮৬৫-৬
২। মামলা প্রসঙ্গে দেখুন, ঐ, পাদটীকা ২০৩১
৩। X, ৩৯
৪। X, ১১৫

করা বা অপরের ভূমি গ্রহণ করার অনুমতি কোনো ব্যক্তিকে দেন নি। কিন্তু গুপ্তকাল ও গুপ্তোত্তরকালের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে জমি বিভাগ করা, বিক্রয় করা, বন্ধক দেওয়া, অবৈধ দখলে রাখা এবং ইজারা দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিধান দেওয়া হয়েছে।

যদিও প্রাক্‌গুপ্তযুগের স্মৃতিগ্রন্থে বিভাজনসম্বন্ধীয় নিয়মগুলি বিস্তারিতভাবে বিবৃত করা হয়েছে, তবু বিভাজ্য বস্তুর তালিকায় জমির উল্লেখ করা হয় নি। প্রথম গুপ্তোত্তরকালের স্মৃতিকার বৃহস্পতি[১] স্পষ্টভাবে বলেছেন যে বিভাগের দ্বারা উচ্চ-বর্ণের ব্যক্তির শূদ্র পুত্রকে জমির ভাগ দেওয়া অবৈধ। ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে আবির্ভূত দেবল ঐ একই বিধানের পুনরাবৃত্তি করেছেন। বৃহস্পতির প্রায় সমকালীন স্মৃতিকার কাত্যায়ন[২] বলেছেন জমি, বাগান, গৃহ ইত্যাদি বিভাগ করা হলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দক্ষিণ অথবা পশ্চিম অংশ প্রদান করা উচিত। ৬০০ থেকে ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সংকলিত শঙ্খলিখিতের স্মৃতিগ্রন্থে বলা হয়েছে যে যদি কেউ নিজের পরিশ্রমের দ্বারা হৃত জমি পুনরুদ্ধার করতে পারে, তা হলে তার উচিত এক-চতুর্থাংশ বেশি নিয়ে বাকি অংশ অন্য শরিকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা।[৩] এই-সকল নিয়মগুলি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে গুপ্তকাল থেকেই জমির বিভাজনক্রিয়া সুরু হয়ে গিয়েছিল।

মনু[৪] ও বিষ্ণু[৫] যাকে অবিভাজ্য বলেছেন সেই গোচারণভূমিকেও বৃহস্পতি[৬] বিভাজ্য বলে বিধান দিয়েছেন। গোচারণভূমির বিভাজনের বিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ যে বিস্তৃত জমি বহুকাল ধরে বহু পরিবারের সংযুক্ত সম্পত্তি ছিল, বিভাজনের ফলে তা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এইভাবে দেখা যায় যে গুপ্তকালে ভূমি ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যেত এবং লোকে নিজ অংশের জমিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারত।

বিক্রয়সম্বন্ধীয় বিধানগুলি থেকেও ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিকাশের আরো পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্য বাস্তুভূমি ও গৃহ বিক্রয়ের নিয়ম প্রস্তুত করেছিলেন[৭], কিন্তু তিনি চাষের জমি বিক্রয়ের নিয়মের কোনো উল্লেখ করেন নি। সম্ভবতঃ মৌর্যকালে জমি বিক্রয়ের প্রচলন ছিল না। এইভাবে প্রাক্‌গুপ্তকালের

১। ধর্মকোষ i, ১২৫১
২। ঐ, ১২৫২
৩। ঐ, ১২০৭, স্মৃতিচন্দ্রিকার ভাষ্যসমেত
৪। IX, ২১৯, মেধাতিথির মতানুসারে গোচারণভূমির সম্বন্ধে 'প্রচার' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।
৫। XVIII, ৪৪
৬। ধর্মকোষ i, ২, ১২২৩। অপরার্ক 'প্রচার' শব্দের ব্যাখ্যা 'প্রবেশনির্গমভূঃ'রূপে করেছেন (ঐ)
৭। III. ৯

স্মৃতিগ্রন্থে ক্রয়বিক্রয়সম্বন্ধীয় যে বিস্তৃত নিয়ম বিবৃত করা হয়েছে, তাতে ক্রয়বিক্রয়ের বস্তুর মধ্যে জমির উল্লেখ করা হয় নি। এমন কি যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদের ন্যায় গুপ্তকালের স্মৃতিকারগণও জমি বিক্রয়ের কোনো উল্লেখ করেন নি। এঁরা দু-জনেই ক্রীত বস্তুর পরীক্ষার জন্য নানান সময় নির্ধারণ করেছেন। এইসকল বস্তুর মধ্যে তাঁরা লোহা, বস্ত্র, দুগ্ধবতী গাভী, গবাদি পশু, ভারবাহী পশু, রত্নাদি, সকল-প্রকার খাদ্যশস্য, দাসদাসী ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভূমির বিষয়ে কিছু বলা হয় নি।[১] মনে হয় বৃহস্পতিই[২] ভূমি বিক্রয়সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর প্রথম রচয়িতা। পরবর্তীকালে কাত্যায়ন ও অন্যান্য স্মৃতিকারগণ ঐ বিষয়ে নিয়ম প্রস্তুত করেছেন। কাত্যায়ন বিধান দিয়েছেন যে যদি কেউ নিজ জমি অন্যকে প্রদান করে বা বিক্রয় করে বা বন্ধক রাখে এবং পরে যদি ঐ জমি নিরর্থক হয়ে পড়ে তা হলে সমপরিমাণ জমি পুনরায় দান করা উচিত।[৩] যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে অন্যভাবে ঐ ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা কর্তব্য।[৪] কাত্যায়ন আরও বলেছেন যে ক্রয়ের আগে ভালভাবে জমি পরীক্ষা করে দেওয়া উচিত।[৫] এই নিয়মগুলি পরবর্তীকালীন স্মৃতিগ্রন্থেও পাওয়া যায়।[৬] কাত্যায়ন বিধান দিয়েছেন যে করযোগ্য ভূমির কর-প্রদানের জন্য প্রয়োজন হলে সেই জমি বিক্রয় করা উচিত।[৭] এর অর্থ এই যে কর আদায় করার জন্য কৃষককে তার জমির অংশবিশেষ বিক্রয়ে বাধ্য করা যেতে পারত।

বৃহস্পতি[৮] ভরদ্বাজ[৯] ও অপরার্ক[১০] রচিত কয়েকটি বিধানও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে পূর্ব-মধ্যকালে জমি বিক্রয় করা যেতে পারত। বৃহস্পতির মতে জমি বিক্রয়কালে জমিতে অবস্থিত, কূপ, বৃক্ষ, জলাশয়, খেত, পাকা ফসল, আহারযোগ্য ফল, চুঙ্গীগৃহ ইত্যাদির উল্লেখ করা উচিত।[১১] এখানে যেসকল বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে তাতে সহজেই মনে হয় যে বৃহস্পতি সম্পূর্ণ গ্রামের বিক্রয়ের কথাই হয়ত বলেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মীধরের রচনায় গ্রামবিক্রয়ের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।

১। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ii, ১৭৭, নারদস্মৃতি xii, ৫-৬
২। ধর্মকোষ, ৮৯৬
৩। ঐ, ৭৬৭
৪। ঐ
৫। ঐ, ৮৯৬
৬। ঐ, ৮৯৯
৭। ঐ i, ৮৯৮
৮। ঐ, ৮৯৫
৯। ৭২৩। ভরদ্বাজের এইসকল বিধান অবৈধ বিক্রয়সম্বন্ধীয়।
১০। ঐ, ৭৬১
১১। ধর্মকোষ, ৮৯৬

তিনি স্থাবর সম্পত্তি বলতে গ্রাম, খেত ইত্যাদি বিক্রয়ের বর্ণনা করেছেন।[১] এই শতাব্দীতেই পণ্ডিত দেবন্নভট্ট এই প্রসঙ্গে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন যে চতুঃসীমা, জল ও বৃক্ষসহ কোনো গ্রাম বিক্রয় করা হলে, গ্রামে অবস্থিত দেবগৃহ ও পুরোহিতদের বিনষ্ট করা চলবে না।[২]

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যখন বরদবাজকৃত 'ব্যবহারনির্ণয়ে'র সংকলন হয়েছিল জমি বিক্রয়ের, জমি বিক্রয়ের প্রচলন সু-প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, কারণ এই গ্রন্থে জমি, বাড়ি ইত্যাদি ক পণ্যবস্তুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ইতিপূর্বে জমি, গৃহ ইত্যাদিকে এই বিশেষণ সম্ভবতঃ কোথাও দেওয়া হয় নি।[৩] ভূমি-বিক্রয় সম্পর্কিত বিধানে ধর্মেতর প্রয়োজনের জন্য জমি বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয় নি। গুপ্তোত্তরকালেই ধর্মীয় প্রয়োজনে ও জমি বিক্রয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, যার কারণ সম্ভবতঃ মুদ্রার অভাব। কিন্তু দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জমি বিক্রয়ের জন্য নিয়ম রচিত হয়েছিল। এই সময়ে ব্যবসাবাণিজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলন হয়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। সম্পূর্ণ গ্রাম বিক্রয়সম্বন্ধীয় বিধান থেকে এ কথা মনে করা যেতে পারে যে ইউরোপীয় বড় বড় ভূস্বামী লর্ডদের মত এখানেও সম্পূর্ণ গ্রামের মালিকের অভাব ছিল না।

গৌতম, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ কোথাও খেত বন্ধক দেওয়ার উল্লেখ করেন নি।[৪] প্রথমে বৃহস্পতিই এর উল্লেখ করেছেন। তিনি বন্ধকীকৃত গৃহের ব্যবহার ও বন্ধকীকৃত জমিতে উৎপন্ন ফসলকে 'ভোগলাভ' নামে উল্লেখ করেছেন।[৫] বৃহস্পতি ও কাত্যায়নের বিবৃতিতে জমি উপভোগসম্বন্ধীয় বেশ কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ আছে। কাত্যায়ন বলেন, যে জমি বা গৃহ বন্ধক দেওয়া হবে, তার চতুঃসীমা এবং যে প্রদেশ অথবা গ্রামে ঐ জমি বা গ্রাম অবস্থিত, বন্ধককালে তার স্পষ্ট উল্লেখ কর্তব্য।[৬] ধর্মীয় ও সম্ভবতঃ ধর্মেতর অনুদানেও প্রদত্ত গ্রামগুলি সম্পর্কেও সম্ভবতঃ এই নিয়মগুলি প্রযোজ্য ছিল। বৃহস্পতি বলেন যে যখন ঋণদাতা বন্ধকে প্রাপ্ত কোনো খেত বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তির পর্যাপ্ত উপভোগ করে নেয় ও তদ্দ্বারা নিজ মূলধন ও সুদ আদায় হয়ে গেলে, জমি বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি অধমর্ণের নিকট ফিরে যায়।[৭] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ঋণী ব্যক্তি মূল ও সুদের আদায়ের জন্য ঋণদাতার নিকট

১। ব্যবহারকল্পতরু, ধর্মকোষ, ৮৯৬-এ উদ্ধৃত

২। স্মৃতিচন্দ্রিকা, ২৩, ধর্মকোষ i, ৯৪৭-এ উদ্ধৃত

৩। হি. ধ. শা. iii, ৪৯৫, পাদটীকা ৮৭৮

৪। ১'১২৫

৫। XI, ৭-৮

৬। শ্লোক ৫২২

৭। XI, ২৩

জমি বন্ধক রাখত। কাত্যায়ন বলেন যে যদি কোনো ব্যক্তি সুদের পরিবর্তে মহাজনের নিকট জমি বন্ধক রেখে থাকে, তা হলে সে ঋণের টাকা শোধ করে জমি ফিরিয়ে নিতে পারে।[১]

গুপ্তোত্তরকালে সুদের পরিবর্তে জমি বন্ধক রাখার ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। নারদ (১.১২৫) দ্বারা উল্লিখিত দুই প্রকার বন্ধক ব্যবস্থার টীকাপ্রসঙ্গে অসহায় (৭০০-৭৫০) জমি ও বাড়িকে এমন বন্ধকীবস্তু বলেছেন, যা মহাজন উপভোগ করতে পারত।[২] এইভাবে মনুস্মৃতির (VIII, ১৪৩) টীকায় মেধাতিথি বলেন যে মহাজনকে দুধ উপভোগ করার জন্য গরু দেওয়া হত এবং খেত ও বাগান দেওয়া হত উৎপন্ন ফসল উপভোগ করাব জন্য। তাব ফলে মহাজন অধমর্ণের নিকট থেকে কোনোপ্রকার বৃদ্ধি বা কুসীদ (সুদ) পাবাব অধিকারী হত না। মেধাতিথির সমসাময়িক ব্যাসও 'আধি'র অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। যখন কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে নির্দিষ্ট সুদে কোনো জিনিস নিয়ে তার পরিবর্তে ঋণদাতাকে সুদের বদলে নিজ খেত উপভোগ করতে দেয় এবং অনুরোধ জানায় যে সেই জমি থেকে নির্দিষ্ট সুদের অতিরিক্ত লাভ যেন মূলধন থেকে বাদ দেওয়া হয়, তখন সেই ব্যবস্থাকে 'আধি' বা সপ্রত্যায়ভোগ্যাধিঃ বলা হয় এবং সেই প্রকারে মূলধনের দ্বিগুণ অর্থ আদায় হয়ে গেলে অধমর্ণকে 'আধি' প্রত্যর্পণ করে দেওয়া হয়।[৩] জমি বন্ধক রাখার পরিবর্তে ঋণশোধ করার জন্য জমি বিক্রয়ও করা চলত। ভরদ্বাজের মতানুসারে যদি অধমর্ণ ঋণশোধে অসমর্থ হয় তা হলে তার সম্পত্তি বিক্রয় করে ঋণশোধ করা যেতে পারে এবং সেই সম্পত্তির মধ্যে জমি, খেত, বাগান, বাড়ি, সমস্তই অন্তর্ভূত।[৪]

এটিও ঋণশোধের জন্য জমি বন্ধক রাখার রীতির ইঙ্গিত। এই প্রথার ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঋণদাতাদের ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনও বলা হয়েছে যে বন্ধকী জমি শত বৎসর পর্যন্ত উপভোগ করা চলে। কিন্তু জমি বন্ধক রাখার নিয়মকে কার্যকর করার জন্য মুদ্রার প্রচলন বাড়ার দরকার। এই পরিস্থিতি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎপন্ন হয়েছিল। এবং মধ্যভারতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ বিষয়ে একটি শিলালিপিতে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কোনো সম্পত্তি তার বৈধ মালিকের দখলে না থাকলে, তার উপর তার অধিকারের সমাপ্তি বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রে অনেক বিধান আছে যার দ্বারা জমির উপর

১। শ্লোক ৫১৬
২। স্যা. বু. ই. xxxiii, ৭৩
৩। ধর্মকোষ i, ৬৫৪
৪। ঐ, ৭৩১

ব্যক্তিগত অধিকারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গৌতম[১] ও মনু[২] বিধান দিয়েছেন যে যদি কোনো সম্পত্তি ১০ বছর পর্যন্ত অন্য ব্যক্তির দখলে থাকে, তা হলে ঐ সম্পত্তির মালিক তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। যাজ্ঞবল্ক্য সময়ের সীমা বাড়িয়ে ২০ বছর করেছেন[৩], কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউই এই প্রসঙ্গে সম্পত্তি হিসাবে ভূমির উল্লেখ করেন নি। বিষ্ণু[৪], নারদ[৫], বৃহস্পতি[৬] ও কাত্যায়ন[৭] ইত্যাদির স্মৃতিতে আমরা এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এঁরা এই সময়াবধিকে বাড়িয়ে তিনপুরুষ বা প্রায় ৬০ বছর করেছেন এবং এই নিয়মকে ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে মিতাক্ষরা বিধানে এই অবধি বাড়িয়ে একশত বৎসর[৮] করা হয়েছে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্মৃতিগ্রন্থ 'স্মৃতিচন্দ্রিকায়' সময়াবধি আরো বাড়িয়ে ১০৫[৯] বছর করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়মের ফলে গুপ্তকাল থেকে ভূস্বামীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং পূর্ব-মধ্যকাল শেষ হতে হতে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে গেল। এই নিয়ম-গুলি থেকে আরও অনুমান করা চলে যে-কোনো ব্যক্তি অথবা রাজার জমি চাষী বা শক্তিশালী প্রতিবেশীর দখলে শতবর্ষাবধি থাকলেও সেই জমির মূল অধিকারীকে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেত না।

অস্থায়ী কৃষকদের উপর এই নিয়মের প্রতিকূল প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয়। দীর্ঘতর সময়াবধি হয়ত এই জন্যই নির্ধারিত করা হয়েছিল যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় কৃষকেরা জমির দখলদার না হয়ে যায়। এই নিয়মের সুযোগে দীর্ঘকালের কৃষকদের জমি থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারত এবং ধর্মীয় ও বৈষয়িক দান দেওয়া যেতে পারত ; যদি তাদের দখলে সাময়িকভাবেও ছেদ পড়ে যেত। অল্পকালের অবধি স্মৃতি থেকে প্রমাণ করা সহজ, কিন্তু কোনো জমি ৫০ বা ৬০ বছর থেকে কোন্ ব্যক্তিবিশেষের দখলে ছিল তা স্মৃতি থেকে প্রমাণ করা কঠিন এবং যেখানে শতবর্ষের কথা সেখানে ত এইরূপ প্রমাণ করা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব এই

১। হি. ধ. শা. iii, ৩২০; পাদটীকা ৪৫৬
২। VIII, নারদস্মৃতি iv, ৭৯-৮০ ও সাংখ্য, হি. ধ. শা. iii, ৩২০-তে দশ বৎসরের বিধানের উল্লেখ আছে।
৩। II, ২৪
৪। V, ১৮৩
৫। I, ৯১
৬। IX, ২৭-৩০, এখানে বিশেষ করে ভূমির নয়, বরং স্থাবর সম্পত্তির উল্লেখ করেছেন-বৃহস্পতি।
৭। শ্লোক ৩২৭
৮। যাজ্ঞবল্ক্য II, ২৭-এর টীকা
৯। হি. ধ. শা. iii, ৩২১, পাদটীকা ৪৫৯

নিয়মগুলির ফলে ভূস্বামীদের লাভ হয়েছিল, কিন্তু চাষীদের জমির উপর সত্ত্বাধিকার বিকাশে এগুলি বাধার সৃষ্টি করেছিল।

কৃষকদের জমি ইজারা দেওয়ার যে নিয়ম ছিল তার দ্বারা জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রমাণ করা যায়। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে ভূস্বামীদের সঙ্গে ভাগচাষী ও কিষাণদের সম্পর্ক কি রকম হওয়া উচিত, তা নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল। কিষাণদের প্রহার করা চলত এবং ভূস্বামী তার ভাগচাষীদের সর্বদা পরিবর্তন করতে পারত। কিন্তু ভূস্বামী ও ইজারাধারীদের সম্বন্ধে কোনো নিয়ম প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে উল্লিখিত নেই। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের একস্থানে অস্পষ্টভাবে এই বিষয়ের উল্লেখমাত্র করা হয়েছে। কিন্তু গুপ্তকালের এবং পরবর্তী যুগের স্মৃতিশাস্ত্রে ভূস্বামীর সম্পর্ক ক্ষেত্রক বা কর্ষকের সঙ্গে কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে নিয়ম প্রস্তুত করা হয়েছে। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর কালের অধিকাংশ স্মৃতিকারগণ বিধান দিয়েছেন যে ইজারায় গৃহীত জমি ভালভাবে চাষ করা উচিত, কারণ চাষে অবহেলা করলেও ভূস্বামীকে তার প্রাপ্য অংশ দিতে হবে।[১] কোনো-কোনো স্মৃতিকার এ নির্দেশও দিয়েছেন যে চাষে অবহেলাকারী কৃষক রাজাকেও জরিমানা দেবে।[২] মিতাক্ষরায় এই বিধান দেওয়া হয়েছে যে চাষে অবহেলাকারী কৃষকের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেওয়া হবে।[৩] এইভাবে ভূস্বামী ইজারাদারকে বদলাতে পারত। ভূস্বামীর নিজের অংশ যাকে 'কৃষ্টফল' বা 'সদ' বলা হত, তার পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত, তা জমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করত। বহুদিনের পতিত জমির উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ, আবাদী জমির ফসলের অষ্টমাংশ এবং সুফলা জমির ফসলের ষষ্ঠমাংশের অধিকারী হত ভূস্বামী।[৪] স্পষ্টতঃ জমিচাষে পুঁজি, উপকরণ, বীজ, শ্রম ইত্যাদি জমিচাষীকেই ব্যয় করতে হত। কিন্তু এই নিয়ম ভাগচাষীদের প্রতি প্রযুক্ত ছিল না। ভাগচাষীরা জমিচাষের খরচের একাংশ ভূস্বামীর কাছ থেকে পেত, কিন্তু পরিবর্তে ভূস্বামী উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশই হরণ করত। কিন্তু পতিত জমি উদ্ধারের সম্পূর্ণ খরচ ভূস্বামীকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি ভূস্বামী তা না দেয় তা হলে প্রথম আট বছর চাষী ঐ জমিতে উৎপন্ন ফসলের অষ্টমাংশমাত্রই ভূস্বামীকে দেবে এবং এই সময়ের পরে জমি ভূস্বামীর দখলে ফিরে যাবে।

এই সমস্ত নিয়মই ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা বিকাশের পর্যাপ্ত সংকেত দেয়। কিন্তু বন্ধক, বেদখলী ও ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি সাধারণ জোতদার

১। ঐ, ৯৪৩, ৯৫৪, ৯৬১
২। ঐ, ৯৫৪, ৯৬১
৩। ঐ, ৯৪৩
৪। ঐ, ৯৫৪

কৃষক অপেক্ষা বড় বড় ভূস্বামীদেরই অনুকূল ছিল বলে মনে হয়। যাই হোক সামন্তবাদী রাজ্যব্যবস্থা ও অর্থতন্ত্র ভূমির বিসম বিভাজনের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পূর্ব-মধ্যকালে ব্যক্তিগত ভূস্বামিত্বের সিদ্ধান্তের বিকাশে এই ব্যবস্থা সহায়তা করেছিল।

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সুরু করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভূমিস্বত্বের উপর আলোকপাতকারী ধর্মশাস্ত্রগুলিতে যেসমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়, তাতে সমষ্টিগত অধিকারের অতি সাধারণ অধিকারকে সেগুলি যথেষ্ট সমর্থন জানিয়েছে, যদিও এই দুই প্রকার অধিকারকে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। মধ্যযুগীয় ভাষ্যকার ও আধুনিক ঐতিহাসিক আজ্ পর্যন্ত এই পরস্পর বিরোধী বিধানের মধ্যে সঙ্গতিস্থাপন করতে পারেন নি। কিন্তু পূর্ব-মধ্যকালীন ভূমি বিতরণ প্রথার আলোচনা করলে এই পরস্পর বিরোধীতার মীমাংসা সম্ভব হতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানার ফলেই অনুদানভোগী তার জমি কৃষকদের ইজারা দিতে পারত এবং রাজকীয় ভূস্বামিত্বের নিয়মের ফলেই রাজা পুরোহিত, মন্দির, সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদের তাদের রাজ-সেবার পরিবর্তে অনুদানরূপে ভূমিদান করতে পারতেন। অন্যথায় আমরা একই জমির উপর বিভিন্ন ব্যক্তির চার-দফা অধিকারের কারণ কি ভাবে নির্দেশ করতে পারি? শিলালিপি থেকে জানা যায় যে কেবল ধর্মীয় প্রয়োজনেই ভূমি বিক্রয় অনুমোদিত ছিল এবং মধ্যযুগে মুদ্রার অভাবের কারণে কমপক্ষে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে জমির ক্রয়বিক্রয় সম্ভবপর হয় নি। আবার জমির উপর রাজার প্রভুত্বের সিদ্ধান্তের কারণে মধ্যযুগীয় রাজাগণ কৃষকদের উপর নানাপ্রকারের কর আরোপের বৈধ সুযোগ পেয়েছিলেন। এই দুটি সিদ্ধান্তই জমির উপর সংযুক্ত অধিকারকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে অনুদানভোগী ও বড় বড় ভূস্বামী বিস্তৃত গোচারণভূমি ও অনুরূপ অন্য সার্বজনিক ভূমিকে অনায়াসে নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করতে পারত। ফলে সাধারণ চাষী হয় কৃষিদাসে পরিণত হত অন্যথায় ভূস্বামীদের অসহায় নিরুপায় আশ্রিতরূপে জীবন অতিবাহিত করত। এইভাবে আমরা দেখি যে এই দুটি সিদ্ধান্তই মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভবে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

ভূমির উপর রাজার অধিকারের সিদ্ধান্ত সাধারণ ব্যক্তির ভূস্বামিত্বের সিদ্ধান্তের থেকে পৃথক কিছু নয়। অবশ্য রাজার অধিকার এবং রাজ্যের অধিকার এক জিনিস নয়। মধ্যযুগীয় ভারতীয় রাজা সমাজের হিতের জন্য নিজ ভূস্বামিত্বের ব্যবহার করেন নি বললেই চলে। প্রকৃতপক্ষে রাজা ছিলেন সবচেয়ে বড় ভূস্বামী এবং অন্যান্যরা ছিল তারই অধীনস্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ভূস্বামী। ভূস্বামীদের মর্যাদাসূচক

ক্রমপর্যায়গুলির মধ্যে রাজা, স্বামী, কর্ষক, এই তিনটি উল্লেখযোগ্য। ভূমি-সম্বন্ধে এদের দায়িত্ব কোথাও না কোথাও সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের এই সিদ্ধান্ত জে. ডি. এম. ডেরেটের সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলে। ডেরেটের মতে ভারতীয় স্মৃতিকারগণ এ কথা ধরে নিয়েছিলেন যে স্বামিত্বের পৃথক পৃথক অভিব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু রাজার স্বত্ব, ভূস্বামীর স্বত্ব, ইজারাদার কৃষকের স্বত্ব এবং এমন কি দখলদার বন্ধক-ধারীর স্বত্ব ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্য 'সমপতি' শব্দটিই প্রয়োগ করা হত।[১] একই জমির উপব বিভিন্ন পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অধিকার থাকত, এব পরিচয় ৭ম-৮ম শতাব্দীর আশরাফপুব তাম্রপট অনুদানপত্র থেকে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গে প্রদত্ত এই অনুদানগুলি থেকে জানা যায় যে একটি জমির উপভোক্তা ছিল শর্বান্তর এবং সেটির চাষ কবত শিখর ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ, সেই জমিটি রাজা সংঘমিত্র নামে একজন বৌদ্ধ সাধুকে দান করেছিলেন।[২] স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে সাধুকে দান করার পূর্বে বাজার, শর্বান্তর ও শিখরসহ অন্যান্য কৃষকদের কমপক্ষে এই তিন পক্ষের পৃথক পৃথক প্রকৃতির অধিকার ঐ জমিটির উপর ছিল

ভারতীয় ভূসম্পত্তিব ব্যবস্থাপনা মধ্যযুগীয় ইউরোপে প্রচলিত সেই নিয়মটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যাব ফলে একই ভূমির উপর বিভিন্ন পক্ষের এবং একের উপর আরেকের অধিকার আরোপের সুযোগ ছিল।[৩] 'চাষী যে (সাধারণ পুরুষানু-ক্রমে) জমিচাষ করে ও ফসলসংগ্রহ করে, তার প্রত্যক্ষ মালিক যাকে সে কর প্রদান করে, এবং যে ইচ্ছামত যে-কোনো পরিস্থিতিতে চাষীর কাছ থেকে জমিটি ফেরত নিতে পাবে, আবার মালিকেরও মালিক এবং এইভাবে সামন্ততন্ত্রেব ধাপের পর ধাপ কতই না লোক যারা একই জমি সম্বন্ধে বলতে পারে এবং সমান বৈধতার সঙ্গে বলতে পারে যে 'এই জমি আমার'।[৪] পূর্ব-মধ্যকালীন ভারতে ইউরোপের ন্যায় তত অধিক সংখ্যায় একই জমির অধিকারী সম্ভবতঃ ছিল না; কিন্তু তাদের অধিকার আইনের দিক থেকে বৈধ ছিল এবং এইদিক থেকে তখনকার অবস্থা সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপেব অনুরূপ ছিল।

কিন্তু মুসলমানদের আমলে ভারতে ভূমি-বিষয়ক অধিকার নিশ্চয়ই আলোচ্যকালের থেকে পৃথক ছিল। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজমুকুটের জমির (খালিস) প্রথা মুসলমান আমলের পূর্বে প্রচলিত ছিল না। এ কথা সত্য যে পরমার ও চাহমান রাজাদের দ্বারা নিজ নিজ খাস জমি (স্বভোগ) থেকে দানকরা জমিকে

১। বুলেটিন অফ দি স্কুল অফ দি ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজ xviii, ৪৮৯
২। মেমোয়ার্স অফ দি এসিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল i, নং ৬, পৃঃ ৯০, প্লেট 'এ' প ৮-৯
৩। মার্ক ব্লাক, ফিউডাল সোসাইটী, পৃঃ ১১৬
৪। ঐ

একপ্রকারের মুকুটজমি বলা চলতে পারে। কিন্তু তাঁদের সমকালীন অন্যান্য রাজা যেমন পাল, প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের দ্বারা প্রদত্ত অনুদানগুলি থেকে এ কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে রাজার নিজস্ব কোনো মুকুটজমি (রাজ-জমি) ছিল। বরং এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে রাজা তার রাজস্বের যে-কোনো অংশ থেকে জমি অনুদান দিতে পারতেন।

দ্বিতীয়তঃ মোগল বাদশাহদের প্রদত্ত জায়গীর বা 'মদদ্-এ-ময়াশ'ব দ্বারা প্রদত্ত অনুদানগুলির অধিকার ততটা বিস্তৃত ও সুদৃঢ় ছিল না, যতটা ছিল হিন্দু রাজাদের দ্বারা প্রদত্ত ধর্মীয় এবং এমন কি বৈষয়িক অনুদানগুলি। মোগল আমলের জায়গীরদারদের হিন্দু আমলের অনুদানভোগীদের মত, জমির উপর কোনো সত্ত্বাধিকার দেওয়া হত না, তাঁদের কেবল জমি ভোগ করার অধিকার দেওয়া হত। তার কারণ মোগল আমলে কেন্দ্রীয় অধিকার প্রাক্‌মুসলমানদের যুগ অপেক্ষা অনেক সবল ও প্রভাবশালী ছিল।

সবশেষে মুদ্রাভিত্তিক আর্থিক জীবন ও গ্রামীণ অঞ্চলে বাণিজ্যের বিকাশের ফলে মুসলমান শাসনকালে ভূমির উপর কৃষকদের অধিকারও সুদৃঢ় হয়েছিল। যদিও গুপ্তযুগের এবং পরবর্তীকালের স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে জমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্ধক রাখার অনুমতি দেওয়া হত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ নিয়মের ব্যবহারিক প্রয়োগ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে মুদ্রা ব্যবহারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরই সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার সুযোগ আরও বিস্তৃত হয়েছিল; কারণ কৃষকগণ এইকালে রাজস্ব বা কর ফসলের দ্বারা না দিয়ে, প্রধানতঃ মুদ্রার দ্বারাই দিত।

সব মিলিয়ে পূর্ব-মধ্যকালে ভূস্বামিত্বের প্রথার নিয়মগুলি শক্তিশালী বিকেন্দ্রীকৃত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। মুদ্রাভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিকাশের পরিণামস্বরূপ মোগল আমলে এই ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

৫

রাজনৈতিক সামন্ততন্ত্রের চরমোৎকর্ষকাল

(প্রায় ১০০০—১২০০ খ্রীঃ)

দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুর্জর-প্রতীহারসাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মৌর্যসাম্রাজ্যের পতন বা গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পরও উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য ততটা ছিন্নভিন্ন হয় নি। তুর্কী আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে এই বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌঁছেছিল। ১০৭৫ সালের কৈবর্ত বিদ্রোহের সময়ে সম্পূর্ণ বাংলাদেশ ও বিহার প্রায় দশটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এই রাজ্যগুলি নামেমাত্র পালসম্রাটের অধীনতা স্বীকার করত। পালদের স্থান সেনরা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সেনদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে অস্বীকার করেছিল মিথিলার কর্ণাটগণ এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের ঈশ্বরঘোষের বংশধরগণ এই কৈবর্ত বিদ্রোহকালে সেনদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। বিহারে দুটি নতুন রাজবংশের উদয় হয়েছিল—পীঠীব সেন এবং দক্ষিণ মুঙ্গেরস্থ জয়নগরেব গুপ্ত। এই সময়ে জাপলায় খয়রবাল রাজবংশ শাসন করত, এবা গাহবওয়ালদের সামন্ত ছিল।

গাহরওয়ালদের শাসন আধুনিক উত্তরপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত ছিল কিন্তু গোরখপুরের কলচুরিরা এদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মধ্যভারতের পূর্বাঞ্চল দুটি প্রধান রাজবংশের অধীনে ছিল। এদের মধ্যে একটি ডাহলের কলচুরি রাজবংশ যাদের রাজধানী ছিল ত্রিপুরীতে এবং দ্বিতীয় জৈজাকভুক্তির চন্দেল বাজবংশ। পরবর্তীকালে কলচুরিবংশ তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিমাংশের রাজধানী ছিল ত্রিপুবী, পূর্বাংশের রত্নপুর এবং উত্তরাংশের গোরখপুর।

রাজস্থান, মালব ও গুজরাটের অবস্থা ছিল আরও মন্দ। চাহমানবংশ পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ভরুচ, জাবালিপুর (দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপিত)সাকম্ভরী, নড্ডুল এবং রন্থম্বোরে পৃথক পৃথক ভাবে রাজত্ব করত। ভরুচ ও রন্থম্বোরের চাহমানগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীব প্রারম্ভে খ্যাতিলাভ করেছিল বটে কিন্তু তার আগে থেকেই এদের অস্তিত্ব ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুহিলগণ জাবালিপুরের চাহমানদের নিজ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে, প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে আরম্ভ করেছিল। আবার ১২০৭ থেকে ১২২৭-এর মধ্যে কোনো এক সময়ে, তারা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘোষণা করেছিল এবং ফলতঃ মেবার ও আঘাট কিছুকালের জন্য চালুক্যদের অধীনে চলে গিয়েছিল।[১] মেবারের আশেপাশের এলাকা এদের

১। এ. কে. মজুমদার, চৌলুক্যজ অফ গুজরাট, পৃঃ ১৫৩

অধীনে ছিল কিন্তু ১৩শ শতাব্দীব প্রথম দশকে এই অঞ্চলও স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে দিল্লী ও আজমীব ছিল তোমবদেব অধীন এবং বাজস্থানেব কিছু অংশে কচ্ছপঘাট বাজবংশেব প্রভুত্ব ছিল।

মালব ও তাব আশেপাশেব এলাকাব পবমাব শাসকগণ চাবটি শাখায় বিভক্ত হযে গিযেছিল। একটিব কেন্দ্র ছিল মালব, দ্বিতীযটিব আবু, তৃতীয়টিব ভিনমল এবং চতুর্থটিব কিবাডু। সকল শাখাই দ্বাদশ শতাব্দীতে বাজত্ব কবত। ভীম চালুক্যেব সময়ে আবু স্বাধীন হযে গিযেছিল। কিন্তু ভীম চালুক্য ১০৬২ খ্রীষ্টাব্দে পবমাবদেব পবাজিত কবে পুনবায নিজ প্রভুত্ব কাযেম কবেছিল। পবে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আবু চালুক্যবাজেব অংশ হিসাবেই বর্তমান ছিল, যদিও পবমাবগণ সামন্তরূপে সেখানে শাসন কবাব অনুমতি পেযেছিল।[১] কিন্তু ভীমেব সময়েই ভিনমল স্বাধীন হযে গিযেছিল।[২] কিবাডুকে প্রতিষ্ঠা কবাব গৌবব ছিল পবমাববাজ সোমেশ্ববেব। তিনি কুমাবপালেব অনুগ্রহে নিজ বাজ্যকে শক্তিশালী ও সুবক্ষিত কবতে পেবেছিলেন। ১১৫৬ সালেব কাছাকাছি তিনি জজক নামক একজন সদাবকে পবাজিত কবে তাব ১৭০০ ঘোডা কেডে নিযেছিলেন, এইভাবে তিনি তাঁব প্রভু কুমাবপালকে সাহায্য কবেছিলেন।[৩] চৌলুক্য শাসনেব ফলে উত্তব ও দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত গুজবাট ঐক্যবদ্ধ হযেছিল। কিন্তু ১২শ শতাব্দীব শেষে সেখানকার বঘেল সামন্তগণ গুজবাটে নিজেদেব স্বাধীন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত কবেছিল।

পাঞ্জাব ও হিমাচল বাজ্যগুলিব বিষযে যথেষ্ট তথ্য পাওযা যায নি। পাঞ্জাব ও ওহিন্দে শাসনকাবী শাহী বাজবংশকে ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে গজনীব মাহমুদ বিনষ্ট কবে দিয়েছিলেন। হিমাচলেব চম্বা অঞ্চলে সেখানকাবই এক স্বতন্ত্র বাজবংশ বাজত্ব কবতেন।

এইভাবে ক্যাবোলিংসাম্রাজ্যেব পতনেব পব পশ্চিম ইউবোপে যে পবিস্থিতিব উদ্ভব হযেছিল, গুর্জব-প্রতীহাবসাম্রাজ্যেব পতনেব পব পশ্চিম ও উত্তব ভাবতেব বাজনৈতিক পবিস্থিতিও প্রায তদনুরূপ। পার্থক্য শুধু এইটুকু ছিল যে ভাবতে অসংখ্য স্বতন্ত্র শাসকবংশ বর্তমান ছিল, তাব প্রমাণ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন ও অধিস্বামীর নামোল্লেখ ছাড়াই ভূমি অনুদানেব উল্লেখ থেকে পাওয়া যায।

এই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজ্যগুলি দশম থেকে ত্রযোদশ শতাব্দী অবধি ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে ঐ সময়টিকে 'সাম্রাজ্যের জন্য সংগ্রাম' এই আখ্যাটিকে সার্থক

১। ঐ, পৃঃ ৪৯-৫০

২। ঐ

৩। ঐ, পৃঃ ১১১

করে তুলেছিল। পালগণ কেবল যে কৈবর্তদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তাই নয়, বিহারের পশ্চিমাংশে নিজ আধিপত্য বিস্তারের জন্য তারা কলচুরি ও গাহরওয়ালদের সঙ্গেও সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। আবার ওদিকে কলচুরিগণ উড়িষ্যা, চন্দেল ও গাহরওয়ালের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। গাহরওয়ালগণ চাহমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং চাহমানরাজ পৃথ্বীরাজ চন্দেলদের একটি মুখ্য কেন্দ্র মহোবা অধিকাব করে নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে পবমাবগণ চন্দেলরাজ পরমর্দিনকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ১২শ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করবার জন্য চন্দেল, গাহরওয়াল ও চাহমানদের মধ্যে ঘোরতর ত্রিপক্ষীয় যুদ্ধ চলেছিল। ওদিকে মালব, গুজরাট ও রাজস্থানে, পরমার, চৌলুক্য ও চাহমানগণও নিজেদের মধ্যে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত থাকত। পরমারগণ কখনও কখনও হুণদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম কবেছে। মালব ও রাজস্থানের কিছু অংশ হুণদের অধীনে ছিল। কখনও কখনও চোলগণ এবং বিশেষ করে চালুক্যগণও উত্তর ভারতে অভিযান করত। ওদিকে বাংলার সেন ও ত্রিহুতের কর্ণাট, যারা চালুক্যদের সঙ্গে এসে উত্তর বিহাবে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারাও নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়েছিল। পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণশাহীবংশ এবং গুজরাটের চৌলুক্যগণ গজনীর মাহমুদের বিরুদ্ধে সাহসেব সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং চৌলুক্য, চাহমান ও গাহরওয়ালগণ মোহম্মদ ঘোরীব সঙ্গে সমরে অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই ছোট ছোট বাজ্যগুলির মধ্যে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। এর প্রশাসনিক এবং আর্থিক পবিণাম সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যদি আমরা স্মরণ রাখি যে আধুনিক প্রশাসনিক রাজ্যগুলির অনুরূপ আকারের তৎকালীন রাজ্য-গুলিকে সৈন্যবাহিনী, বিচারব্যবস্থা, রাজস্ববিভাগ, আরক্ষাবিভাগ, সামন্ত, পুরোহিত এবং মন্দির ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হত। স্বাভাবিকভাবেই চাষীদের উপর এর আর্থিক প্রভাব পড়েছিল এবং এইরূপ রাজ্যব্যবস্থা রক্ষায় তাদের কোন আগ্রহ থাকার কথা নয়।

এই ছোট ছোট রাজ্যগুলি কি ভাবে উদ্ভূত হয়েছিল ? কিন্তু ত রাজকুমারদের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের ফলে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্যগুলির উদ্ভব হয়েছিল, সামন্তদের ও রাজপদাধিকারীদের অনুদানরূপে ছোটবড় ভূমিদান করার ফলে। অনুদত্ত ক্ষেত্রের মালিক ক্রমশ নিজ প্রভাবপ্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে সামন্ত রাজারূপে আবির্ভূত হত। অবশ্য গুপ্ত ও গুপ্তোত্তরকালের অভিলেখে এরূপ প্রমাণ বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু ৭৫০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত অবশ্য পাওয়া যায় এবং ১০০০ থেকে ১২০০-এর মধ্যে বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

শিলালিপি থেকে এইরূপ অনুদানের প্রমাণ নবম শতাব্দী থেকেই পাওয়া যেতে থাকে এবং একাদশ শতাব্দীর সুরুতে এদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদের প্রদত্ত অনুদানের দলিলপত্র সুরুতে ভূর্জপত্র বা কাপড়ে প্রস্তুত করা হত এবং তার ফলে সেগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে গুজরাটে সামন্তদের বিভিন্ন প্রকাব অনুদান দেবাব জন্য ভূর্জপত্রেব ব্যবহার করা হয়ে থাকত।[১] এবং সম্ভবতঃ পূর্বেও ভূর্জপত্রেব ব্যবহার প্রচলিত ছিল। গুপ্তকালের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে অনুদানেব দলিল দস্তাবেজেব জন্য তাম্রপত্র বা কাপড়ের ব্যবহারের বিধান দেওয়া হয়েছে।[২] সামন্ত ও বাজপদাধিকাবীদেব দেয় অনুদান পুণ্যার্জনের জন্য প্রদত্ত হত না, কাজেই এই সকল অনুদানপত্র কাপড়ে প্রস্তুত হত। কিন্তু দশম শতাব্দী শেষ হতে হতে রাজপদাধিকারী ও সামন্তদের শক্তি এত বেড়ে গিয়েছিল যে তারা চিরস্থায়ীরূপে অনুদানলাভেব জন্য কোনো টেকসই বস্তুতে দলিল লেখাবার জন্য ইচ্ছুক হয়েছিল।

রাজসেবার পরিবর্তে অনুদানলাভেব অধিকাংশ দৃষ্টান্ত উড়িষ্যা এবং গুর্জর-প্রতীহাবসাম্রাজ্যেব ধ্বংসাবশেষেব উপব প্রতিষ্ঠিত আধ ডজন বাজ্যে পাওয়া যায়। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বিহার ও বাংলায় পালশাসনেব শেষ দিনগুলিতেও এরূপ অনুদান খুব কমই পাওয়া যায়। তৃতীয় বিগ্রহপালেব শাসনকালে (১০৫৫-৭০) একজন উচ্চ-রাজপদাধিকারীকে ভূমি অনুদান দেবাব পবোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বাজভৃত্য বা বিধেয় বলে বর্ণিত ঘণ্টুষ নামক একজন ব্রাহ্মণ পদাধিকারী বিগ্রহপালের অনুমতি নিয়ে নিজেব হল (অধীনস্থ ভূমি) থেকে ভূমিদান করেছিল।[৩] সম্ভবতঃ এই ভূমি তার সেবাকালের অবধি পর্যন্ত পালবাজগণ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল। পালরাজ্যের আবও একটিমাত্র শিলালিপি থেকে অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেটি হল কামরূপের বৈদ্যদেব কর্তৃক প্রদত্ত তাম্রপত্রে ক্ষোদিত একটি অনুদানপত্র। একাদিক্রমে পালবংশের তিনপুরুষ ধরে অর্থাৎ বিগ্রহপাল, রামপাল ও কুমারপালের শাসনকালে অর্থাৎ ১০৫৫ থেকে ১১২৫ পর্যন্ত এই বৈদ্যদেবের বংশজগণ মন্ত্রিরূপে রাজসেবা করেছিল। কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব পালবংশের শেষ দিনগুলিতে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি প্রাক্‌জ্যোতিষপুরে নিজ প্রভুর অনুমতি ছাড়াই দুটি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[৪] এই গ্রাম দুটির প্রথম মালিক ছিল গঙ্গাধর ভট্ট[৫],

১। লেখপদ্ধতি, পৃঃ ৭
২। যাজ্ঞঃ i, ৩১৮-২০ এবং বৃহস্পতি. ব্যবহারময়ূখ গ্রন্থের ২৫-৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
৩। এ. ই. xxix, নং ৮, প ৪৯-৫১
৪। এ. ই. ii, নং ২৮, প্লেট ২ 'বি', প ১৫
৫। ঐ

সে এই গ্রাম দুটিকে হয় পালরাজা অথবা তাঁর কামরূপনিবাসী মন্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছিল। পালরাজাদের কাছ থেকে একের পর এক অনুদান পাবার ফলে এ মন্ত্রিপরিবার নিজেদের ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি কবতে পেরেছিল এবং অবশেষে তারা পালদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেড়িয়ে গিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। কিন্তু সাধারণভাবে কৈবর্তদের দেওয়া অনুদান ছাড়া পালদের অধীনস্থ অন্যান্য রাজপদাধিকারী বা সামন্তদের ভূমি অনুদান দেওয়াব কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। সম্ভবতঃ পালদের আমলে সামন্তদের শ্রেণীসংখ্যা বেশি ছিল না এবং কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী ও সুব্যবস্থিত ছিল; কারণ আমরা দেখি যে একই রাজবংশ প্রায় চারশ বছর ধরে রাজত্ব করে গিয়েছে। তা ছাড়া পালদের সাম্রাজ্যে রাজপদাধিকারীদেব যে-কোন মধ্যযুগীয় রাজ্যের রাজপদাধিকারীদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। ফলে অল্পসংখ্যক কোনো রাজকর্মচারী কখনও এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি যে তারা তাম্রপটে অনুদান লেখাবার দাবি করতে পারে।

দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে যেখানে পালদের সামন্তবর্মণগণ রাজত্ব করত সেখানকার অবস্থা অন্যরকম ছিল। একটি শিলালিপিতে ভবদেব দাবি করেছেন যে তিনি নিজ সৈন্যবলের সাহায্যে সম্পত্তি এবং মেধার সাহায্যে বিদ্যা বৃদ্ধি কবেছেন।[১] ভবদেবের পিতামহ বাংলার কোনো রাজার মন্ত্রী ছিলেন[২] এবং ভবদেব স্বয়ং আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে হরিদেববর্মণের মন্ত্রী হয়েছিলেন।[৩] মনে হয় যে তাঁর অধিস্বামী তাঁর দৈনিক সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ভূমি অনুদান দিয়েছিলেন। ভবদেবের পূর্বপুরুষদেরও গৌড়ের রাজা পুরস্কারস্বরূপ ভূমিদান করেছিলেন।[৪] সেনরাজবংশেব রাজাদেব কর্তৃক রাজসেবার পরিবর্তে ভূমি অনুদান দেবাব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আমরা এ কথাও জোর করে বলতে পাবি না যে সেনরাজাদের প্রত্যক্ষরূপে কোনো সামন্ত ছিল কিনা। কিন্তু সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভের বিশ্বরূপসেন'র একটি অনুদানপত্র থেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। এর থেকে জানা যায় যে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে হলায়ুধ নামক একজন ব্রাহ্মণ দু-জন ব্যক্তির-কাছ থেকে কিছু জমি কিনেছিল।[৫] পরে সূর্যসেন তাঁর জন্মদিনে সেই জমি ঐ ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন।[৬] বৈষয়িক প্রয়োজনে জমি খরিদ-বিক্রয়ের এটি একটি উদাহরণ। সম্ভবতঃ এই জমি কুমার সূর্যসেনের জায়গীরের অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া এই জমি

১। এ. ই. iii, নং ৪, শ্লোক ১২
২। ঐ, শ্লোক ৯
৩। ঐ, শ্লোক ১৬
৪। ঐ, শ্লোক ৬-৭
৫। ই. ব. iii, নং ১৬, প ৫৩-৪
৬। ঐ

ক্রয় করা বা অনুদান দেওয়া চলত না। কিন্তু তারই ক্রীত জমি তাকেই দান করায়, তাকে জমির মূল্য ফেরত দেওয়া হয়েছিল কিনা তা সঠিক জানা যায় না। আবার দেখা যাচ্ছে যে হলায়ুধের ক্রীত অন্য দুটি ভূখণ্ড কুমার পুরুষোত্তমসেন'র ভোগাধীন ছিল, পরবর্তীকালে বিশ্বরূপসেন'র শাসনকালের চতুর্দশ বর্ষে কুমার ঐ ব্রাহ্মণকে সেই জমি দান করেছিলেন।[১] প্রতীয়মান হয় যে এই সেন কুমারদ্বয়কে রাজা তাদের নিজস্ব জায়গীররূপে কিছু জমি দিয়েছিলেন এবং সেই জমির উপর তাদের অধিকার দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল—প্রথম তাঁদের প্রজা তাঁদের অনুমতি ব্যতীত ঐ জমি খরিদ-বিক্রি করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়—প্রজাদের দ্বারা প্রদত্ত ধর্মীয় অনুদান তখনই বৈধ বলে স্বীকৃত হবে যখন রাজপরিবারের প্রধান সনদের দ্বারা সেটি ঘোষিত করবেন। মহাসান্ধিবিগ্রহিক নানীসিংহও সম্ভবতঃ জায়গীর হিসাবে প্রাপ্ত নিজ অঞ্চলে এইরূপ অধিকারই উপভোগ করতেন, কারণ তিনিও হলায়ুধকে দুইখণ্ড জমি একখণ্ড চাষের এবং অন্যখণ্ড বাসগৃহের জন্য দান করেছিলেন। কিন্তু ঐ দুইখণ্ড জমিই হলায়ুধ অন্য দুই ব্যক্তির কাছ থেকে কিনেছিলেন।[২] এইভাবে এই অনুদানপত্রটি থেকে জানা যায় যে সেনরাজা তাঁর পরিবারস্থ ব্যক্তিদের এবং রাজপদাধিকারীদের ভূমি অনুদান দিয়ে থাকতেন। আসামের মধ্যযুগীয় অনুদানপত্রে বিভিন্ন প্রকার সামন্তদের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু রাজপদাধিকারীদের সংখ্যা নগণ্যরূপে প্রতিভাত হয় এবং এদের মধ্যে কাউকেও ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছে এমন কোন প্রমাণ কোন শিলালিপি থেকে পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগে উড়িষ্যা ভৌগোলিক কারণেই অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং অনুদানপ্রথার ফলে রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাজসেবার পরিবর্তে উড়িষ্যায় যত ভূমিদান দেওয়া হয়েছে বাংলা, বিহার ও আসামে সম্মিলিতভাবেও তত ভূমি অনুদান দেওয়া হয় নি। উড়িষ্যায় মন্ত্রী, জ্যোতিষী, রাণক (উচ্চতর শ্রেণীর সামন্ত) এবং সামন্ত (সৈনিক সেবাকারী সামন্ত) সকলকেই যে-কোনো শুভ উৎসব উপলক্ষে ভূমি অনুদান দেওয়া হত। সোমবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহাভবগুপ্ত (১০০০-১৫) তাঁর রাজ্যে বসবাসের জন্য শ্রাবস্তীমণ্ডল থেকে আগত ভট্টব্রাহ্মণের পৌত্র রাণক রচ্ছুকে একটি গ্রাম অনুদানরূপে দিয়েছিলেন।[৩] এই রাজার সামন্তদের মধ্যে রাণকের স্থান খুব উঁচুতে ছিল, কারণ অনুদানপত্রে এঁর স্থান রানীর

১। ঐ, প ৫৬-৮
২। ই. ব. iii, নং ১৬, প ৫৪-৫
৩। এ. ই. iii, নং ৪৭, প্লেট 'এক', প ২৮-৪২

ঠিক পরেই উল্লেখ করা হয়েছে (রাজ্ঞীরাণকরাজপুত্ররাজবল্লভাদিন্)।[১] অনুদান-পত্রে গ্রহীতাকে সেই সমস্ত অধিকার দেওয়া হয়েছে যা মধ্যযুগের অনুদানে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের দেওয়া হত। যদিও এই দান ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে দেওয়া হয়েছিল, তবু দানগ্রহীতার নামের সঙ্গে রাণক উপাধি সংযুক্ত হওয়ার ফলে অনুমিত হয় যে এই পুরস্কার প্রশাসনিক এবং সামরিক সেবার পরিবর্তেই তাকে দেওয়া হয়েছিল। এই অনুদানপত্র থেকে এ কথাও জানা যায় যে রাণক উপাধি সুরুতে রাজপরিবারের সদস্যদেরই দেওয়া হত কিন্তু এখন থেকে ব্রাহ্মণদেরও এই উপাধি দেওয়া হতে থাকল।

খিঞ্জলীর (ভূতপূর্ব বৌড়রাজ্যে অবস্থিত) ভঞ্জ রাজা যশোভঞ্জদেবের একটি তাম্রপত্র থেকে জানা যায় যে তিনি জগধরশর্মা নামক জনৈক জ্যোতিষীকে সব সাধাবণ অধিকারসমেত একটি গ্রামদান করেছিলেন[২] এবং তাঁর ছোট ভাই জয়ভঞ্জও সেই জ্যোতিষীকে একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৩] এই দুইটি অনুদানই দ্বাদশ শতাব্দীতে দেওয়া হয়েছিল। গাহরওয়াল ও সেনদের অনুদানপত্রে সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদের পংক্তিতে জ্যোতিষীদের স্থান অতি উচ্চে ছিল বলে মনে হয়। খিঞ্জলীর ভঞ্জরাজ্যেও তাঁদের উচ্চস্থান ছিল বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে পঞ্জিকা প্রণয়ন এবং সরকারী কার্যারম্ভের শুভ মুহূর্ত নিধারণ করার জন্যই তাঁদের ধর্মীয় অনুদান দেওয়া হত। খিঞ্জিঙ্গের ভঞ্জদের রাজ্যে দু-একজন ভঞ্জ রাজা মহাসামন্ত বট্ট নামক একজন সৈনিক সামন্তকে অনুদানরূপে গ্রাম দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রথমে রাজা বণভঞ্জ তাকে রাজসেবক হিসাবে (বিধেয়ী দৃষ্ট্বা) তাঁর আচরণের পুরস্কারস্বরূপ চতুঃসীমাসমেত বারটি গ্রামদান করেছিলেন। এই গ্রামগুলিতে চাট ও ভাটদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং ঐ গ্রাম-মধ্যে প্রাপ্য সমস্ত খনিজ-সম্পদও বট্টকে সমর্পণ করে দেওয়া হয়েছিল। এই অনুদানপত্রে তাকে মহাসামন্ত মুণ্ডিসুত বলা হয়েছিল, তাতে জানা যায় যে তার পিতাও মহাসামন্ত ছিল। দ্বিতীয় অনুদানপত্রে তাকে স্পষ্টভাবে সামন্ত মুণ্ডির পুত্র মহাসামন্ত বট্টরূপে অভিহিত করা হয়েছে।[৪] এখানেও সন্তোষজনকভাবে রাজসেবা করার পরিবর্তেই তাকে জায়গীর দেওয়া হয়েছিল ; এই জায়গীরে মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ বসতি ছিল।[৫] অনুদত্ত গ্রাম থেকে রাজা কোনো কর আদায় করতে পারতেন না বা উক্ত গ্রামে কোনোপ্রকার

১। ঐ, প ৩৩-৪
২। ঐ xviii, নং ২৯, প ১৯-২৯
৩। ঐ xix, ৪৩ এবং পাদটীকা ১
৪। ঐ, পৃঃ ১৬৮
৫। ঐ

প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিও করতে পারতেন না।[১] সামন্ত বা মহাসামন্তদের প্রদত্ত আর কোনো অনুদানের শিলালৈপিক প্রমাণ আমরা পাই না, কিন্তু এই প্রথার জন্যই উড়িষ্যায় ভূস্বামী শ্রেণীরূপে সামন্তদের উদ্ভব হয়েছিল।

বৃহত্তর গঙ্গরাজ্যে, যার মধ্যে তেলেগু ও তামিল উভয়ভাষী অঞ্চলই সম্মিলিত ছিল, রাজপদাধিকারীদের অনুদান দেওয়ার শিলালৈপিক প্রমাণ পাওয়া যায়। গঙ্গরাজ বজ্রহস্তের (১৩৩৮-৭০) অধীনস্থ দাবপরাজ নামক একজন পঞ্চবিষয়াধীপ[২] (পাঁচটি জেলার শাসক) নিজ কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রাজপুত্র বরকে পাঁচটি করমুক্ত গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[৩] সম্ভবতঃ দাবপরাজ তাঁর গঙ্গপ্রভুর কাছ থেকে কোনো বড় ভূখণ্ড পেয়েছিলেন। রাজপরিবারের সঙ্গে দাবপরাজের কোনো রক্তসম্বন্ধ ছিল না, কেননা তিনি চোল-কামাদিরাজের পুত্র ছিলেন।[৪] তা হলেও তিনি কারো অনুমতি ছাড়াই অনুদান দিয়েছিলেন। উচ্চ-রাজপদাধিকারীকে প্রত্যক্ষ অনুদানের প্রমাণ আমরা অনন্তবর্মণ চোডগঙ্গের শাসনকালে (১০৭৬-১১৩৮) পাই। তিনি নিজ এবং মাতাপিতার ধর্ম ও কীর্তির অতিবৃদ্ধির জন্য নিজ বিশ্বস্ত অধিকর্তা (আপ্তক্রিযায) চোডগঙ্গকে কলিঙ্গে একটি কুটীরসহ একটি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[৫] যদিও ধর্মীয় অনুদানপত্রের প্রযুক্ত শব্দাবলীর অনুরূপ শব্দ এখানেও প্রযুক্ত হয়েছিল তবু মনে হয় রাজসেবার পুরস্কার হিসাবেই অনুদান দেওয়া হয়েছিল।

গঙ্গরাজগণ বিশেষ করে নায়ক নামে অভিহিত সৈনিক পদাধিকারীদের রাজসেবার পরিবর্তে অনুদান দিয়েছিলেন। তৃতীয় বজ্রহস্তের শাসনকালে গণপতি-নায়ক নামক এক ব্যক্তিকে অন্ধ্রপ্রদেশে একটি গ্রাম অনুদান দেওয়া হয়েছিল।[৬] গ্রহীতার গোত্র বা প্রবরের উল্লেখ করা হয় নি এবং পরে আমরা যে অনুদানটির আলোচনা করব সেটির সঙ্গে এই অনুদানটির যে সাদৃশ্য আছে তার দ্বারা প্রতীয়মান হবে যে গণপতিনায়ক একজন মান্যগণ্য বৈশ্য ছিল। দ্বিতীয় অনুদানপত্র অনন্ত-বর্মণের পুত্র মধুকামার্ণবের অধীন গঙ্গসম্বৎ ৫২৬ সালে জারী করা হয়েছিল।[৭] এটিতে তিনটি গ্রামের একটি বৈশ্য অগ্রহার গঠন করে বৈশ্যজাতীয় মল্লিনায়কের পুত্র এরাপনায়ককে অনুদানরূপে দেওয়া হয়েছিল।[৮]

১। 'অকরত্বেন চ সর্ব্ববাধা বিবর্জ্জিতেন।' ঐ, পৃঃ ১৬৮
২। এ. ই. xxix, নং ২৬, প ২৬-৩৩
৩। ঐ iii, নং ৩১, প ৯-১৫
৪। ঐ
৫। ঐ, পৃঃ ১৭৪, প ৩০-৪
৬। মাদ্রাজ রিপোর্ট অন এপিগ্রাফি ১৯১৮-১৯, পরিশিষ্ট 'এ', নং ৩
৭। ঐ, নং ৫
৮। ঐ

দুঃখের বিষয়, মাদ্রাজ এপিগ্রাফিক রিপোর্টে অনুদানপত্রের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তা ছাড়া সেগুলির বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না ; কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে অগ্রহার শব্দটি এখানে উপযুক্ততর শব্দের অভাবেই করমুক্ত গ্রামের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বে এই অগ্রহার শব্দটি সাধারণতঃ কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অনুদান সম্পর্কে ব্যবহৃত হত। কিন্তু কোনো নায়ককে অর্থাৎ সৈনিক পদাধিকারীকে এই উদ্দেশ্যে গ্রামদান করার সার্থকতা কি ? যতদূর সম্ভব তাকে এই অনুদান দেওয়া হয়েছিল একটি নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য রক্ষা করে প্রয়োজন-কালে রাজ্যকে সাহায্য করার জন্য। অনন্তবর্মণ চোড়গঙ্গের একটি শিলালিপিতেও একজন নায়ককে অনুদান দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তার পাদোপজীবী মাধবকে একটি করমুক্ত গ্রাম চিরকালের জন্য দান করেছিলেন।[১] কেবল পাদোপজীবী বিশেষণ থেকে ঐ ব্যক্তির প্রকৃত পদমর্যাদা অনুমান করা কঠিন, কিন্তু তার পিতামহের নামের সঙ্গে নায়ক উপাধি সংযুক্ত থাকায় অনুমান করা যেতে পারে যে তাদের পরিবার গঙ্গরাজাদের কোনোপ্রকার সৈনিকসেবা প্রদান করেছিল। অতএব মাধব হয় গঙ্গদের সামন্ত অথবা রাজপদাধিকারী ছিল, কারণ পাল অনুদানপত্রে এই দুটি পদই পাদোপজীবী শব্দের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে গঙ্গশাসন সম্পূর্ণরূপে সামন্ততান্ত্রিক হয়ে গেল, কেননা ১২৯৫ সালে কোনার্ক মন্দিরনির্মাতা দ্বিতীয় নরসিংহদেব নিজ মন্ত্রী কুমার মহাপাত্র ভীমদেবশর্মাকে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে দুটি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[২] এই অনুদানেরই অংশরূপে গ্রহীতাকে পৃথক পৃথক গ্রাম থেকে একজন শ্রেষ্ঠী, একজন তাম্বুলী, একজন তাম্রকার এবং একজন কাংস্যকার দেওয়া হয়েছিল।[৩] এই ব্যক্তিদের নিযুক্ত করায় গ্রামে শিল্পী ও কারিগরের অভাবও দূর হয়েছিল। সম্ভবতঃ এদের ভরণ-পোষণের জন্য কিছু জমি দেওয়া হয়েছিল। কেননা ঐ অনুদানপত্রেই দ্বিতীয় নরসিংহদেব নাড়ি নামক জনৈক তাম্রকারকে অর্ধবাটিকা জমিদান করেছিলেন। উপরে যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা অবশ্য এমন কিছু বড় নয়। কিন্তু যতক্ষণ না কোনো প্রতিকূল প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে উড়িষ্যার মধ্যযুগীয় রাজবংশ—ভঞ্জ, সোমবংশীয় এবং বৃহত্তর গঙ্গ—এঁরা সকলেই সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদের বেতন ও পুরস্কারস্বরূপ ভূমি অনুদান দিতেন।

১। ই. এ. xviii, ১৩১-২, প ১০৯-১৩
২। ঐ
৩। জা. এ. সো. বে. lxv, ভাগ ১, পৃঃ ২৫৪-৬, প ১২১

বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল রাজ্যে পদাধিকারীদের ভূমি অনুদান প্রদানের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ধঙ্গের শাসনকালে (৯০২-১০০২) আমরা প্রথম চন্দেল অনুদানের দৃষ্টান্ত পাই। এই অনুদানটিতে রাজা ব্রাহ্মণ ভট্ট যশোধরাকে সকল সাধারণ অধিকারসহ গ্রামদান করেছিলেন।[১] দ্বিতীয় একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় দানগ্রহীতা ছিলেন মহাপুরোহিত ও ন্যায়াধীশ। ফলে অনুমান করা যেতে পারে যে রাজসেবার জন্যই তাকে দান দেওয়া হয়েছিল। চন্দেলদের প্রশাসনে কায়স্থ নামক পদাধিকারীগণ বহু অনুদান লাভ করেছিল। কীর্তিবর্মার (১০৭৩-৯০) একটি অনুদানে বাস্তব্য কায়স্থ রাজপদাধিকারী জাজুককে দবদণ্ড নামক একটি সমৃদ্ধ গ্রাম রাজকীয় অনুদানরূপে প্রদান করার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] ভোজবর্মার অজয়-গড শিলালিপি থেকে জানা যায় যে গঙ্গের উত্তরাধিকারী জাজুককে সরকারের সমস্ত বিভাগগুলির দেখাশোনা করার জন্য ঠক্কুরের পদে নিযুক্ত করেছিলেন।[৩] রাজা কীর্তিবর্মা পীতাদ্রিতে (স্পষ্টতঃই কোন যুদ্ধে) সংকটে পড়লে জাজুকের উত্তরাধিকারী মহেশ্বর তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন, প্রতিদানে রাজা তাঁকে পুরস্কারস্বরূপ একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৪] পূর্বে ভোজবর্মার যে শিলালিপিটির উল্লেখ করা হয়েছে সেটিতে এই দুটি অনুদানেরই উল্লেখ আছে। তাহাতে ত্রৈলোক্যবর্মণের শাসন-কালে প্রদত্ত একটি অনুদানেরও উল্লেখ আছে।[৫] তিনি এই কায়স্থ পরিবারেরই একজন বাসেককে জয়পুর (বর্তমান অজয়গড) দুর্গের একটি বিশিষ্ট পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে অনুদানরূপে একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৬] স্পষ্টতঃ এই গাম তাকে দেওয়া হয়েছিল তার সৈনিকসেবার প্রতিদান হিসাবে। কারণ বাসেক ভোজক নামক একজন বিদ্রোহীকে পরাজিত ক'রে তার রাজ্যের কিছু অংশ জয় করেছিলেন, চন্দেলরাজ্যে শান্তিস্থাপন করেছিলেন এবং দেশকে বিদেশী শত্রুর আক্রমণভয় থেকে মুক্ত করেছিলেন।[৭] এই পরিবারের ব্যক্তিগণ চন্দেল রাজা গণ্ডের কাল থেকে ভোজবর্মণের শাসনকাল পর্যন্ত ২৮০ বছর ধরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারীপদে নিযুক্ত ছিল।[৮] কিন্তু সাধারণতঃ তারা সামরিক পদেই নিযুক্ত ছিল বলে

১। ই এ. xvi, ২০৪, প ৬-১১
২। ঐ xxx, নং ১৭, শ্লোক ৬
৩। 'ঠক্কুর ধর্মাযুক্তঃসর্বাধিকরণেষু সদানিযুক্তঃ।' ঐ I, নং ৩৮, II, শ্লোক ৬
৪। এ. ই. xxx, নং ১৭, শ্লোক ৮
৫। এই অনুদানসম্বন্ধীয় কোন তাম্রপট অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি।
৬। এ. ই. xxx, নং ১৭, শ্লোক ১৬-৭
৭। ঐ, শ্লোক ৬-২০
৮। ঐ, শ্লোক ১৯-২০

মনে হয়। কারণ এই পরিবারকে প্রদত্ত তিনটি অনুদানের মধ্যে দুটিই সামরিক-সেবার পুরস্কারস্বরূপ দান করা হয়েছিল।

চন্দেলদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ তথা অন্যান্যদের অনুদানের ক্ষেত্রে সামরিকসেবাই প্রাধান্য পেয়েছিল। সেনাপতি কেহ্লনের পুত্র ব্রাহ্মণ সেনাপতি অজয়পালকে ১১৮৭ সালে পরমর্দিন একপদ ভূমি অনুদান দিয়েছিলেন[১] আবার তিনি তার রাউত-পুত্র সোমরাজকে[২] এবং রাউত পদ পায় নি এমন মহারাজ ও বৎসরাজ নামক দুই পুত্রকে এক-এক পদ জমিদান করেছিলেন। সেনাপতি ও তার রাউত পুত্রকে প্রদত্ত জমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু অন্য এক অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে ১১৭১ সালে তিনি সেনাপতি মদনপালশর্মাকে একটি সম্পূর্ণ গ্রামদান করেছিলেন।[৩] মদনপালেব পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ ঠক্কুর উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন, এখানে এ কথা স্মবণীয় যে এই উপাধি মধ্যযুগের উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থাদি সকল জাতির রাজপদাধিকারীদেবই প্রদান করা হত। সাধারণভাবে সকল চন্দেল অনুদানপত্রে যেমন দেখা যায় যে সর্বপ্রকার ভবিষ্যৎ, অতীত ও বর্তমান কর থেকে মুক্ত কবে দেওয়া হত, তেমনিভাবে এই সেনাপতিকেও গ্রামটি দান করা হয়েছিল।[৪] কিন্তু ব্রাহ্মণ সৈনিক পদাধিকারীদের প্রদত্ত উপরোক্ত দুটি অনুদানই সৈনিকসেবার জন্য নয়, বরং পুণ্যার্জনের জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১২০৪ সালে ত্রৈলোক্যবর্মণ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানটির প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত রাউতসামন্তের উত্তরাধিকারীগণকে মৃত্যুকবৃত্তৌ (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিব পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য) রূপে একটি গ্রামদান করেছিলেন কেননা এই রাউতের পিতা এবং পিতামহও রাউত ছিল এবং সে নিজে তুরস্কদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।[৫] এই রাজা এই রাউত পরিবারকে পুনরায় ১২০৫ সালে জমিদান করেছিলেন।[৬] গ্রহীতার গোত্রের উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু জাতির উল্লেখ করা হয় নি। সম্ভবতঃ সে ক্ষত্রিয় ছিল। নায়ক কুলশর্মা একজন গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক পদাধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা নায়ক, পিতামহ রাউত এবং প্রপিতামহ রাণক ছিলেন। ১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যবর্মণ তাঁকে সাধারণভাবে চন্দেল অনুদানে প্রদত্ত অধিকারীসহ ভূমিদান করেছিলেন।[৭] যদিও গ্রহীতা ছিলেন ব্রাহ্মণ, তবুও

১। এ. ই. iv, নং ২০, প ১৯
২। ঐ, প ৬৬-৭
৩। ই. এ. xxv, ২০৫, প ১৬-৯
৪। ঐ, প ১১
৫। এ. ই. xvi, নং ২০, i, প ৭-১১
৬। ঐ ii, প ৭-১২
৭। ঐ xxxi, নং ১১, প ১২-৮

এমন উল্লেখ নেই যে এই অনুদান কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অথবা ধর্মীয় উপলক্ষে দান করা হয়েছিল। অতএব এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এটি বংশানুগত ব্রাহ্মণ সৈনিক পদাধিকারীকে, বৈষয়িক প্রয়োজনে, তাম্রপটে অঙ্কিত করে জমির সনদরূপে দেওয়া হয়েছিল। ত্রৈলোক্যবর্মণের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী বীরবর্মণ এমন একজন রাউতকে, যার পিতা পিতামহ সকলেই রাউত ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাক্রম প্রদর্শনের জন্য ১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি গ্রামদান করেছিলেন।[১] যদিও অনুদানটির উদ্দেশ্য দাতার মাতাপিতার পুণ্যবৃদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে[২], কিন্তু গ্রহীতার গোত্রের উল্লেখ[৩] থেকে এ কথা জানা যায় যে সে নিশ্চিতরূপে ব্রাহ্মণ ছিল। অবশেষে আমরা এই বীরবর্মণ কর্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় অনুদানের উল্লেখ করতে পারি। তিনি ১২৮৮ সালে বলভদ্র মল্লয় নামক একজন পরম পরাক্রমশালী সামরিক পদাধিকারীকে একটি গ্রামদান করেছিলেন। ইনি ছ-জন রাজা, তুর্কী ও কাশ্মীরের রাজা ইত্যাদিকে পরাস্ত করেছিলেন।[৪] অনুদানের উদ্দেশ্যে দাতা এবং দাতার পিতামাতার পুণ্যবৃদ্ধি বলা হয়েছে।[৫] কিন্তু সন্দেহ নেই যে গ্রহীতা অব্রাহ্মণ ছিল এবং সামরিক শৌর্য প্রদর্শনের জন্যই তাকে গ্রামদান দেওয়া হয়েছিল।

রাজসেবার পরিবর্তে ভূমিদানের বহুল প্রচলন ছিল চন্দেল রাজত্বে এবং মহাপুরোহিত ন্যায়াধীশ, দুর্গাধিপতি, সেনাপতি, নায়ক, রাউত ইত্যাদিদের রাজসেবার পরিবর্তে জমি অনুদান দেওয়া হত। এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে রাজসেবার জন্য রাউতদের নির্দিষ্টসংখ্যায় ঘোড়া অথবা সৈন্য রাখতে হত কিনা। কিন্তু অধিকাংশ অনুদানই সৈনিকসেবার জন্য প্রদত্ত হয়েছিল বলে মনে হয়। চন্দেলরাজ্যে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল তার আরও প্রমাণ এই যে এদের রাজ্যে ২১টি স্কন্ধাবার স্থাপিত হয়েছিল।

ত্রৈলোক্যবর্মণের শাসনকালে ১২১২ সালে বন্ধকরূপে (বিত্তবন্ধ) গ্রামদানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজগুরুর পুত্র শৈবশিক্ষক শান্তিশিব একজন রাণককে সম্ভবতঃ একটি বৃহৎ অঙ্কের (যার উল্লেখ নেই) টাকার বদলে বিত্তবন্ধরূপে গ্রাম দিয়েছিলেন।[৬] যদি রাণকটি কোনো ব্যবসায়ে লিপ্ত না থেকে থাকে, এবং যার সম্ভাবনা কম, তা হলে এই বৃহৎ অঙ্কের অর্থের উৎস রাজা কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি থেকে আদায়ীকৃত,

১। ঐ xx, নং, ১৪ সি, প ৩-১৪
২। ঐ
৩। ঐ
৪। এ. কানিংহাম—আ. সা. রি. xxi, ৭৫
৫। ঐ
৬। এঃ ই. xxv, নং ১, প ১০-৪

রাজস্ব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না ? এই রাণক একজন উঁচুদরের সর্দার ছিল, কারণ তার অধীনে একজন ঠক্কুর ছিল, যার উপর বিত্তবন্ধ গ্রামটি দখল করা ও দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছিল।[১] চন্দেলরাজ্যে এইরূপ বন্ধকীকৃত ভূমির সঙ্গে ১২২৭-এ জৌনপুরে উৎকীর্ণ একটি দস্তাবেজের তুলনা করা চলে। এদিকে একজন রাণক অন্য দু-জন রাণককে ২২৫০ দ্রম্ম ঋণদানের বদলে নিজের খেত বন্ধক দিয়েছিল।[২] এই রাণকদের ভূসম্পত্তি সম্ভবতঃ জৌনপুরের তৎকালীন শাসন-কর্তা গাহরওয়াল রাজার কাছ থেকে পাওয়া। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে উপরের দুটি দৃষ্টান্তেই রাণকগণ মহাজনী কারবারে টাকা খাটিয়ে নিজেদের ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ পেয়েছে। এইরূপ বিত্তবন্ধে বন্ধক রাখা জমি ঋণদাতার ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত বিত্তবন্ধে বন্ধকে রাখা জমির উপর ঋণদাতার অধিকার, জমি থেকে রাজস্ব আদায় অথবা জমির ফসল ভোগ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[৩] কিন্তু ঋণগ্রহীতা ঋণশোধ করতে না পারলে ঋণদাতা জমিটি সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে নিতে পারত।

বিত্তবন্ধের এই দুটি উদাহরণ থেকে এবং বিশেষ করে চন্দেলরাজ্যের উদাহরণটি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে স্থানীয় শাসক তার প্রভুর কাছ থেকে প্রাপ্ত জোতজমি অন্যকে অনুদানরূপে দিতে পারত। মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ১২শ শতাব্দী থেকে ফ্রান্স এবং জার্মানীতে এইরূপ বন্ধককে জায়গীর বলা হত এবং ঋণদাতা হত প্রভু এবং গ্রহীতা হত সামন্ত।[৪] কিন্তু মধ্যযুগীয় ভারতে ঋণী ও ঋণদাতার এইরূপ সম্পর্ক ছিল না।

উত্তরপ্রদেশে রাজপদাধিকারীদের ভূমি অনুদান দেবার প্রথম শিলালৈপিক প্রমাণ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে গোরখপুর জেলায় পাওয়া যায়। সামন্ত ও মন্ত্রী কৃত-কীর্তির পুত্র সচিব মদোলি দ্বারা প্রদত্ত একটি ধর্মীয় অনুদানে বলা হয়েছে যে সে যে গ্রাম দেবী দুর্গাকে অনুদানরূপে দিয়েছে, সেটি সে রাজা জয়াদিত্যের (সম্ভবতঃ গুর্জর-প্রতীহারদের কোনো সামন্ত) অনুগ্রহে লাভ করেছিল।[৫] কিন্তু রাজসেবার পরিবর্তে প্রদত্ত কোনো অনুদানের প্রমাণ আমরা প্রতীহার রাজত্বে যশোপালের সময়ের পূর্বে পাই না। যশোপাল সম্ভবতঃ গুর্জর-প্রতীহার রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন। ১০৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই রাজা এলাহাবাদের নিকটবর্তী 'করা' স্কন্ধাবারে অবস্থান করছিলেন, তখন তিনি কৌসাম্বীমণ্ডলে পভোসনিবাসী মাথুর

১। ঐ, পৃঃ ৩, প ২০-১
২। জা. এ. সো. বে. xix (১৮৫০) ৪৫৫-৬, ঋণদাতার অর্থে 'ধনিক' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে।
৩। এ. ই. xxv, নং ১, প ১৯
৪। ফিউডালিজম্, পৃঃ ১১০
৫। 'গ্রামোঽয়ং রাজপ্রসাদসংপ্রাপ্তঃ'; এ. ই. xxi, ১৩০-১, প ৭-১২

বিকটকে অনুদানরূপে একটি গ্রাম দিয়েছিলেন।[১] অব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানরূপেই এটিকে চিহ্নিত করতে পারা যায়। গ্রহীতা সম্ভবতঃ জাতিতে কায়স্থ ছিল এবং তার পূর্বপুরুষেরা সম্ভবতঃ মথুরার অধিবাসী ছিল। মনে হয় মাথুর কায়স্থ-গণ কয়েকটি রাজবংশের সেবা করেছিল। চাহমান রাজা হাম্বীরের মন্ত্রী ছিলেন মথুরার কটরি-কায়স্থবংশোদ্ভূত। ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এই পরিবারের একটি বংশলতিকা উৎকীর্ণ আছে।[২] প্রতীহারদের পরে যারা উত্তর-প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করেছিল সেই গাহরওয়ালগণ কর্তৃক কায়স্থ পদাধিকারীদেব অনুদান দেবার কোনো দৃষ্টান্ত এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। কিন্তু অন্যান্য সামন্ত ও আমলাদের তাঁরা প্রচুর অনুদান দিতেন তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

চন্দেলদের বিপরীতে গাহরওয়ালরা সাধারণতঃ অসামরিক পদাধিকারীদেরই গ্রাম অনুদান দিতেন। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদেব দান দেওয়া হত, আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি অনুদান মহাপুরোহিত জাগুক বা জাগুশর্মা ও তাঁর পুত্র প্রহ্লাদ-শর্মা পেয়েছিলেন। জাগুশর্মা মদনপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারী গোবিন্দ-চন্দ্রের শাসনকালেও মহাপুরোহিতের পদে বৃত ছিলেন। রাজ্যে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল কেননা অনুদানপত্রে যে রাজপদাধিকারীদের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে মহা-পুরোহিতের স্থান সর্বোচ্চে উল্লেখ করা হয়েছে। এঁকে প্রদত্ত দশটি অনুদান থেকে জানা যায় যে এঁকে দশটি গ্রাম গাহরওয়ালরাজ্যের দশটি পৃথক পৃথক পত্তলে (রাজস্ব-বিষয়ক একক) দেওয়া হয়েছিল।[৩] ১১১৪ থেকে ১১২৩ পর্যন্ত এঁকে প্রায় প্রতি বৎসর একটি করে গ্রাম দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী দশ বৎসর ইনি কোনো গ্রাম পান নি। কিন্তু পুনরায় ১১৩৯ সালে ইনি একটি গ্রাম পেয়েছিলেন।[৪] এই অনুদানগুলির উদ্দেশ্য ছিল পুণ্যার্জন।[৫] কিন্তু মনে হয় পুণ্যার্জনের উল্লেখ নিতান্তই প্রথাগত আচারমাত্র। মনে হয় মহাপুরোহিত প্রকৃতপক্ষে এই অনুদান গাহর-ওয়াল রাজাদের সেবা করার পুরস্কার হিসাবে বার্ষিক বৃত্তিরূপে লাভ করেছিলেন। তাঁর অধীনস্থ গ্রাম দশটি পৃথক পৃথক পত্তলে বিক্ষিপ্ত থাকায় তিনি নিজের শক্তি সুসংহত করতে পারতেন না বটে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। জাগুশর্মার পুত্র প্রহ্লাদ বা প্রহরাজশর্মার সময়ে এই পরিবারের শক্তি ও প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁকে আটটি গ্রামদান

১। জা. র. এ. সো., ১৯২৭, পৃঃ ৬৯৪

২। এ. ই. xiv, নং ৬, প ৯-২৬

৩। রমা নিয়োগী—হিস্ট্রী অফ দি গাহরওয়াল ডাইনেস্টি, পরিশিষ্ট 'বি', নং ১০, ১২, ১৩, ১৫-৭, ২১, ২৩, ২৬, ৩৭

৪। এ. ই. ii, নং ২৯, xi, প ১৯-২০

৫। ঐ, নং ১১, 'এ' প ২০-১, 'বি' প ১৯-২০, 'সি' প ১৯

করা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে রাউতের মহত্বপূর্ণ সামন্তীয় বা সামরিক মর্যাদাদান করে তাঁকে তার পিতার স্থানে মহাপুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।[১] এইভাবে রাজ্যের মোট ৬০টি পত্তলের মধ্যে ১৮টি পত্তলে এই পরিবারের ভূসম্পত্তি ছিল।[২] এই অনুদানগুলিতে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণকে প্রদেয় সকল অধিকারই প্রদান করা হয়েছিল এবং জাগুশর্মা ও তাঁর পুত্র প্রহ্লাদশর্মাকে অনুদত্ত অঞ্চল থেকে সর্ব-প্রকার নিয়মিত ও অনিয়মিত শুল্ক আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল; এসব অধিকার পূর্ব গাহরওয়াল রাজার ছিল।[৩]

গাহরওয়ালগণ অন্যান্য ব্রাহ্মণ রাজপদাধিকারীদেরও গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন। এই পদাধিকারীগণ পুরুষানুক্রমে রাউতরূপে রাজার সেবা করে আসছিলেন। ১১৩৩-এ গোবিন্দচন্দ্র ব্রাহ্মণ রাউত জটেশশর্মাকে একটি গ্রাম দিয়েছিলেন। এঁর পিতা রাউত এবং পিতামহ ঠকুর ছিলেন।[৪] আবার ১১৬৮-তে যুবরাজ জয়চন্দ্র দু-জন বংশানুগত ব্রাহ্মণ রাউতদের একটি গ্রামদান করেছিলেন। এঁদের পিতা ও পিতামহ উভয়েই ঠকুর ছিলেন। এই গ্রাম পুণ্যার্জনহেতু সর্বপ্রকার অধিকারসহ চিবকালের জন্য দান করা হয়েছিল।[৫] ১১৮৬-তে জয়চন্দ্র ঐ একই উদ্দেশ্যে রাউত অনঙ্গকে একটি গ্রামদান করেছিলেন। অনঙ্গের পিতা ও পিতামহও রাউত ছিলেন। যদিও অনঙ্গের গোত্র ও প্রবরের উল্লেখ করা হয়েছে তবুও অনঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।[৬] ক্ষত্রিয় রাউতকে ভূমি অনুদান দেবার একটিমাত্র স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা হবার পর ১১৭৭-এ জয়চন্দ্র ক্ষত্রিয় রাউত রাজ্যধরবর্মণকে একটি গ্রাম অনুদানরূপে দিয়েছিলেন।[৭] রাজ্যধরবর্মণ মহামহত্তক ঠকুর শ্রীজগদ্দেবের পৌত্র ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই গ্রহীতার গোত্র এবং প্রবর দুটিরই উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] এবং অনুদানপত্রে এঁকে ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ না করলে, এঁকেও ব্রাহ্মণ বলে ভ্রম হত কারণ এই অনুদানে সমস্ত ধর্মীয় প্রথা ও আচার পালন করা হয়েছিল এবং চন্দ্রসূর্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত জমিদান করা হয়েছিল।[৯] স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে রাজ্যধরবর্মণ একজন প্রতিপত্তিশালী

১। নিয়োগী—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট 'বি', নং ৫০, ৫২-৬, ৫৮
২। ঐ, ১৩৮
৩। "......সমস্তনিয়তানিয়তাদায়ন।" এ. ই., নং ৯ ও ১১
৪। ঐ 'জে' ii, ১৯-২১
৫। ই. এ. xv, ৭-৮, প ১৬-২২। তাঁর পিতামহের ভ্রাতাও রাউত ছিলেন। মনে হয় রাউতদের মর্যাদা ঠকুরদের উপরে ছিল।
৬। ই. এ. xv, ১১-২, প ২০-২৯
৭। ঐ xviii, পৃঃ ১৩৪, প ২০-৪, ২৭-৩৫
৮। ঐ, প ২৭-৮
৯। ঐ, প ২৬-৭

রাজকর্মচারী ছিলেন এবং তাঁকে পরে আরও পাঁচটি গ্রামদান করা হয়েছিল।[১] একমাত্র পাটকের (মৌজা অথবা পট্টি) নাম ছাড়া উপরোক্ত ছটি অনুদানেই (১১৭৭ ৮০) একই ভাষা ও শব্দাবলী প্রয়োগ করা হয়েছে। দাতা অনুদানপত্রে কোথাও গ্রহীতার কোনো সেবা দাবি করেন নি, এবং নিজ ও নিজ মাতাপিতার জন্য পুণ্যার্জনেব নিমিত্ত অনুদান দেওয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ কবেছেন বটে, কিন্তু ধর্ম ও পবমার্থ চিন্তায় এই দান দেওয়া হয়েছিল বলে বিশ্বাস হয় না, কাবণ গ্রহীতা ছিল ক্ষত্রিয়। সে অনুদান দানে বাজাকে বাধ্য কবেছিল এমনও কোনো আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু তাকে তিনটি অনুদান ১১৭৭-এ এবং পুনবায় অন্য তিনটি অনুদান ১১৮০-তে দেওয়া হয়েছিল সেই জন্য মনে হয় যে মাঝের তুই বৎসরে সে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এই আধ ডজন অনুদানেব গ্রহীতা হওয়া সত্বেও রাজ্যধববর্মণ তেমন প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠেন নি যেমন জাগুশর্মা ও তাঁর পুত্র হয়েছিলেন। পিতাপুত্র মিলে তু-জনে মোট আঠাবোটি অনুদান পেয়েছিলেন।

গাহরওয়ালদের অধীনস্থ রাণকরাও কিছু ভূমি অনুদান পেয়েছিল। আমরা জানি যে বাণক লবরাপ্রবাহ ১১০৯ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ গোবিন্দচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে একটি ভূমি অনুদান দিয়েছিলেন।[২] এ কথা স্পষ্ট যে এখানে রাজাব প্রতিনিধিরূপে যুবরাজ অনুমতি দিয়েছিলেন এবং মনে হয় বাণক যে অনুদানটি দিয়েছিল সেটি সে যে গ্রামটি স্বয়ং অনুদানরূপে পেয়েছিল তার থেকেই দিয়েছিল। গাহবওয়াল শাসনের শেষ দিনগুলিতে কয়েকজন বাণক ছোট ছোট স্বাধীনবাজ্য কায়েম কবে নিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজন রাউত ১১৯৭ সালে নিজ কান্যকুব্জ প্রভুব সঙ্গে সঙ্গে নিজ প্রত্যক্ষ মালিক বাণক রাজাবও উল্লেখ করেছিল।[৩] ১১৩৪-এ সিঙ্গব বৎসবাজ নামক একজন গাহরওয়াল সামন্তকেও রাপড়ি বিষয়ে সেই সর্তে অনুদান দিয়েছিলেন যেমন তাঁর গাহবওয়াল প্রভু দিতেন।[৪] হয়ত তাব প্রভু তাকে কোনো অনুদান দেন নি, কিন্তু তার অধিকৃত জমি তাকে ফিবিয়ে দিয়েছিলেন।

চন্দেলদের বিপরীত গাহরওয়াল তাম্রপটেব কোথাও বাউতদের গ্রাম অনুদান দেওয়ার কারণরূপে তাদের সামরিক সেবা বা সাহসিকতাপূর্ণ কার্যের কোনো উল্লেখ করা হয় নি। ফলে আমরা অনুমান করতে পারি যে সাধারণভাবে সমস্ত-প্রকার সেবার

১। ঐ, ১৩৪, প্লেট 'জি', 'এইচ', 'আই', 'জে' এবং 'ক'
২। ঐ, পৃঃ ১৮-৯, প ১০-২৮
৩। জা. এ. সো. বে. (নিউ সিরিজ) vii, ৭৬৩, প ১-৬
৪। এ. ই. iv, নং ১২

জন্যেই অনুদান দেওয়া হয়ে থাকত। কিন্তু গাহরওয়াল অনুদানপত্রগুলিতে রাজপদাধিকারীদের তালিকায় রাউত ও রাণকদের উল্লেখ করা হয় নি। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে তারা রাজ্যের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাজকর্মচারী ছিল না, বরং তারা ছিল রাজার সামন্ত। চন্দেলদের তুলনায় গাহরওয়ালদের রাজত্বে রাউতদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি।

পুরোহিত ছাড়া অন্যান্য নিয়মিত রাজকর্মচারীদেরও যে গ্রাম অনুদান দেওয়া হত তার কিছু-কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০৯২-৯৩ সালের গাহরওয়াল তাম্রপটে বিকরগ্রামঃ (করমুক্ত গ্রাম) শব্দটির উল্লেখ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই অনুদানপত্রে চন্দ্রদেব ৫০০ জন ব্রাহ্মণকে একটি সম্পূর্ণ গ্রামদান করেছিলেন।[১] অনুদত্ত অঞ্চলে এই পত্তলার সেই সকল গ্রাম অন্তর্ভূত ছিল না যেগুলি ব্রাহ্মণ ও মন্দিরের অধিকারে ছিল এবং যা করমুক্ত ছিল।[২] এই অনুদানপত্রে উল্লেখ করা আরো ২৫টি গ্রাম মন্দিরের অধীন, ২টি ব্রাহ্মণদের অধীন এবং ৬টি করমুক্ত ছিল।[৩] দয়াবাম সাহনী এই করমুক্ত গ্রামগুলিকে করহীন[৪] (হস্তহীন) ব্যক্তিদেব গ্রাম বলে উল্লেখ কবেছেন, কিন্তু এরূপ মনে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বি-কব শব্দের অথ ত করমুক্ত হতেই পাবে[৫] এবং মনে হয় ঐ গ্রামগুলি রাজপদাবিকারীগণ অনুদানরূপে লাভ করেছিল। এইরূপ করমুক্ত গ্রাম বাজ্যের অন্যান্য পত্তলায় থাকলেও আশ্চর্যের কিছু নেই, কিন্তু তাদের কোথাও কোনো উল্লেখ নেই, এইকারণে যে সম্পূর্ণ পত্তলা দান করার কোনো দৃষ্টান্তও নেই।

একটি গাহরওয়াল শিলালিপিতে ৮৪টি গ্রামের রাজস্ব-এককের উল্লেখ আছে; কিন্তু চাহমান ও পরমাবদের বাজ্যে এরূপ বহু এককের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ শাসকবংশীয় অংশীদারদের মধ্যে পৈতৃকরাজ্য বিভক্ত হয়ে যাবাব ফলেই এইরূপ এককের উদ্ভব হয়েছিল। যদিও গাহরওয়াল শিলালিপিতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনুদান দেবার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি অনুদানপত্র যাদের কাছে পাঠান হয়েছে তাদের মধ্যে রাজা, রানী, যুবরাজ ইত্যাদির স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

১। এ. ই. xiv, নং ১৫, প ২৫-৩০

২। ঐ

৩। ঐ, প ২৭ ৩০

৪। ঐ, ১৯৬

৫। এ. ই. xiv, ১৯৬, পাদটীকা ১। 'বি-কর' শব্দটির উল্লেখ একপ্রকার যুদ্ধের অর্থেও করা হয়েছে। যদি আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করি তা হলে ধরে নিতে হবে যে রাজাকে সৈন্যসরবরাহের পরিবর্তে যে গ্রামগুলি রাজা দান করতেন সেগুলিকে করমুক্ত করে দেওয়া হত। 'লেখপদ্ধতি'তে 'বি-করপদ' শব্দের অর্থ পাঁচমিশালী খরচ অর্থে করা হয়েছে। (পৃঃ ৯৯, ১০১)

ছিল।[১] কিন্তু চাহমানদের বেশ কয়েকটি শিলালিপি থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে শাসকসর্দারদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করা হত। এটির প্রথম প্রমাণ ভূতপূর্ব জয়পুররাজ্যে প্রাপ্ত ৯৭৩-এর একটি শিলালিপি। এই শিলালিপিটি চাহমানদের সাকম্ভরী নামক প্রধান শাখার।[২] এর দ্বারা রাজা সিংহরাজ, তাঁর দুই ভাই বৎসরাজ ও বিগ্রহরাজ, দুই পুত্র গণ্ডরাজ ও গোবিন্দরাজ এবং দূর আত্মীয় জয়নরাজ এঁদের মধ্যে প্রত্যেকে একটি শিবমন্দিরকে নিজ নিজ সম্পত্তি থেকে গ্রাম ও কুটির দান করেছিলেন।[৩] স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে এঁদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী জায়গীরের অধিকারী ছিলেন। এই শিলালিপি থেকে আরও জানা যায় যে কেবল রাজাই নয়, রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ নিজ নিজ ভূসম্পত্তি থেকে ইচ্ছামত ভূমিদান করতে পারত।

এই অনুদানটি থেকে সামান্য ভিন্ন প্রকৃতির অন্য একটি অনুদানের দৃষ্টান্ত আমরা দ্বাদশ শতাব্দীতে পাই। ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে শ্রীতিহুনক নামক একজন চাহমান রানী 'গিরাজ'রূপে (অন্নবস্ত্রের জন্য) একটি গ্রাম পেয়েছিলেন।[৪] এই রানীর জন্ম যে গোষ্ঠীপরিবারে হয়েছিল, তার থেকে ভিন্ন গোষ্ঠীর পরিবারে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু তাকে তাঁর নিজ মর্যাদানুযায়ী একটি নিজস্ব জায়গীর দেওয়া হয়েছিল। রাজকুল থেকে অনুদান দেওয়ার একটি স্পষ্ট উদাহরণ ১১৬১ সালের নডোল তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। এর দ্বারা রাজকুল অহ্লনদেব এবং কুমার কেহ্লনদেব সংযুক্তভাবে রাজপুত্র কীর্তিপালকে সমস্ত অধিকারসহ বারটি গ্রাম দিয়েছিলেন।[৫] কীর্তিপালকে এই জায়গীর চিরকালের জন্য দেওয়া হয়েছিল, কারণ যখন কীর্তিপাল এক জৈনমন্দিরকে এই বারটি গ্রামের প্রত্যেকটির আয় থেকে দুইশত দ্রম্ম বার্ষিক অনুদান দিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজ উত্তরাধিকারীদেরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারাও যেন অনুদানের এই সর্তগুলি পালন করে।[৬] দশম শতাব্দীর একটি চাহমান শিলালিপিতে বারটি গ্রামের এককের উল্লেখ দেখা যায়।[৭] কিন্তু এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে এই একক ব্যক্তিগত জায়গীররূপে কাউকে দেওয়া হয়েছিল অথবা হয় নি। শাসকগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ভূমি অনুদান দেওয়ার প্রচলন কীর্তিপালের উত্তরাধিকারীদের সময় পর্যন্ত অব্যাহত

১। এ. ই. iv, নং ১১, 'এ', প ১৫-৬
২। ঐ
৩। এ. ই., নং ৮, শ্লোক ৪৮-৯
৪। ঐ, নং ৪, ৫, প ২
৫। ঐ ix, নং ৯, 'বি', প ১৭-২৯
৬। ঐ প ১৭-৩০
৭। ঐ ii, নং ৮, শ্লোক ৪৯

ছিল। ১১৩৬ সালের একটি অনুদানপত্র অনুসারে তাঁর দুই পুত্র রাজপুত্র লখনপাল ও রাজপুত্র অভয়পাল সিনাণব গ্রামের অধিকারী হয়েছিলেন।[১] আরও একটি গ্রাম তাঁরা রানীর সঙ্গে সংযুক্তভাবে উপভোগ করতেন। সেটির উপরও এঁদের অধিকার ছিল, কারণ দেখি যে এঁবা তিনজনেই উক্ত গ্রামের যন্ত্রকূপ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে নিজেদেব অংশরূপে প্রাপ্ত যব সংযুক্তভাবে দান করে দিয়েছিলেন।[২] এই ঘটনাটি মহারাজাধিরাজ কেহ্লন'র শাসনকালে ঘটেছিল।[৩] রাজপুত্র কীর্তিপালের পিতা অহ্লন'র পবে এই কেহ্লনই চাহমান সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

রানী ও রাজপুত্রদেব নিশ্চয়ই ধর্মেব নামে অনুদান দেওয়া হত না এবং রাজ-সেবার সঙ্গেও এই অনুদানগুলির কোনো সম্পর্ক ছিল না। হতে পারে যে রানী প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতেন না। তবে কোন রানী যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার সংরক্ষিকা হিসাবে রাজ্যশাসন করে থাকেন তা হলে সে কথা আলাদা। কিন্তু রাজপুত্রদের সম্পর্কে এ কথা খাটে না। গোড়ার দিকে রাজপুত্রের মর্যাদাসম্পন্ন সকলকেই ভূমি অনুদান দেওয়া হয়ে থাকত এবং সম্ভবতঃ এইরূপ সামন্তদের দেওয়া হত, যাদের কাছ থেকে কোনরূপ রাজসেবার প্রত্যাশা ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহারাজ কীর্তিপালের পুত্র মহারাজ সমরসিংহেব শাসনকালে তার মাতুল বাজপুত্র জোজল রাজ্যচিন্তকের বা মন্ত্রণাদাতার কাজ করতেন।[৪] চৌহানদেব শাসনকালপ্রসঙ্গে রচিত একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে শাসনকার্য নডোল পরিবাব চালাতেন।[৫] এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে রাজার নিকট যেসব আত্মীয় সামন্তপদ পেয়েছিলেন তাবা রাজাকে সাহায্য করবেন এটা প্রত্যাশা করা হত এবং তার পবিবর্তে রাজা তাদের জায়গীর প্রদান করতেন। কিন্তু তাঁরা রাজাকে কিরূপ সাহায্য করতেন তা বলা কঠিন। পরবর্তীকালে শাসকবংশীয় ব্যক্তিদের তাঁদের সর্দার কর্তৃক জায়গীর প্রদানের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। পরিবর্তে যুদ্ধের সময় সর্দারকে সাহায্য কবতে হত এবং জায়গীরের অধিকারীর মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারী সর্দারকে কিছু নজরানা প্রদান করতেন।[৬] এই দুটি কর্তব্যপালন ছাড়া

১। ঐ, ১১, নং ৪, ১৫, প ১-৫
২। ঐ
৩। ঐ
৪। এ. ই. xi, নং ৪, ১৮, পৃঃ ৫৩
৫। কেহ্লন'র রাজত্বকালে রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশের শাসন তাঁর পুত্র বা আত্মীয়গণ চালাতেন। দশরথ শর্মা—'আর্লি চৌহান ডাইনেষ্টিজ', পৃঃ ২০২
৬। বডেন পাওয়েল—দি ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কম্যুনিটি, পৃঃ ১৯৬-২০২

তাঁরা নিজ নিজ জায়গীরে প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজার মত শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।[১] সম্ভবতঃ চাহমানদের রাজত্বের সুরুতে অনুরূপ অবস্থা বর্তমান ছিল, কিন্তু এই অনুদানের ব্যবস্থার সমর্থনে আমাদের কাছে তৎকালীন কোনো প্রমাণ নেই।

চাহমানদের শাসনকালে সমস্ত রাজকার্য শাসকপরিবারের হাতেই ছিল, এ কথা মনে করা ভুল হবে। রাজ্যে এমন কিছু পদাধিকারীও ছিল রাজপরিবারের সঙ্গে যাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না, এরূপ অনুমান করার সঙ্গত কারণও আছে। বহু পূর্বেই ৯৩৭ সালে মহারাজাধিরাজ সিংহরাজের 'দুঃসাধ্য' ধন্ধুক নিজ প্রভুর অনুমতি নিয়ে খট্রকূপ 'বিষয়'স্থিত নিজ গ্রাম অনুদানরূপে একটি শিবমন্দিরকে দান করেছিলেন।[২] ধন্ধুক এই শিবমন্দিরকে অনুদানদাতা সাতজনের মধ্যে একজন ছিলেন। অন্য ছ-জনের মধ্যে একজন স্বয়ং রাজা ও বাকি সকলেই ছিলেন রাজ-পরিবারের সদস্য। এই কারণেই বাকি ছ-জন দাতাকে কোনো অনুমতি গ্রহণ করতে হয় নি।[৩] সম্ভবতঃ এই আরক্ষাপদাধিকারী ধন্ধুক আরও গ্রামের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সেগুলির উপর তাঁর অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ দেখা যাচ্ছে তিনি বিনা অনুমতিতে গ্রাম অনুদান দিতে পারতেন না। মারওয়ারে প্রাপ্ত ১১১০ সালের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে অশ্বরাজের শাসনকালে অশ্বশালার মুখ্য পদাধিকারী উৎপলরাক চারটি গ্রামের যন্ত্রকূপের শুল্ক হিসাবে প্রাপ্ত নিজ অংশের যবের অধিকার একটি মন্দিরকে দান করেছিলেন।[৪] গ্রাম থেকে প্রাপ্ত করের নিজ অংশ অপরকে দান করার এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে উক্ত গ্রামাঞ্চলটি রাজা তাঁকে সমস্ত অধিকারসহ দান করেছিলেন। মনে হয় চাহমান শাসনের শেষের দিকে মন্ত্রিগণকে বড় বড় জায়গীর দান করা হত। তৃতীয় পৃথ্বীরাজের প্রধান পরামর্শদাতা কদম্বভাসের উপাধি ছিল মণ্ডলেশ্বর। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে তাঁর বেতনের পরিবর্তে অথবা তাঁর উচ্চ-মর্যাদা রক্ষার জন্য তাঁকে একটি সম্পূর্ণ মণ্ডল দান করা হয়েছিল।[৫] এই তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমাণিত হয় যে রাজবংশের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হলেও, রাজপদাধিকারীদের ভূমি অনুদান দেওয়া হত।

পরমারদের শিলালিপিতে শাসকবংশীয়দের ভূমিদানের উল্লেখ বিরল, যার স্পষ্ট

১। ঐ
২। এ. ই. ii, নং ৮, শ্লোক ৪৯
৩। ঐ
৪। এ. ই., নং ৪, ৩, প ১-৩
৫। দশরথ শর্মা, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৯৮। এরূপ অনুমান করা হয়েছে যে তিনি সম্ভবতঃ কিছু অঞ্চলের বংশগত শাসক ছিলেন (ঐ, পাদটীকা ৩৫)

প্রমাণ আমরা চাহমান শিলালিপি থেকে পাই। একমাত্র ভোজের (১০১১) শাসন-কালের একটি পরমার অনুদানপত্রের এইরূপ অর্থ করা যেতে পারে যে রাজবংশীয়দের ভূমি অনুদান দেওয়া হত। এটিতে কোনো রাজবংশোদ্ভূত বৎসরাজকে ভোক্তার-মহারাজপুত্র বলা হয়েছে, স্পষ্টতঃ এই শব্দটি ভোক্তৃমহারাজপুত্র'র বিকৃত রূপ।[১] মনে হয় ইনি মোহদবাসক নামক একটি জায়গীর পেয়েছিলেন।[২] প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে এই জায়গীর সিয়কের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল।[৩] কিন্তু চাহমান অপেক্ষা পরমারদের দলিলে গ্রাম-এককের বেশি উল্লেখ পাওয়া যায়। কমপক্ষে সাতটি এককের ('গ্রুপ') উল্লেখ ত পাওয়া যায়ই। এগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি বারো অথবা বারোর গুণিতকের গ্রাম-একক এবং এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এককে ৮৪টি গ্রাম অন্তর্ভূক্ত ছিল। বাকি দুটি গ্রাম-একক ১৬ অথবা ষোলর বহুগুণ সংখ্যক ছিল।[৪] মনে হয় এই এককগুলি শাসকবংশীয় ব্যক্তিদেব অধীনে প্রায় স্বাধীনরাজ্যের সমান ছিল এবং বিজিত অঞ্চল শাসকপরিবারের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার প্রথার ফলেই এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।[৫] একাদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের একটি পরমার শিলালিপিতে ৮৪টি করমুক্ত গ্রামেব উল্লেখ[৬] এই অনুমানের সমর্থন করে। পরবর্তীকালে রাজপুতানায় ৮৪টি গ্রামের যে এককগুলি দেখা যায় তা শাসকপরিবার-ভুক্ত ব্যক্তিদেরই জায়গীর ছিল। প্রশাসনিক দিক থেকে সমস্ত প্রদেশগুলিকে শাসক-বংশীয় সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার প্রথা পরমারদের রাজত্বের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল কিনা, এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। এ কথাও প্রমাণ করা কঠিন যে রাজবংশীয় ব্যক্তিদের প্রদত্ত জায়গীরগুলি প্রশাসনিক একক ছিল; অথবা এগুলি জায়গীরের অধিকারীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল এবং সেগুলি তারা পেয়েছিল বৃহত্তর অঞ্চলের প্রশাসনকার্য পরিচালনার বেতনস্বরূপ। তবে দ্বিতীয় অনুমানটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। পরমার রাজা দ্বিতীয় সিয়কের ৯৪৯-এর একটি অনুদানপত্র থেকে

১। এ, ১৯৩
২। ঐ, নং ৩৮, প ৫-৬
৩। ঐ xix, নং ৩৯, অনুদান 'এ', প ৯
৪। ডি. সি. গাঙ্গুলী—'হিস্ট্রী অফ দি পরমার ডায়নেষ্টি', পৃঃ ২৩৬-৮, পরমার ভোজের ১০১৯-এর একটি দানপত্রে 'ভূমিগ্রহপশ্চিমদ্বিপংচাশক্ত' নামে ক্ষেত্রীয় এককের উল্লেখ আছে এটি ৫২টি গ্রামের এককের ইঙ্গিত দেয়, যা ১২ অথবা ১৬ দ্বারা বিভাজ্য নয়। এ. ই. xxiii, নং ৬২,প ৫-৬
৫। বেডেন পাওয়েল—'ল্যাণ্ড সিস্টেম অফ ইণ্ডিয়া', পৃঃ ২৫১, ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কম্যুনিটি ১৯৬-২০২, ইউ. এন. ঘোষ—'দি হিন্দু রেভেনিউ সিস্টেম', পৃঃ ২৩৬, পাদটীকা ২৯·৫৯
৬। এ. ই. xix, নং ২০, প ৮-১৭। আর. ডি. ব্যানার্জী 'মাত্তকপট্ট' শব্দের 'করমুক্ত' বলেছেন। ঐ, পৃঃ ৬৪

জানা যায় যে একটি সম্পূর্ণ জেলা তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল এবং তার থেকে তিনি একটি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[১] আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে যুবরাজরূপে তিনি এই ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজা হবার পর তিনি নিজ খাস সম্পত্তি, অথবা রাজ্যের সাধারণ সম্পত্তি উভয় থেকেই জমি অনুদান দিতে পারতেন। যাই হোক না কেন, অদ্যাবধি প্রাপ্ত দলিলদস্তাবেজ থেকে এ কথা প্রমাণ হয় না যে বেশিরভাগ রাজবংশীয় ব্যক্তিগণই পরমাররাজ্যে প্রশাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং তার জন্য তাঁরা জায়গীর পেতেন।

পরমার রাজপদাধিকারীদের প্রায় আধ ডজন পদের কথা জানা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই ভূমি অনুদান দেওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহাসাধনিক শ্রীমহাইক যাঁর কাজ ছিল সম্ভবতঃ অপরাধীদের দণ্ডিত করা এবং অপরাধ দমন করা। নিশ্চিতরূপে তিনি একটি গ্রাম অনুদানরূপে পেয়েছিলেন। কিন্তু ৯৮০-তে ধারের বাকপতিরাজ সেই কর্মচারীটির পত্নীর অনুরোধে সেই গ্রামটি উজ্জয়িনীর ভট্টেশ্বরীদেবীকে পুনরায় দান করেছিলেন।[২] একাদশ শতাব্দীতে এইরূপ অনুদানের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১১১০-এর একটি অনুদানপত্রানুসারে জানা যায় যে প্রদেশশাসক মণ্ডলেশ্বর রাজদেব দুটি এবং তাঁর স্ত্রী একটি ভূমি অনুদান দিয়েছিলেন।[৩] মনে হয় যে গ্রাম থেকে তাঁরা অনুদান দিয়েছিলেন সেটি মণ্ডলেশ্বরের দখলেই ছিল[৪] এবং সম্ভবতঃ স্ত্রীকেও তার থেকে কিছু জমি তিনি দিয়ে থাকবেন। অনুদানপত্রটি থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে পরমাররাজাই মণ্ডলেশ্বরকে এই গ্রামটি দান করেছিলেন কেন না দেখা যাচ্ছে রাজাই মণ্ডলেশ্বর ও তাঁর স্ত্রী দ্বারা অনুদত্ত অনুদানের সূচনা প্রাসঙ্গিক পদাধিকারী, ব্রাহ্মণ ও পট্টকিলদের কাছে পাঠাচ্ছেন।[৫] আরও জানা যায় যে গ্রহীতা মণ্ডলেশ্বর নিজ প্রভুর অনুমতি ব্যতীত নিজ জায়গীরের কোনো অংশ ধর্মীয় উদ্দেশ্যেও দান করতে পারতেন না। পরবর্তীকালে ১২৬০-৬১ সালের একটি তাম্রপট থেকে জানা যায় যে দ্বিতীয় জয়বর্মা নিজ প্রতীহার (দ্বারপাল) গঙ্গদেবের দ্বারা তিনজন ব্রাহ্মণকে গ্রাম অনুদান করিয়েছিলেন।[৬] এই অনুদানের ধর্মীয় আচারগুলির অনুষ্ঠান গঙ্গদেব

১। "স্বভুজ্যমান মোহডবাসক বিষয়সম্বদ্ধ কুম্ভারোটক গ্রামঃ" এ. ই. xix, নং ৩৯, দান 'এ', প ৮-১৪
২। ই. এ. xiv, ১৬০, প ৯-১৪
৩। এ. ই. xx, নং ১১। দানপত্রটির অর্থ আর. ডি. ব্যানার্জীর মতানুসারে না করে এস. পি. চক্রবর্তীর মতানুসারে করেছি।
৪। ঐ, প ৫-৬
৫। ঐ, প ৪-৭
৬। এ. ই. ix, নং ১৩ 'বি', প ২৩-৭

করেছিল।[১] যার অর্থ প্রকৃতপক্ষে অনুদানগুলি তিনি নিজেই দিয়েছিল। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে গ্রামগুলি তার নিজের জায়গীরের অন্তর্ভূত ছিল। এই জমি কিন্তু সে রাজার অনুমতি ছাড়া দান করতে পারত না, কারণ অনুদানপত্রে রাজা স্বহস্তে স্বাক্ষর করে সেটিকে 'রাজশাসন'রূপে[২] জারী করেছিলেন। যদি অনুদত্ত জমি রাজার দখলেই থাকত তা হলে অনুদানের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিও তিনিই পালন করতেন। অতএব এ কথা স্পষ্ট যে প্রতীহারদেরকে তাদের রাজসেবার পবিবর্তে ভূমি অনুদান দেওয়া হত। সম্ভবতঃ পরমারদের রাজ্যে অন্যান্য রাজপদাধিকাবীদের ভূমি অনুদান দেওয়া হত, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য বর্তমানে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে করা যায় না।

পরমারদেব দলিলদস্তাবেজ থেকে জানা যায় যে তাঁদের রাজত্বে মাণ্ডলিক ও সামন্ত নামধেয় সামন্তগণ বর্তমান ছিল। এদের মধ্যে অনেককে প্রশাসনকার্য পরিচালনার জন্য ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে সামন্ত (তৎপাদ-কমলধ্যাত) শূরাদিত্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সামন্তটি কনৌজেব শ্রবণভদ্র পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং তাঁকে রাজা ভোজ অথবা তাঁর পিতা সিন্ধুরাজ সংগমখেটের মণ্ডলেশ্বর নিযুক্ত করেছিলেন।[৩] এই রাজানুগ্রহের পরিবর্তে তিনি রাজাকে সাহায্যদান করতেন।[৪] হয়ত কখনও কখনও অথবা নিয়মিতরূপে তিনি রাজাকে কিছু করও প্রদান করতেন; কিন্তু তার কোনো প্রমাণ নেই। সামরিক সাহায্যদানের পরিবর্তে শূরাদিত্য ও তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র যশোরাজ দু-জনেই সম্ভবতঃ নিজ মণ্ডলাধীনস্থ ভূমির সম্পূর্ণ মালিকানা ভোগদখল করতেন; কেননা দেখা যাচ্ছে যে ভোজের শাসনকালে, ১০৪৭ সালে যশোরাজ নিজ প্রভুর অনুমতি ছাড়াই একটি শৈব দেবতা গণ্টেশ্বরকে একটি সম্পূর্ণ গ্রাম এবং অন্য একটি গ্রামের একশ একর জমি অনুদান দিয়েছিলেন।[৫] ১০৬১ ও ১১০০ সালের মাঝামাঝি কোনো সময়ে নাসিকে যশোবন্ত নামক একজন সামন্ত ছিলেন, তিনি ভোজের নিকট থেকে অর্ধেক সেল্লুকনগর লাভ করেছিলেন[৬] এবং নিজ প্রভুর কৃপায় ১৫০০টি গ্রামের মালিক হয়েছিলেন।[৭] এত বড় অনুদান নিশ্চয়ই তিনি তাঁর প্রভুকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ

১। ঐ, প ২৮-৩৬
২। ঐ, প ৩৭-৫৩
৩। ঐ XIX, নং ৩৯, দান 'এ', প ১১-২
৪। ঐ
৫। প্রোসিডিংস অফ ওরিয়েন্টাল (পরে 'অল ইণ্ডিয়া') কংগ্রেস i, ৩২৫-৬
৬। 'শ্রী'ভাজদেবপ্রসাদাবাপ্ত নগর সে (লুকার্দ্ধ)'; ঐ, নং ১০, প ৭
৭। 'সার্দ্ধসহস্রগ্রামানাম ভোক্তারাঃ।' ঐ, প ৮। ডি. সি. গাঙ্গুলীর মতে সেল্লুক ছিল একটি মণ্ডল (হিস্ট্রী অফ দি পরমার ডায়নেস্টি, পৃঃ ২৩৬. পাদটীকা ১) কিন্তু এ. ই. XIX, ১০, প ৭-৮ দেখলে মনে হয় এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।

সেবাদানের পরিবর্তেই পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি মালবের বাইরের কোনো অঞ্চল জয় রাজাকে সহায়তা করেছিলেন বলে মনে হয়।[১] তিনি ঔদ্রহাদি নামক সম্পূর্ণ বিষয়ের মণ্ডলেশ্বর ছিলেন, সম্ভবতঃ এইজন্য ভোজ তাঁর প্রশাসনিক সেবাকার্যের জন্য তাঁকে ১৫০০ গ্রামদান করেছিলেন। যশোবর্মণের শাসনকালে উপসামন্তীকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর 'বিষয়ে' গঙ্গ পরিবারের অ(ম্ম)রাণক বাস করত। সে একটি জৈনমন্দিরকে বিভিন্ন পরিমাপের চারটি ভূমিখণ্ড দান করেছিল।[২] এগুলির মধ্যে একটি সে পেয়েছিল কক্কপৈরাজ নামক জনৈক কুমারের কাছ থেকে এবং দ্বিতীয় একটি কয়েকজন নগরবাসীর কাছ থেকে। কক্কপৈরাজ সম্ভবতঃ পরমার রাজকুমার ছিলেন। কিন্তু এই সামন্ত তার প্রত্যক্ষ প্রভু যশোবর্মণের নিকট থেকে কোন ভূমি অনুদান পেয়েছিল কিনা, তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

গুজরাট ও চৌলুক্যদের রাজত্বে ত্রিলোচনপালের ১০৫১ সালের একটি অনুদান-পত্রে নয় শতটি এবং বিয়াল্লিশটি গ্রামের এককের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] এই দৃষ্টান্তটি বিজেতা পরিবার দ্বারা পৈতৃকসম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার প্রথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু মনে হয় চাহমান ও পরমারদের মত চৌলুক্যদের শাসনেও শাসকপরিবার ও তাদের আত্মীয় কুটুম্বদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য জমি আলাদা করে রাখা হত। ১০৯১-এর একটি অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে প্রথম কর্ণ আনন্দপুর গ্রাম ভোগ করতেন; এই আনন্দপুর গ্রামের সঙ্গে ১২৬টি গ্রামের একাংশও সংযুক্ত[৪] ছিল। এখানে আমরা ৪২-এর বহুসংখ্যক গ্রামের এককের পরিচয় পাই। সম্ভবতঃ কোনো এক সময়ে এই একক শাসকপরিবারের কোনো সদস্যকে দেওয়া হয়েছিল।

এই দিক থেকে চৌলুক্য রাজবংশ সমসাময়িক অন্যান্য রাজবংশের থেকে পৃথক ছিল। চৌলুক্য রাজাগণ নিজ সামন্ত ও উচ্চ-রাজপদাধিকারীদের অনুদানরূপে অনেক বড় বড় ভূমিখণ্ড দান করেছিলেন এবং ধীরে ধীরে অনুদানগ্রহীতা পদাধিকারীগণও সামন্তে রূপান্তরিত হতে লাগল। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি প্রথমতঃ ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীর চৌলুক্য তাম্রপট এবং দ্বিতীয়তঃ লেখপদ্ধতি নামক একটি সংকলনগ্রন্থ।

১। ১১৯৭ সালে গুহিলসর্দার পদ্মসিংহ কর্তৃক সামরিকসেবার পরিবর্তে ভূমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ. ই., নং ৩৭, শ্লোক ৩৪-৫

২। এ. ই. xiv, নং ১০, প ৮-৩১

৩। ই. এ. xii, ১৯৬, শ্লোক ৩২

৪। এ. ই. i, নং ৩৬, প ৩-৪, চৌলুক্য অনুদানপত্রে 'স্বভুজ্যমান' শব্দটি বার বার প্রয়োগ করা হয়েছে। রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে বলে মনে হয়। মূলরাজের ৯৯৫-এর একটি শিলালিপিতেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। (এ. ই. x, নং ১৭, প ৩)

১৫শ শতাব্দীতে লেখপদ্ধতি সংকলিত হয়েছিল এবং এই গ্রন্থে সরকারী দলিল-দস্তাবেজের আদর্শ লিখনপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যে প্রাচীনতম দস্তাবেজে মহামাত্য এবং রাণকদের অনুদান দেওয়ার উল্লেখ আছে তার কালের হিসাবে লেখপদ্ধতিতে ৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দ (বি. স. ৮০২) বলা হয়েছে। এই দস্তাবেজগুলির অনুসারে মহামাত্য ও রাণকগণ নিজ নিজ সামন্তদের বড় বড় জায়গীর প্রদান করেছিলেন এবং তার পরিবর্তে গ্রহীতারা নিজ নিজ প্রভুকে নির্দিষ্টসংখ্যক ঘোড়া সংগ্রহ করে দিত এবং নিজ নিজ জায়গীরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করত।[১] লেখপদ্ধতিতে অন্যান্য অনেকগুলি অনুদানপত্রের কাল ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] তার ফলে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে অষ্টম শতাব্দীতে গুজরাটে সামন্তপ্রথার বহুল বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে অন্য কোনো প্রমাণ দাখিল করা যায় না। অপরপক্ষে যে শাসনপত্রটি লেখপদ্ধতিতে ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দের বলে উল্লিখিত হয়েছে সেটি প্রকৃতপক্ষে ৫০০ বছরের পরবর্তীকালের রচনাপদ্ধতিতে রচিত এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। এইরূপ একটি শাসনপত্রে একজন রাজার বিশেষণরূপে গর্জনিকাধিরাজ (মাহমুদ গজনী) বিজেতা[৩] শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ১২০৬[৪] ও ১২২৩[৫]-এর শিলালিপিতেও এই বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক লেখপদ্ধতিতে সংকলিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দস্তাবেজের কালকে ১২শ শতাব্দীর উত্তরার্ধ বলে গ্রহণ করা চলতে পারে। কারণ এই দস্তাবেজে এমন দুটি শব্দ (পদ) প্রয়োগ করা হয়েছে যা এইকালের চৌলুক্য শিলালিপিতেই বিশেষ করে পাওয়া যায়। পদদুটির মধ্যে একটি হল 'তন্নিযুক্তমহামাত্য……শ্রীকরণাদিসমস্ত-মুদ্রাব্যাপারাণ পরিপথয়তি সতি।'[৬] এবং দ্বিতীয়টি হল 'নিযুক্তদণ্ডনায়ক'।[৭] এইজন্য এই সংকলনে যেসকল দলিলের কাল বি. স. ১২৮৮ (১২৩১ খ্রীঃ) বলা হয়েছে সেগুলি তার খুব বেশি পরবর্তীকালের হতে পারে না। এদের মধ্যে একটি দস্তাবেজ থেকে মহাসামন্ত লবণপ্রসাদের জীবন ও কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। সামন্তরূপে এঁর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় অজয়পালের ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে। তাঁকে ভৈল্লস্বামী মহাদ্বাদশকমণ্ডলস্থিত উদয়পুরের দণ্ডনায়ক নিযুক্ত

১। ঐ, পৃঃ ৭
২। ঐ, পৃঃ ২, ৮, ১০, ১৫
৩। এ. ই., পৃঃ ২
৪। এ. ই. vi, ১৯৪, প ১-১১। এই বিশেষণ দ্বিতীয় মূলরাজের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। এঁর রাজত্বকাল ১১৭৫-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।
৫। ঐ, পৃঃ ১৯৩, প ১৪-৫
৬। এ. ই. xviii, ৩৪৩, প ৫-৬। শিলালিপির প্রথম কিছু শব্দ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
৭। ঐ, ৭৪৭, প ৬

কবা হয়েছিল এবং সেখানে তিনি ৬৪টি গ্রামেব একটি পথক এককের একটি গ্রাম শিবকে দান কবেছিলেন।[১] লবণপ্রসাদেব অধিকারে যতই জমি থাকুক না কেন, এ কথা স্পষ্ট যে তিনি প্রভুব অনুমতি ছাড়াই নিজ ক্ষেত্র থেকে ভূমি অনুদান দিতে পাবতেন। এব দ্বাবা প্রতীযমান হয় যে তাঁব মর্যাদা সামন্তের অনুরূপ ছিল এবং বাজার প্রতি তাঁব নিজস্ব দায়িত্বপালন কবে তিনি নিজ অধিকাবভুক্ত অঞ্চলে ইচ্ছামত কাজ কবতে পাবতেন। লেখপদ্ধতিতে সংকলিত ১২৩১-এব একটি দস্তাবেজ থেকে জানা যায় যে ভীমেব শাসনকালে তিনি মহামণ্ডলাধিপতি রাণকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রভুব কাছ থেকে জাযগীবরূপে তিনি খেটকাধাব পথক পেয়েছিলেন।[২] এই জায়গীব লাভ কবাব ফলে নিশ্চিতরূপে তাঁব প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, কাবণ ১১৭৩-এব শিলালিপি অনুসাবে অজয়পাল দ্বারা নিযুক্ত একজন দণ্ডনায়ক মাত্র (তন্নিযুক্তদণ্ডনাযক) ছিলেন[৩] কিন্তু এখন তিনি স্বযং খেটবাধারে দণ্ডনায়ক নিযুক্ত কবেছিলেন (তন্নিযুক্তদণ্ডনায়ক শ্রীমাধব)।[৪] অজযপালের শাসনকালে ১১৭৫-এ অন্য একজন শক্তিশালী সামন্তেব উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন চাহমান মণ্ডলেশ্বব বৈজল্লদেব যিনি বাজকৃপায নর্মদাতটবর্তী শাসকপদ উপভোগ কবেছিলেন (অজযপালদেবেন প্রসাদীকৃত্যে)।[৫] তিনি নিজ মণ্ডলে নিজ প্রভুব অনুমতি ছাড়াই একটি গ্রামদান কবেছিলেন।[৬] এব দ্বাবা প্রতীয়মান হয় যে বৈজল্লদেব উপসামন্ত নিযুক্ত কবাব অধিকাবী ছিলেন। কিন্তু তিনি যে পথককে এই অনুদান দিয়েছিলেন সেটি তিনি অজয়পালেব কাছ থেকে পত্তলারূপে (লেখপদ্ধতি অনুসাবে পত্তলা শব্দেব অর্থ কোনো নির্দিষ্ট বাজসেবাব পবিবর্তে প্রাপ্ত জাযগীব) পেয়েছিলেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। ১২০৯-এ মহামাত্য প্রতীহাব সোমবাজদেবেব নামে জাবী করা অনুদানপত্রটিই গুজবাটেব পত্তলাব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উদাহবণ। এব দ্বাবা তিনি সম্ভবতঃ ভীমদেবেব নিকট থেকে সমগ্র সৌবাষ্ট্রমণ্ডল জায়গীর পেয়েছিলেন।[৭]

১। ই. এ. xviii, ৩৪৭, প ১-১১, লেখপদ্ধতির পঞ্চম পৃষ্ঠায উদ্ধৃত শিলালিপিটিতে ব্যবহৃত লুণপসাক শব্দটি সংস্কৃত লবণপ্রসাদ শব্দটিরই প্রাকৃতরূপ।

২। 'প্রভোপ্রসাদনমহামণ্ডলাধিপতিরাণকশ্রীলাবণ্যদেবপ্রসাদেন প্রসাদপত্তলায়াম ভুজ্যমান-খেটকাধারপথক তন্নিযুক্তদণ্ডনায়ক শ্রীমাধব প্রভৃতি পঞ্চকুল প্রতিপত্তৌ তাম্রশাসনম্‌ লিখ্যতে যথা।' লেখপদ্ধতি, পৃঃ ৫

৩। ই. এ. xviii, ৩৪৭ প ১-১১

৪। লেখপদ্ধতি, পৃঃ ৫

৫। ই এ. xviii, ৮৪-৫, প ৭-৮

৬। ঐ, প ৯-২১

৭। 'অস্ত প্রভোঃ প্রসাদাবাপ্তপত্তলয়াভুজ্যমান শ্রীসৌরাষ্ট্র মণ্ডলে।' ই. এ. xviii, ১১৩, প ১৯-২৩। লেখপদ্ধতির পঞ্চম পৃষ্ঠায় ১২৩১-এর একটি তাম্রশাসনের যে নমুনা দেওয়া হয়েছে সেটিতে ঠিক এই শব্দগুলিই ব্যবহৃত হয়েছে।

পরবর্তীকালে ১২৬০-এ একটি পত্তলার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পত্তলায় কোনো মহামণ্ডলেশ্বর রাণককে জায়গীররূপে সম্ভবতঃ একটি পথক দান করা হয়েছিল।[১]

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি থেকে বোঝা যায় যে উত্তর ভারত, বিশেষ করে উত্তর-প্রদেশ, মধ্যভারত. রাজস্থান এবং গুজরাটের প্রায় সকল রাজবংশের শাসকগণ নিজ নিজ সামন্ত ও রাজপদাধিকারীগণকে তাঁদের রাজসেবার পরিবর্তে অনুদানস্বরূপ গ্রামদান করতেন। প্রস্তর ও তাম্রপত্রে লিখিত বহু অনুদানপত্র পাওয়া গিয়েছে; যেগুলি থেকে ক্রমবর্ধমান ভূমি অনুদানের অনুমান করা যায় এবং ধর্মেতর পদাধিকারীগণের গুরুত্ববৃদ্ধির পরিচয়ও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তাঁরা এই সময় রাজার কাছ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাবার জন্য ইচ্ছুক ছিলেন।

১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে রাজপদাধিকারীদের বেতন হিসাবে নিয়মিত রাজস্বের অংশবিশেষ অথবা কোনো বিশেষ করের আয় প্রদান করা হত। বঘেলখণ্ডের কলচুরিদের অধীনস্থ ছোট ছোট আমলাদের যেমন পট্টকিল (কর আদায়ের দায়িত্ব-সম্পন্ন গ্রামপ্রধান) এবং দুষ্টসাধ্য (অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা ও তাদের দণ্ডবিধানের ব্যবস্থাকারী পদাধিকারী) এঁদের উপরোক্ত ব্যবস্থানুযায়ী বেতন দেওয়া হত। জয়সিংহ (১১৬৩-৮৮) কর্তৃক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত একটি অনুদান থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে, কারণ তাকে যেসকল অধিকারসহ একটি গ্রামদান করা হয়েছিল তার মধ্যে পট্টকিল ও দুষ্টসাধ্যের জন্য নির্ধারিত কর আদায়ের অধিকারও অন্তর্ভূক্ত ছিল।[২] পট্টকিল রাজকীয় কর আদায় ছাড়া নিজ বেতনের জন্য নির্ধারিত কর আদায় করত। এইরূপ পরিস্থিতিতে দুর্বল রাজার অধীনস্থ পট্টকিলগণ নিজ এলাকাভুক্ত গ্রামে নিজ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে থাকলে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু দুষ্টসাধ্যের সম্বন্ধে এমন কথা বলা যায় না, কারণ সে নিজ বেতনের জন্য নির্দিষ্ট করই শুধু আদায় করত। এই দুই প্রকার পদাধিকারী ছাড়া বিশেনিম, বৈষয়িক এবং অর্ধপুরুষারিকদেরও করের দ্বারা বেতন দেওয়া হত।[৩] এই তিন প্রকার পদাধিকারীদের কর্তব্য কি ছিল, সেটা অবশ্য আমরা ঠিক জানি না। গ্রামের জমির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ যাই থাকুক না কেন, কোনো সন্দেহ নেই যে এদের বেতনরূপে কিছু নির্দিষ্ট কর আলাদা করে রাখা হত। আবার বেতনদানের এই প্রথা যে কেবল কলচুরিরাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন কথাও বলা যায় না। চন্দেলদের অধীনস্থ ছোট ছোট আমলা এবং গাহড়-

১। এ. ই. xviii, ২১০, প ৮-১০
২। ক. ই. ই. iv, নং ৬৩, প ১৯-২৫, পরিশিষ্ট ৮
৩। ঐ

ওয়ালদের অধীনস্থ বড় বড় পদাধিকারীদেরও জীবিকানির্বাহের জন্য কিছু কর নির্দিষ্ট করে রাখা হত।

চন্দেলদের রাজ্যে রাজপদাধিকারীদের গ্রামে কিছু অধিকার দেওয়া হত। এই প্রথা দ্বাদশ শতাব্দীব উত্তরার্ধে পরমর্দিনেব সময় থেকে সুরু হয়েছিল। ১১৭২ ও ১১৭৮-এর অনুদানপত্রে সামন্ত রাজপদাধিকারী বনপদাধিকারী, ভাট ইত্যাদিকে অনুদানে প্রদত্ত গ্রামে দস্তুরভাতা পবিত্যাগ করাব নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।[১] ১২০৮-এ ত্রৈলোক্যবর্মণ একজন বংশানুক্রমিক রাউতকে একটি অনুদান দিয়েছিলেন, তাতে সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদেব উক্ত অধিকারগুলি পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এ কথা স্পষ্ট জানা যায় না যে রাজপদাধিকারীদের এই দস্তুরভাতা গ্রহণের অধিকাব (নগদে অথবা ভূমি অনুদানরূপে) নিয়মিত বেতনের অতিরিক্ত ছিল, অথবা বেতনের পবিবর্তে ছিল। কিন্তু এই প্রথার ফলে এমন এক মধ্যবর্তী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, কৃষকদেব জমির উপব যাদেব কিছু স্বার্থ কায়েম হয়ে গিয়েছিল। যেসমস্ত পদাধিকারীর অধিকাব হবণ করা হত, তাদেব অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত কিনা তাও আমরা জানি না। তা হলেও এ কথা স্পষ্ট যে মাঝে মাঝে রাজা এই সকল অধিকার প্রত্যাহাব কবে নেওয়াব ফলে, জমির উপব সরকারী আমলাদের আধিপত্য নিশ্চিতরূপে দুর্বল হয়ে যেত। তা ছাড়া চাষীদের উৎপন্ন ফসলের অংশবিশেষের উপর আরও অনেকের অধিকার এসে পড়ায় সরকারী আমলা-দের প্রভাব এতটা কার্যকর হত না।

গাহরওয়ালরাজ্যে পদাধিকারীগণ রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ উপভোগ করত অক্ষপটলিক (হিসাব পরীক্ষক ও রাজপদাধিকারী) উৎপন্ন ফসলেব অংশবিশেষের অধিকারী ছিলেন। এই অংশ সম্ভবতঃ গৃহপ্রতি এক 'প্রস্থ' ছিল। এই অংশ বোঝাতে গিয়ে কোথাও অক্ষপটলপ্রস্থ[২] আবাব কোথাও বা অক্ষপটালাদায়[৩] শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রতীহাবও উৎপন্ন ফসলের অনুরূপ অংশেব অধিকারী ছিল।[৪] এ ছাড়া বিশতিঅধুপ্রস্থ[৫] নামক একপ্রকাব করেব উল্লেখও পাওয়া যায়। অক্ষপটলপ্রস্থ ও প্রতীহারপ্রস্থ শব্দদুটির সঙ্গে এই শব্দটির সাম্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে এটিও কোনো পদাধিকারীকে প্রদত্ত ফসলেব অংশের মাপবিশেষের নাম ছিল। কিন্তু গাহরওয়াল রাজপদাধিকারীদের নামের যে ছোট তালিকা পাওয়া যায়, সেটিতে

১। ক. ই. xxxi, নং ১১, প ১৭
২। ই. এ. xvi, ১০৩, প ১২
৩। ঐ xviii, ১১, প ২১
৪। ঐ xiv, ১০৩, প ১২, এ. ই. ii, নং ২৯
৫। ঐ এবং এ. ই. ii, নং ২৯, প ১০-৬ তুলনীয়

বিশতিঅধুপ্রস্থ নামক অধিকারীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। মদনপালের একটি তাম্রপত্রে ৮৪টি গ্রামের যে এককের উল্লেখ হয়েছে[১] এবং যেহেতু ২৮, ৮৪'র এক-তৃতীয়াংশ অতএব এই পদাধিকারী সম্ভবতঃ ২৮টি গ্রাম-এককের রাজস্বের অধিকারী ছিল। কিন্তু এ বিষয়েও নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। এই পদাধিকারীর কাজ ও পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, এ কথা স্পষ্ট জানা যায় না যে উক্ত প্রস্থপ্রাপক, তিন ধরনের পদাধিকারীগণ শুধু প্রস্থই পেত, নাকি তা ছাড়া অন্য কিছুও পেত। এখানেও পরিস্থিতি চন্দেলদের রাজ্যের অনুরূপ ছিল। একজন কৃষককে তার উৎপন্ন ফসলের কিছু-কিছু অনেককে দিতে হত, কাজেই কেউই সেই জমির উপর একছত্র অধিকাব কায়েম করতে পারত না। তা ছাড়া পদাধিকারীদের বৃত্তিরূপে জমির ফসলের অংশ-বিশেষ প্রদান করার প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল না, কারণ উপরোক্ত তিনটি শব্দের উল্লেখ মাত্র মাহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রপটেই হয়েছে।[২] অক্ষপটলপ্রস্থ, প্রতীহার-প্রস্থ, বিশতিঅধুপ্রস্থ ১১০৪[৩] সালের বসাহি ফলকে পাওয়া যায়। কেবল অক্ষ-পটালাদায় শব্দটি ১১০৯[৪]-এর বেশ কয়েকটি তাম্রপটে পাওয়া যায় এবং ১১০৩[৫]-এর একটি তাম্রপত্রে বিংশতিচ্ছবথ শব্দেব উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই শব্দটি বিশতিঅধু-প্রস্থেব বিকৃত রূপ। মনে হয় ১২শ শতাব্দীব শেষ বৎসবগুলিতে গাহরওয়ালরাজ্যে রাজপদাধিকারীগণ এতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁবা এইপ্রকার দস্তরভাতার দাবি করতেন নিজেদের অধিকাবরূপে।

চাহমানদের রাজত্বে এই প্রথা সীমিতরূপে প্রচলিত ছিল। তাঁরা বলাধিপদের (একপ্রকার সামরিক পদাধিকাবী) জন্য গ্রামের উপর বিশেষ এক ধরনের কর আরোপ করেছিলেন। ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দের একটি তাম্রপত্রে চৌলুক্যবাজ কুমারপালের সামন্ত অহ্লন দুটি পৃথক গ্রামেব বলাধিপাভাব্য নামক কর দুটি পৃথক মন্দিরকে অনুদান দিয়েছিলেন।[৬] এই করকে চুঙ্গিঘর অথবা মণ্ডপিকা থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের অংশরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, কাবণ বলাধিপ ছিল মণ্ডপিকার পদাধিকারী।[৭] কিন্তু উপরোক্ত দৃষ্টান্ত দুটিতে দেখা যায় যে এই কর গ্রামবাসীদের উপরই আরোপ করা হয়েছে। সেজন্য মনে হয় এই কর কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করা হত এবং এই কর

১। জার্নাল অফ ইউ. পি. হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি xiv, পৃ ১০-১। নিয়োগী এটি সংশোধন করেছেন পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট 'বি', নং ৮, প ১৫৩

২। নিয়োগী—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৬৩

৩। ই. এ. xiv, ১০৩, প ১২

৪। ঐ xviii, ১৮-৯, প ২০-৪

৫। এ. ই. নং ২৯, প ১৫-৬

৬। আর্লি চৌহান ডাইনেষ্টিজ, প ১৮৭, প্লেট II, প-৯-১১, ১৩-১৪

৭। ঐ, পৃঃ ২৯৫, পাদটীকা ৮৫

অক্ষপটলপ্রস্থ ও প্রতীহারপ্রস্থের অনুরূপ ছিল। সামরিক পদাধিকারীদের মধ্যে সেনাপতির পরই মর্যাদার স্থান ছিল বলাধিপের, কিন্তু আমাদের কাছে এমন কোনো প্রমাণ নেই যার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে বলাধিপাভাব্যই বলাধিপদের একমাত্র বেতন ছিল, অথবা এটা তাদের মূল বেতনের একটা অংশমাত্র ছিল।

বিভিন্ন রাজপদাধিকারীদের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে বিশেষ বিশেষ কর আদায়ের প্রথার আরম্ভ এবং বিকাশ আমাদের আলোচ্যবিষয়ের পক্ষে গুরুত্বজনক। এই প্রথার সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম থেকেই হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে আইনশৃংখলা রক্ষার জন্য প্রেরিত চাট ও ভাটদের (সৈনিক ও পুলিস) আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা গ্রামবাসীদের করতে হত।[১] এই উদ্দেশ্যে তাদের উপর বসতিদণ্ড নামক হাল্কা করও আরোপ করা হত, এই কর সম্ভবতঃ বস্তুতে গ্রহণ করা হত।[২] ষষ্ঠ শতাব্দীতে মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে রাজপদাধিকারীদের আহারের ব্যবস্থার জন্য গ্রামবাসীদের জেমক-কর-ভর নামক একপ্রকার কর দিতে হত।[৩] কিন্তু প্রারম্ভিক অনুদানপত্রগুলিতে রাজপদাধিকারীদের জন্য কোনো নিয়মিত প্রাপ্যের উল্লেখ নেই। অবশ্য রাজাভাব্য, রাজকুলীয, রাজকুলাভাব্য বা রাজকুলাদেয় ইত্যাদি কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। দশম শতাব্দীর পর এইরূপ কর আদায়ের ঘটনা সাধারণভাবে বিরল হয়ে এসেছিল, কারণ এখন ত রাজকুমার ও রানীদের তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যয়নির্বাহের জন্য জায়গীর দেওয়া হত। কিন্তু সকল রাজপুরুষ সম্ভবতঃ জায়গীর পেতেন না এবং সেইজন্য তাঁদের ব্যয়নির্বাহের জন্য কিছু কর নির্দিষ্ট করে রাখা হত। এইভাবে আমরা দেখি যে ছোট ছোট রাজকর্মচারীদের কখনও কখনও দেবার জন্য এবং রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের সম্ভবতঃ নিয়মিতরূপে দেবার জন্য যে করের উদ্ভব হয়েছিল, কলচুরি চন্দেল, গাহড়ওয়াল ও চাহমানদের অধীনস্থ কিছু রাজপদাধিকারীদের নির্বাহের জন্য, সেই করই নিয়মিত করের রূপ গ্রহণ করেছিল। মহারাষ্ট্রে শিলাহারের রাজ্যেও বেতনদানের এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সেখানে নাগাবুণ্ড নামক বংশানুক্রমিক পদের অধিকারীদের স্বর্ণের দ্বারা বেতন দেওয়া হত না, তাদের জন্য কিছু কর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত।[৪] তাৎপর্য এই যে পদাধিকারীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য রাজস্বের কোনো-কোনো অংশ পৃথক করে রাখাই এই যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল।

১। ক. ই. ই. iv, ১৫৬, পাদটীকা ২
২। ঐ
৩। ঐ, নং ১২০, প ১৮-২০
৪। এ. ই. xxvii, ১৭৯ এবং পাদটীকা ১

যদিও সামন্ত ও রাজপদাধিকারী উভয়কেই তাদের রাজসেবার পুরস্কার হিসাবে ভূমি অনুদান দেওয়া হত তবু দুইয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিল। পুরোহিত, জ্যোতিষী, সান্ধিবিগ্রহিক, সচিব, প্রতীহার, মহাসাধনিক, মহামাত্য ইত্যাদি অসামরিক ও সামরিক পদাধিকারীদের ভূমি অনুদান দেওয়া হত, তাদের পদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু কর্তব্যের অপেক্ষা রেখে। চাহমান ও পরমারদের রাজত্বে রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের প্রশাসনের জন্য যে ক্ষেত্র সমর্পণ করা হত, সেই সকল অঞ্চলে তাঁদের স্থানীয় কার্যনির্বাহক এবং বিচারসম্বন্ধীয় দায়িত্ব ত পালন করতেই হত, সেই সঙ্গে সামরিক দায়িত্বও গ্রহণ করতে হত। তাঁদের এই দায়িত্বপালনের পরিবর্তে তাঁদের জায়গীর দেওয়া হত এবং এই জায়গীরে বেশ কয়েকটি গ্রাম অন্তর্ভূক্ত থাকত। অনুরূপ দায়িত্বপালন হয়ত কিছুসংখ্যক সামন্তদেরও করতে হত; যাদের সঙ্গে রাজপরিবারের কোনো রক্তসম্বন্ধ ছিল না। শিলালিপিতে সামন্তদের বহুশ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন—রাজা, রাজরাজনক, রাণক, রাজপুত্র, ঠক্কুর, সামন্ত, মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি, মহাসামন্তরাণক, সামন্তকরাজা, ভোক্তা, ভোগিক, ভোগিজন, ভোগপতিক, বৃহদ্ভোগিক[১] ইত্যাদি। কিন্তু শিলালিপিতে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় যে মাত্র পাঁচ শ্রেণীর সামন্তদেরই ভূমি অনুদান দেওয়া হত; তাঁরা হলেন সামন্ত, মহাসামন্ত, রাণক, রাজপুত্র এবং মাণ্ডলিক। অবশ্য এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন যে এদের মধ্যে কাকে কতটা ক্ষেত্র প্রশাসনের জন্য প্রদান করা হত। শুক্রনীতিসার গ্রন্থে ১১শ-১২শ শতাব্দীর শিলালিপিতে প্রযুক্ত কিছু শব্দাবলীর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে সামন্তের পরিভাষারূপে বলা হয়েছে যে ১০০টি গ্রামের শাসককে সামন্ত বলা হত এবং এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্র থেকে বার্ষিক ১৩০০০০০ কর্ষ রাজস্ব আদায় হত।[২] মাণ্ডলিকের বার্ষিক আয় সম্পর্কে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তার বার্ষিক আয় ৩০০০০০ থেকে ১০০০০০০ কর্ষ পর্যন্ত হত।[৩] এই সকল দৃষ্টান্তের সাহায্যে সামন্তদের তুলনামূলক পদমর্যাদার ইঙ্গিত পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। এই সামন্তদের যত বড় ক্ষেত্রই দেওয়া হোক না কেন, কিছুসংখ্যক রাণক ও মণ্ডলেশ্বরকে যে ভূমি দেওয়া হত, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তার পূর্ণ প্রভুত্বলাভ করতেন। কারণ দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা

১। রাধাকৃষ্ণ চৌধুরী, জ. ই. হি. (৩৭, ৩৮৯) গ্রন্থে লিখিত তাঁর একটি প্রবন্ধে এঁদের মধ্যে কারও কারও উল্লেখ করেছেন।

২। অনুঃ বি. কে. সরকার i, ৩৬৫-৭, ৫৮১-২। সম্প্রতি এল, গোপাল দেখিয়েছেন যে এটির সংকলন ১৯শ শতাব্দীর পূর্বার্ধে করা হয়েছিল। (বি. এস. ও. এ. এস. xxv, ভাগ ৩, ১৯৬২)

৩। ঐ i, ৩৬৮-৭৪

প্রভুর অনুমতি ব্যতীতই ধর্মীয় অনুদান দিয়ে থাকতেন। আবার বিপরীতপক্ষে রাজপদাধিকারীগণকে এমন কি প্রাদেশিক শাসকগণকেই এইরূপ অনুদান দিতে হলে প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করতে হত। তা ছাড়া বহু সামন্তের সঙ্গে প্রভুর থাকত রক্তসম্বন্ধ, কিন্তু প্রভুর সঙ্গে রাজপদাধিকারীদের সাধারণতঃ এইরূপ কোনো সম্বন্ধ থাকত না। অবশ্য সকল সামন্তের সঙ্গে রাজার যে রক্তসম্বন্ধ থাকত তাও নয়। পালগণ কৈবর্তদের ভূমি অনুদান দিয়েছিলেন যদিও পালদের সঙ্গে তাদের কোনো রক্তসম্বন্ধ ছিল না। অনুরূপভাবে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে উড়িষ্যায় সামন্তদের সঙ্গে এবং গুজরাটে রাণকদের সঙ্গে, তাদের প্রভুদের রক্তসম্বন্ধ ছিল। দেশের অন্যান্য স্থানেও ভূমি অনুদান পেয়েছিল এমন বহু সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাদের প্রভুর কোনো আত্মীয়তা ছিল না। রাজস্থান ও গুজরাটে রাজপুত শাসন-ব্যবস্থার এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে ভারতে প্রথমতঃ পুরোহিতদের ভূমি অনুদান দেওয়া হত এবং পরবর্তীকালেই ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং রাজার অনাত্মীয় ক্ষত্রিয় পদাধিকারী সামন্ত ইত্যাদিদের বৈষয়িক প্রয়োজনে ভূমি অনুদান দেওয়া আরম্ভ হয়েছিল। তাৎপর্য এই যে রক্তসম্বন্ধের কারণেই যে ভূমি অনুদান দেওয়া হত এ কথা ঠিক নয়। দাতার প্রয়োজন ছিল গ্রহীতাদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করার, এই কারণেই ভূমি অনুদান দেওয়া হত।

আলোচ্যকালে ভারতে সামন্তদের সঙ্গে তাদের প্রভুর সম্পর্ক আংশিকভাবে ফ্রান্স ও জার্মানীর অনুরূপ ছিল। এই দুটি দেশেই সামন্তদের প্রধান কর্তব্য ছিল সামরিকভাবে প্রভুর সেবা করা।[১] অনুরূপভাবে ভারতেও যে সামন্তদের প্রধান কর্তব্য ছিল প্রভুকে সামরিক সাহায্য প্রদান করা সে কথা সাহিত্যিক এবং শিলালৈপিক সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয়। ধনপালকৃত 'তিলকমঞ্জরী'তে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যার থেকে প্রতীয়মান হয় যে সামন্ত যুদ্ধকালে সর্বদা তার প্রভুর সহযোগী হত।[২] মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থেও অনুরূপ উল্লেখ আছে।[৩] এই গ্রন্থ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে মন্ত্রী ও সামন্ত রাজ্যব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।[৪] যদিও পালদের নিজস্ব একটি নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ছিল যার মধ্যে বিভিন্ন

১। ইংল্যাণ্ডে সামন্তগণ তাঁদের প্রভুদেরকে পরামর্শও দিতেন এবং ন্যায়প্রশাসনেও সাহায্য করতেন। ভারতে সামন্তদের এইরূপ কোনো দায়িত্বপালন করতে হত না।

২। পৃঃ ৭১, ৭৪, ৯৩, ১০০

৩। পৃঃ ১৭, ৩২, ৮০

৪। পৃঃ ১৭

রাষ্ট্রের লোক অন্তর্ভূত ছিল।[১] তবু কৈবর্ত বিদ্রোহের সময় রামপালের যেরূপ অসহায় অবস্থা হয়েছিল তার থেকে প্রতীয়মান হয় যে পালরাজগণ সামরিক সাহায্যের জন্য তাদের সামন্তদের কতটা মুখাপেক্ষী ছিলেন। আলোচ্যকালে উত্তর ভারতের শাসকগণ নিজেদের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা সামন্তদের সংগৃহীত সৈন্যদলেরই উপর বেশি নির্ভর করতেন। সম্ভবতঃ প্রত্যেক রাজাই স্থায়ী সৈন্যবাহিনী রাখতেন, কিন্তু ১১শ শতাব্দী ও তার পরবর্তীকালে এই সৈনিকদের কিভাবে বেতন দেওয়া হত, তার সম্বন্ধে আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি না; গাহরওয়ালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের মন্ত্রী লক্ষ্মীধরের এক নির্দেশানুসারে সকল প্রধান যোদ্ধাদের বেতনের অতিরিক্ত বস্ত্রাদি প্রদানের দ্বারা পুরস্কৃত করা প্রত্যাশিত ছিল।[২] কিন্তু এখানেও বেতন শব্দটির দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় না যে নগদ পারিশ্রমিক দেওয়া হত।

এইকালের শিলালিপিগুলি থেকে জানা যায় যে এইকালে অনুদানভোগীর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। চন্দেল ও গাহরওয়ালদের রাজ্যে এদের রাউত আখ্যা দেওয়া হত এবং চৌলুক্যদের রাজত্বে এরা রাজপুত্ররূপে অভিহিত হত। রাউত সংস্কৃত রাজপুত্রেরই তদ্ভব রূপমাত্র এবং মধ্যযুগে রাজপদাধিকারীর একটি বিশেষ পদের সূচক ছিল। রাজপুত্র শব্দটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে এই শব্দটি কেবল চাহমান এবং সম্ভবতঃ চৌলুক্যবংশীয় রাজপুত্রদের উপরই প্রযুক্ত হতে পারে কারণ এই দুটি রাজ্যেই রাজবংশীয় পুরুষরাই রাজপুত্রের মর্যাদা ও পদলাভ করতেন। কিন্তু বুন্দেলখণ্ড ও উত্তরপ্রদেশের রাউতদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ এই তিন বর্ণেরই রাজপুত্র দেখতে পাওয়া যায় এবং এদের অধিকাংশের সঙ্গে শাসকপরিবারের কোনো আত্মীয়সম্বন্ধ ছিল না। চন্দেল অনুদানপত্রগুলি দেখলে কোনো সন্দেহ থাকে না যে সামরিক সাহায্যদানের পুরস্কার হিসাবেই রাউতদের ভূমি অনুদান দেওয়া হত; গাহরওয়ালরাজ জয়চন্দ্রের অধীনস্থ ক্ষত্রিয় রাউত রাজ্যবর্মাকে সম্ভবতঃ সামরিক সাহায্য প্রদানের পুরস্কার হিসাবেই ছটি ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল। মনে হয় রাউত উপাধিধারী সামন্তদের প্রধান দায়িত্বই ছিল নিজ প্রভুকে সামরিক সাহায্যদান করা এবং লেখপদ্ধতি অনুসারে রাজপুত্রদের প্রধান কর্তব্যও ছিল অনুরূপ। পূর্বাঞ্চলের গঙ্গদের অধীনেও অনুরূপ এক শ্রেণীর সামন্ত ছিল যাদের নায়ক নামে অভিহিত করা হত এবং এদের মধ্যে কিছু বৈশ্যবর্ণের ব্যক্তিরাও অন্তর্ভূত ছিল। গঙ্গরাজাগণ এদের বহু ভূমি অনুদান দিয়েছিলেন। শুক্র-

১। 'গৌড়-মালব-খস-হুন-কুলিক-লাট-চাট-ভট-সেবকাদিন।' এ. ই. xxix, নং ১ 'বি', প ৩৮-৯

২। কৃত্যকল্পতরু xi. ৮২

নীতিসারে নায়ককে দশটি গ্রামের প্রশাসক বলা হয়েছে, কিন্তু শিলালিপি থেকে ঠিক জানতে পারা যায় না যে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কত বড় ভূখণ্ড শাসন করত। আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোনো-কোনো পরিবার একের পর এক তিন-পুরুষ ধরে রাউতের পদমর্যাদা ভোগ করত। ফলে ধীরে ধীরে এবং বংশানুক্রমিক-ভাবে সৈনিকশ্রেণীর উদ্ভব হল যাদের জীবিকানির্বাহ হত পরিবারের সদস্যদের কাছে দান জায়গীর থেকে।[১] এই বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তীকালে লক্ষিত হয় না এবং এটা ইউরোপের বংশানুক্রমিক সৈনিক পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে এইকালে সামন্তগণ রাজনীতি ও প্রশাসন-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উত্তরাধিকারসম্বন্ধীয় বিবাদ-বিসংবাদে তাদের বিচারই হত চূড়ান্ত। গোপালের পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তটি আমাদের জানা আছে। পরবর্তীকালে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ণয় সম্ভবতঃ সামন্তরাই করত। এ বিষয়ে এখানে আমরা আসামের শালস্তম্ভ, উড়িষ্যার সোমবংশীয় শাসক এবং রাজস্থানের চাহমানদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে পারি। অপুত্রক অবস্থায় দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজের মৃত্যু হলে সামন্তমন্ত্রীগণ গুজরাট থেকে সোমেশ্বরকে নিয়ে এসে আজমীরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবিকারূপে তাঁর স্ত্রী রানী কর্পূরদেবীকে তাঁরাই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[২] একইভাবে কাশ্মীরের রাজা নির্বাচন করার জন্য তন্ত্রী ও একাঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সামন্তদেরও মাঝে মাঝে আহ্বান জানান হত।[৩]

১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে পূর্ববর্তীকালের ন্যায় রাজাদের ভূমিদানের অধিকার ততটা অক্ষুণ্ণ ছিল না। চৌলুক্যরাজ্যে মহামাত্যের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। তিনি একপ্রকার সামন্তমন্ত্রী ছিলেন। অনুদান দেবার জন্য চৌলুক্যরাজাদের মহামাত্যের সম্মতিলাভের প্রয়োজন হত। এই প্রথা পূর্ববর্তী-কালে ছিল না। এই প্রথার ফলে রাজারা যে ভূমি অনুদান দিতে পারতেন না তা বলা চলে না, তবে মহামাত্যের সঙ্গে পরামর্শ ত করতেই হত।

পূর্ববর্তী অনুদানপত্রগুলিতে সান্ধিবিগ্রহিক এবং অনুদানকে কার্যকর করার ভারপ্রাপ্ত দূতকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হত। এই পদাধিকারীগণ অনুদান অনুমোদনের অধিকারী ছিল কিনা সেটা বোঝা যায় না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য-

১। 'জার্নাল অফ অন্ধ্র হিষ্টোরিক্যাল রিসার্চ সোসাইটি' (xxviii, ৩০--৪১)-তে লিখিত 'ফিউডাল কম্পোজিসন অফ দি আর্মি ইন আর্লি মিডাইভাল ইণ্ডিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে ডাঃ শ্রীমতী কে. কে. গোপাল এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

২। দশরথ শর্মা—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৯৯

৩। রাজতরঙ্গিনী V, ২৫০

কালে বিশেষ কবে ১২শ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং ১৩শ শতাব্দীর কোনো-কোনো অনুদানপত্রে এদেব অনুমোদনেব উল্লেখ আছে। পবমাবরাজ দ্বিতীয় জযবর্মার একটি অনুদানপত্রে দেখা যায যে (১২৬০-৬১) কযেকজন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত তাঁব গ্রাম অনুদান সান্ধিবিগ্রহিক পণ্ডিত মালাধব অনুমোদন কবছেন।[১] কয়েকটি সেন অনুদানপত্রেও ভূমি অনুদান বিষযে সামন্ত ও অন্যান্য রাজপদাধিকাবীদেব ক্রমবর্ধমান গুরুত্বেব পবিচয পাওয়া যায। প্রাথমিক সেন অনুদানপত্রগুলিব মধ্যে দুটিতে দেখা যায যে একটি বাজা এবং অপবটি সান্ধিবিগ্রহিক অনুমোদন কবেছেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনেব বাজত্বকালেব পঞ্চবিংশ ও সপ্তবিংশ বর্ষেব অনুদানপত্রগুলিতে উচ্চ বাজপদাধিকাবীদেব ক্রমবর্ধমান গুরুত্বেব আভাস পাওযা যায়। এদেব মধ্যে অধিকাংশই ছিল সামন্ত, অনুদানপত্রগুলিকে কার্যকব বাখাব জন্য তাদেব অনুমোদন ও সম্মতি প্রযোজন ছিল। একটি অনুদানপত্রে পাঁচজন বাজপুরুষেব অনুমোদনেব উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ তাদেব মধ্যে একজন হলেন বাজা স্বযং।[২]

যদিও বাজনীতিতে ও প্রশাসনব্যবস্থায সামন্তদেব যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তবু তাবা ইংল্যাণ্ডেব সামন্তদেব মত নিজেদেব কোনো সংগঠন বা সমিতি প্রতিষ্ঠা কবতে পাবে নি। শিলালিপি ও সাহিত্যে 'সামন্তচক্র' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত হলেও শব্দটি কিন্তু কোনো সংগঠনেব ইঙ্গিত দেয় না। সম্ভবতঃ কবিচক্রেব মত এটিও একটি সাহিত্যিক প্রয়োগমাত্র।[৩] সামন্তদেব প্রভুব সভাপতিত্বে কখনও কখনও হয়ত দববাব বসত, কিন্তু সেই সভায সামন্তগণ নিজ নিজ বক্তব্য পেশ কবত, বা তদনুসারে কার্যপরিচালনা হত, এ বকম মনে হয় না। এটিকে মুসলিম শাসনকালের দববাবেব অনুরূপ বলা চলতে পাবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডেব পার্লামেণ্টেব জননীস্বরূপ মধ্যযুগীয় ইংল্যাণ্ডেব সামন্তসভাব অনুরূপ ছিল না এই দববাব। অবশ্য এটা সম্ভব যে সামন্তগণ নিজ নিজ শাসনাধীন এলাকায় পৃথক পৃথক ভাবে ন্যায প্রশাসন, শাসনব্যবস্থা এবং বিধি-বিধানেব ব্যবস্থা কবত। কিন্তু তাদেব কোনো সংযুক্ত সভা ছিল না। তথাপি সামন্তদেব এক বংশানুক্রমিক সামাজিক শ্রেণীরূপে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। বাক্‌পতিবাজ স্থবির প্রতি প্রযুক্ত 'সামন্ত-জন্ম' বিশেষণটি থেকে তার প্রমাণ পাওযা যায়। বলা হযে থাকে যে যদিও জন্মগতভাবে তিনি সামন্ত ছিলেন তথাপি কবিকুলের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছিলেন।[৪]

১। এ. ই. IX, ১১৯

২। জা. র. এ. সো বি. শৃঙ্খলা III, VIII, ৩৪-৩৫। পাঁচজন অনুমোদক ছিলেন (১) শ্রী নি, (২) মহাসম নি, (৩) শ্রীমদ্ রাজ নি, (৪) শ্রীমদ্ শঙ্কর নি (৫) শ্রীমদ্ সাহস মোল্ল নি।

৩। উদয়সুন্দরী কথা পৃঃ ২৭

৪। 'সামন্ত জন্মাপি কবিবরাণাম্ মহত্তমোবাক্‌পতিরাজসুরি।' ঐ, পৃঃ ১৫৪

আলোচ্যকালে রাজপদাধিকারীগণের সামন্তীকরণ চরম পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে গিয়েছিল। পদাধিকারীগণকে ভূমি অনুদান ত দেওয়া হতই, তার সঙ্গে সঙ্গে উপাধিও প্রদান করা হত। এই উপাধির সঙ্গে তাদের প্রকৃত কার্যের কোনো সম্পর্ক থাকত না। উপাধিগুলি তাদের পদমর্যাদার সূচকমাত্র ছিল। বাংলা ও বিহারেই এই প্রবৃত্তির বাহুল্য দেখা যায়। পালদের অধীনস্থ একজন সাধারণ সামন্ত মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ তার একটি অনুদানপত্রে চার ডজনেরও বেশি পদাধিকারীর উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে তেরজনের পদনামের সঙ্গে মহা উপসর্গে সংযুক্ত করা হয়েছে।[১] এটি উপবোক্ত প্রবৃত্তিব একটি দৃষ্টান্তমাত্র। অনুরূপভাবে দক্ষিণ মুঙ্গেরের অন্য একজন মহামাণ্ডলিক সংগ্রামগুপ্ত তার একটি অনুদানপত্রের সূচনা যেসকল রাজপদাধিকারী ও বাজপুরুষদের দিয়েছেন, তাদেব মধ্যে ১৮ জনেব পদনামের সঙ্গে মহা উপসর্গ সংযুক্ত করা হয়েছে।[২]

পাল ও বঙ্গ আর বিহারের অন্যান্য রাজবংশেব অনুদানপত্রগুলি থেকে জানা যায় যে 'মহা' উপসর্গযুক্ত পদাধিকারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সুরুতে ধর্মপাল ও দেবপালেব অধীনস্থ সতেবজন এবং অবশেষে সংগ্রামগুপ্তের কালে এই-রূপ আঠারোজনেব নামের উল্লেখ দেখা যায়। সংগ্রামগুপ্তের সময় রাজপদাধিকারী-দের সামন্তীকরণক্রিয়া চরমে পৌঁছেছিল। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে বাজাব শক্তি যত কম হত তাঁর বাজ্যে 'মহা' উপসর্গধারী পদাধিকাবীর সংখ্যা হত তত বেশি এবং এইভাবে পরবর্তীকালের বাজ্যগুলিতে রাজপদাধিকারীব সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সামন্তদেব এইরূপ বড় বড উপাধির প্রতি কোনো মোহ লক্ষিত হয় না। একমাত্র ব্যতিক্রম কলচুরিরাজ্য যেখানে মহা উপসর্গযুক্ত চোদ্দজন পদাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩] কিন্তু রাণক ও ঠক্কুর এই দুটি সামন্তীয় উপাধি উত্তর ভারতে বহুল প্রচলিত ছিল এবং বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর পদাধিকারীর জন্য এগুলির যথেষ্ট প্রয়োগ হয়েছিল। তার সব চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ কায়স্থ লিপিকরদের এই উপাধি তাদের কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে দেওয়া হত না বরং তাদের সামন্তীয় ও সামাজিক মর্যাদার জন্যই দেওয়া হত।

১। এঁরা হলেন, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপ্রতীহার, মহাকরণাধ্যক্ষ, মহাপাদমূলিক, মহাভোগপতি, মহাতন্ত্রাধিকৃত, মহাব্যূহপতি, মহাদণ্ডনায়ক, মহাকায়স্থ, মহাবলকোষ্ঠিক, মহাবলাধিকাণক, মহাসামন্ত, মহাকটুক। ১ 'বি' iii, ১৫৬-৭, প ১০-২১

২। জা. বি. ও. রি. সো. v, ৫৯৩-৪, প ৬-৮

৩। ক. ই. ই. iv, নং ৪৮, প ৩২-৫। এই তালিকাতে মহাদেবী এবং মহারাজপুত্রও অন্তর্ভুক্ত।

মনে হয় পদাধিকারীদের তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব ও মর্যাদানুযায়ী বিভিন্ন সামন্তীয় শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হত।

প্রথম প্রথম মন্দির ও পুরোহিতদেরই ভূমি অনুদান দেওয়া হত এবং মধ্যযুগের প্রারম্ভেও অধিকাংশ অনুদান এরাই পেয়েছিল। এই কারণেই রাজপদাধিকারী এবং সামন্তদের প্রদত্ত অনুদানপত্রেও সর্বপ্রকার ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়েছিল, এমন কি শাপসূচক শ্লোকগুলিও উদ্ধৃত করা হয়েছিল। সামরিক ও অসামরিক পদে নিযুক্ত ব্রাহ্মণকে অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুদান প্রদানে কোনো বাধা ছিল না, কারণ তারা জন্মগতভাবেই ধর্মীয় অনুদানলাভের অধিকারী ছিল। কিন্তু অব্রাহ্মণ সামন্ত বা অন্য পদাধিকারীকেও ধর্মীয় অনুদান প্রদানের যে রীতি অনুসরণ করা হত, তার কারণ হল তখনও ভিন্ন রীতির অনুদান প্রদানের উদ্ভব হয় নি। ক্রমে ধর্মেতর অনুদান প্রদানের রীতির উদ্ভব হল এবং অনুদানের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উড়িষ্যায় একাদশ শতাব্দীর সুরুতে কায়স্থ মন্ত্রীকে প্রদত্ত একটি অনুদানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অনুদানপত্রটিতে চন্দ্রসূর্যের অস্তিত্ব[১] পর্যন্ত অনুদান কার্যকর থাকবে এমন কোনো উল্লেখ নেই, কিন্তু অনুদানের ফলে দাতার পুণ্যলাভের উল্লেখ আছে। চন্দেল রাজাদের দ্বারা রাউতদের প্রদত্ত অনুদানেও আমরা অনুরূপ ব্যবস্থা লক্ষ্য করি।[২] জনৈক বংশানুক্রমিকভাবে ব্রাহ্মণ রাউতকে প্রদত্ত একটি অনুদানে চিরস্থায়ী প্রভুত্ব প্রদানের ধারাটিও বাদ দেওয়া হয়েছে।[৩] কিন্তু ১১২৫-এর একটি শিলাহার অনুদানপত্রে এই ধারাটি অক্ষুণ্ণ আছে। এটিতে গণ্ডরাদিত্য নিজ সামন্ত নোলম্বকে এই সর্তে দুটি গ্রামদান করেছিলেন যে সে এবং তার বংশধরগণ চন্দ্রসূর্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুদান ভোগ করতে পারবে।[৪] অবশ্য এই অনুদানের ফলে কোনো পুণ্যলাভের উল্লেখ নেই। তবে এ কথা ঠিক যে কোনো শিলালিপিতেই সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানের উল্লেখ পাওয়া যায় নি। সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষভাবে ও ভাষায় প্রস্তুত অনুদানপত্রের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ গুপ্তকালীন স্মৃতিগ্রন্থে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লেখপদ্ধতিতে এইরূপ অনুদানপত্রের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই পুস্তকে রাজা, মহামাত্য এবং রাণকদের দ্বারা জারী করা যেসমস্ত অনুদানপত্রের নমুনা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুদানপত্রে যেসমস্ত শব্দ ব্যবহার করা হত, সেগুলি নেই। যদিও এইরূপ অনুদানপত্রের (পত্তলা) কোনো শিলালিপি পাওয়া যায় নি, তবু এটা

১। এ. ই. xix, নং ২৬
২। ঐ xvi, নং ২০ : xx, নং ১ 'সি'
৩। এ. ই. xxxi, নং ১১। এরা বংশানুক্রমিকভাবে প্রায় চারপুরুষ ধরে সৈনিক পরিবার।
৪। এ. ই. xxvi, নং ৩২, প ৩৮-৬১

নিশ্চিত যে চৌলুক্যশাসকগণ এইরূপ অনুদান দিতেন। পত্তলা শব্দটির ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত কিন্তু যদি এটিকে হিন্দী পত্তলের (গুজরাটী পাতল) প্রারম্ভিক রূপ হিসাবে গ্রহণ করা, যায় তা হলে এটির অর্থ হবে আহার্য অথবা ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা। ১৩শ শতাব্দীর চন্দেল অনুদানপত্রে 'প্রসাদেন প্রদত্ত' শব্দের ব্যবহার হয়েছে।[১] এর অর্থ বাজকৃপায় প্রদত্ত। পশ্চিম ভারতে ১২শ শতাব্দী এবং ১৩শ শতাব্দীতে জারী কবা অনুদানপত্রে প্রভুপ্রসাদাবাপ্ত অর্থাৎ প্রভুর কৃপায় প্রাপ্ত শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[২] মন্দির বা পুরোহিতকে প্রদত্ত অনুদানপত্রে সাধারণতঃ এই ধরনের শব্দাবলী ব্যবহার করা হয় নি এবং অইনগত দিক বিচার করলে দেখা যাবে যে এই সকল অনুদান গ্রহীতাকে তাদের কর্তব্যকর্মের বা যোগ্যতাব কারণে নয় বরং প্রভুর কৃপাবশতঃই দেওয়া হত। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে কোন ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানপত্রে গ্রহীতাব দায়-দায়িত্বের উল্লেখ করা হয় নি। এগুলির বর্ণনা কেবল লেখপদ্ধতিতেই কবা হয়েছে। অতএব সম্পূর্ণ দেশের জন্য এইরূপ অনুদানের কোনো প্রচলিত বিধি-বিধান ছিল না, ফলে দুই পক্ষে কোন চুক্তিভঙ্গজনিত বাদ-বিসংবাদ হলে, আইনেব আশ্রয় গ্রহণ করাব উপায় ছিল না।

নীতি উপদেশ-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে সামন্ত অথবা তাদের প্রভুদের কোনো দায়িত্বের উল্লেখ কবা.হয় নি। প্রকৃতপক্ষে সেযুগে কোনো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ করা হয় নি। একমাত্র অগ্নিপুরাণেই সামন্তদের কর্তব্যের উল্লেখ আছে। অগ্নিপুরাণ সম্ভবতঃ ১০ম-১১শ শতাব্দীর রচনা এবং এটিতে নীতিগতভাবে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তার উৎস প্রধানতঃ কামন্দক-নীতিসার, যা সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে সামন্তদের বলা হয়েছে যে তারা জনগণকে শান্ত রাখবে, যুদ্ধকালে নিজ প্রভুকে সাহায্য প্রদান করবে, প্রভুর মিত্রদের [illegible] সহায়কদের সংঘবদ্ধ করবে এবং শত্রুমিত্রেব পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবে। জনগণের সুরক্ষার জন্য তাদের দুর্গের ন্যায় হতে বলা হয়েছে।[৩] অপরপক্ষে রাজাকে নিজের সামন্তদের থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। সামন্তদের বিদ্রোহকে বহির্বিপদ এবং রাজপুত্র, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজপুরুষদের বিদ্রোহকে অভ্যন্তরীণ বিপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] এইজন্য অগ্নিপুরাণে রাজাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাঁরা যেন তাঁদের

১। এ. ই. xvi, নং ২০, প ১১ ; xx, নং ১৪ 'সি', প ১৪

২। ঐ xix, নং ১০, প ১৭। এটির একটি বিকল্পরূপ প্রসাদীকৃত—ই. এ. xviii, ৮৪-৫, প ৮-এ পাওয়া যায়।

৩। অনুবাদ, এম. এন. দত্ত ii, ৮৩৫

৪। ২২৩'১১

অবিশ্বস্ত সামন্তদের বিনষ্ট করে ফেলেন।[১] কিন্তু এই কালের অন্য কোনো নীতি-বিষয়ক গ্রন্থে রাজা ও সামন্তদের পারস্পরিক দায়-দায়িত্বের উল্লেখ বিরল।

লেখপদ্ধতিই একমাত্র গ্রন্থ যেটিতে অনুদানভোগীদের দায়-দায়িত্বের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই গ্রন্থেই দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর গুজরাটের পরিবেশের প্রতিফলন ঘটেছে। এই গ্রন্থে ভূর্জপত্রে রচিত তিন প্রকার অনুদানপত্রের দলিলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে—(১) রাজভূর্জপত্তলা—এটিতে রাজা মন্দিরকে তথা ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত জমি ছাড়া সম্পূর্ণ দেশ রাণককে দান করতে পারতেন।[২] এখানে 'দেয়' শব্দটি সম্ভবতঃ চৌলুক্যদের অধীনস্থ মণ্ডলের বোধক। (২) মহামাত্যপত্তলা—মহামাত্য দ্বারা রাণককে প্রদত্ত অনুদান। এখানে রাণক পত্তলা গ্রহণ করে দাতাকে অনুগতভাবে এবং বিশ্বস্তভাবে সকল করপ্রদানের অঙ্গীকার করত।[৩] (৩) রাণকপত্তলা—এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এটিতে এমন বিস্তারিত বিবরণ আছে যা পূর্বের দুটিতে নেই। এখানে রাজপুত্র রাণকের কাছে জায়গীরের আবেদন করে এবং তাকে গ্রামদান করা হলে সে যে শুধু প্রদত্ত গ্রামের আইন-শৃঙ্খলারক্ষার প্রচলিত দায়িত্ব এবং রাজস্ব আদায়দানের অঙ্গীকারই করে, তাই নয়, উপরন্তু রাণকের সেবার জন্য তার রাজ-ধানীতে ১০০টি পদাতিক ও ২০টি অশ্বারোহী প্রেরণ করার অঙ্গীকারও করে।[৪] আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে প্রদত্ত ভূমির উপর তার একপ্রকার অধিকার জন্মাত, এই ব্যবস্থা থেকে অনুমিত হয় যে সে মন্দির বা ব্রাহ্মণকে পতিত জমিদান করতে পারত না।[৫] অর্থাৎ সে গ্রামের আবাদী জমিদান করার অধিকারী ছিল। এই ব্যবস্থা ছিল ভূমিছিদ্রন্যায় অনুসারে প্রচলিত পুরাতন প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ ভূমি-ছিদ্রন্যায় অনুসারে সুরুতে মন্দির ও পুরোহিতকে কেবল পতিত জমিই দান করা হত, তার উদ্দেশ্য এই যে তারা জমিটিকে আবাদযোগ্য করে তুলবে। অবশ্য ৫ম শতাব্দী থেকে এই শব্দটি আবাদী জমিদানেব ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে।[৬] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে পতিত জমি আবাদ করার ব্যাপারে ভূমি অনুদানের যে ভূমিকা ছিল তা ১২শ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে গুজরাটে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

লেখপদ্ধতিতে প্রদত্ত দাতা ও গ্রহীতার দায়-দায়িত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে; বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ সম্বন্ধে শিলালিপি থেকে কিছুই জানা যায় না।

১। ২২৭ ৫৩
২। লেখপদ্ধতি, পৃঃ ৭
৩। ঐ
৪। "গ্রামস্ত অস্ত আয়পদম্ ভোগবতা (ভুঞ্জতা) পদাতিজন ১০০ ঘোটক ২০ এতৈঃ ঘোটক মানুষৈঃ কটকে রাজধান্তম্ শ্রীঅস্মাকম্ সেবাকার্যা।" ঐ
৫। 'মধতরভূমিশাসনেকস্তাপি দেবস্তবিপ্রস্ত বা ন দাতব্য।' লে. প. পৃঃ ২৭
৬। লে. প. পৃঃ ৩৬-৮

প্রথম পত্তলা থেকে না হলেও, দ্বিতীয় পত্তলা এবং বিশেষ করে তৃতীয় পত্তলা থেকে এ কথা স্পষ্ট জানা যায় যে গুজরাটে সামন্ততান্ত্রিক রাজব্যবস্থা পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। এই দুটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাজা এবং তার মাহামাত্যরা ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে সামন্তদের প্রদত্ত চৌলুক্য অনুদানগুলিতে যাঁদের নাম বার বার উল্লিখিত হয়েছে তাঁরা রাণকদের জায়গীর প্রদান করতেন এবং এই রাণকগণ অনুদানে প্রাপ্ত ভূমি থেকে রাজপুত্রদের জায়গীর দিতেন। উপসামন্তীকরণের এটি একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আবার গ্রামপট্টক (গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থাপত্র) থেকে জানা যায় যে রাজপুত্রগণ নিজ জায়গীর থেকে বণিক বা তাদের সহকর্মীদের গ্রামদান করতে পারত।[১] একটি দলিলে দেখা যায় যে একটি পঞ্চকুলকে এই সর্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হয়েছিল যে সে ৩০০০ দ্রম্ম মুখ্য রাজস্বরূপে, ২১৬ দ্রম্ম পঞ্চকুলের পুরস্কাররূপে এবং ৪০ দ্রম্ম খচরা খরচ হিসাবে আদায় করে দেবে।[২] এই পঞ্চকুলের প্রধান ছিলেন একজন বণিক বা মহন্তক। মুখ্য রাজস্ব তিনটি কিস্তিতে জমা দিতে হত।[৩] উপরন্তু সেই বণিক ও তার সহযোগীদের এই দায়িত্বও ছিল যে করবৃদ্ধি হলে তাও আদায় করে দেবে এবং কোনো ব্যক্তিকে সম্মানিত করার জন্য, রাজপরিবারে অথবা সর্দারপরিবারে কোনো কুমারের জন্ম হলে, অথবা অনুরূপ কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে গ্রামের উপর আরোপিত কর আদায় করবে এবং থানার খরচের দায়িত্বও বহন করবে।[৪] গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায়কারী এই সকল ব্যক্তিদের গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রাস্তাগুলিও দেখাশোনাও করতে হত। এই চুক্তিতে অন্য একজন রাজপুত্রকে জামিন হতে হত, তাঁকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হত যে বণিক ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ ঠিকমত রাজস্ব আদায় করে দেবে। যে দলিলে এই সকল বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেটির কাল ৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর থেকে ১২শ-১৩শ শতাব্দীর রাজস্বব্যবস্থার বিষয়ে নিঃসন্দেহে আলোকপাত হয়েছে। গ্রামপট্টক-প্রথা থেকে জানা যায় যে রাজপুত্রদের অধীনে অনেকগুলি করে গ্রাম থাকত এবং সকল গ্রাম থেকে তারা নিজেরা রাজস্ব আদায় করতে পারত না। সেইজন্য নগদ মুদ্রায় রাজস্বের হিসাব করে তা আদায়ের ভার তারা বণিকদলের উপর সমর্পণ করত। গুজরাটের বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ভালই ছিল, তাই এই দায়িত্ব গ্রহণ করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। তারা অবশ্য কর আদায় করে দিয়ে, জমিচাষ

১। ঐ, পৃঃ ৮-৯
২। ঐ, পৃঃ ৯
৩। ঐ
৪। 'চটাপকমলমার্গনমাঙ্গলীয়কচতুয়কপালিতম্ দেশাচারেন দাতব্যম্।' লে. প. পৃঃ ৯

করার অধিকারী কৃষক ছিল না, বরং তারা চুক্তিতে আবদ্ধ কর আদায়কারী এজেন্ট-মাত্র ছিল। গ্রামের প্রকৃত মালিক ছিল রাজপুত্র, যে কেবল, ভূমি অনুদান দিতে পারত কর বৃদ্ধি করতে পারত এবং কর আদায়ের ভার যাকে খুশি দিতে পারত।

গ্রামপট্টকের কালের অবধি থাকত এক বৎসর। কিন্তু রাজা, মহামাত্য এবং রাণকদের দ্বারা জারী করা দলিলে সময়সীমার কোনো সংকেত দেওয়া হয় নি। সম্ভবতঃ অনুদান দেওয়া হত আজীবনের জন্য অথবা দানগ্রহীতার আচার-আচরণ যতদিন উপযুক্ত থাকত ততদিনের জন্য এবং দুই পক্ষের কারো মৃত্যু হলে অনুদানটির নবীকরণ করাতে হত। রাণক ও রাজপুত্রদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ হলে রাজা হস্তক্ষেপ করতেন কিনা, তা ঠিক জানা যায় না। দলিলপত্রগুলি ভূর্জপত্রে লেখা হত তাই সেগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সেগুলির প্রামাণিকতায় সন্দেহ করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

মোটের উপর প্রভু ও সামন্তের সম্পর্ক সমাজ প্রচলিত প্রথার দ্বারাই নির্ধারিত হত এবং এ সম্পর্কে ১৩শ শতাব্দীর পূর্বের কোনো লিখিত রূপ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পূর্বে যখন রাজ্যগুলি ছিল বিশাল তখন কোনো লিখিত বিধি বিধান না থাকার সুযোগ রাজারাই গ্রহণ করতে পারতেন এবং সেই সুযোগে পরম্পরাগত দায়িত্ব ছাড়াও আরও নতুন দায়িত্ব সামন্তদের উপর আরোপ করতে পারতেন। কিন্তু আলোচ্যকালে তুর্কীদের আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের খণ্ডবিখণ্ড ছোট ছোট দুর্বল রাজ্যগুলিতে অলিখিত আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারত সামন্তরাই।

সামন্ত ও বড় বড় রাজপদাধিকারীদের ভূমি অনুদানরূপে বেতনদানের প্রথা নীতিগতভাবে ১২শ শতাব্দীতেই স্বীকৃত হয়েছিল। পূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে গ্রাম অনুদানের মহিমা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ প্রয়োজনে ভূমি অনুদানের বিশেষ সুপারিশ করা হয় নি। কিন্তু ১২শ শতাব্দীতে রচিত মানসোল্লাসে এইরূপ অনুদান প্রদানের বিধান অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। রাজাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তিনি যেন নিজ প্রধান সামন্ত (সামন্তমান্যকাঃ) এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রীদের যথা মন্ত্রী, অমাত্য, সচিবদের বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার প্রদান করেন—এই পুরস্কারের মধ্যে ভূমি অনুদানও অন্তর্ভূত।[১] পরে আরও বলা হয়েছে যে ভৃত্য, বান্ধব এবং সামরিক সাহায্য এবং পরামর্শদাতাদেরও পুরস্কার দেওয়া উচিত।[২] মোট ১৬ প্রকারের উপহারের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে গ্রাম, নগর, খনিজক্ষেত্র ইত্যাদির সঙ্গে আসন, যানবাহন ও ছত্র চামরের

১। ii, ১০০৬
২। ঐ, ১০০৭

ন্যায় সম্মানসূচক উপহারের উল্লেখ আছে। তা ছাড়া কুমারীকন্যা ও বারাঙ্গনা উপহার প্রদানের কথাও বলা হয়েছে।[১] এটিতে যেসকল ভূমি অনুদানের উল্লেখ আছে সেগুলি হল দেশ্যম্ অর্থাৎ রাষ্ট্র (মহকুমা) দান, যার থেকে রাজা সম্ভবতঃ কর আদায় করতেন না, করজম্—এই অনুদান দেশ্যমের অনুরূপ কিন্তু কর দিতে হত[২] এবং তৃতীয় গ্রামজম্ অর্থাৎ করমুক্ত বা করযুক্ত ভূমি অনুদান।[৩]

মালব ও গুজরাটের প্রায় সর্বত্র ভূমি অনুদান দেওয়া হত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতে, এখানে রচয়িতা পরমার ভোজ এবং চৌলুক্য ভীমেব কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে দেশাধীশ গ্রাম অনুদান দেন, গ্রামাধীশ অনুদান দেন ক্ষেত্র, ক্ষেত্রাধীশ দান কবেন শাকসব্জি এবং সকল সচ্ছল ব্যক্তিই নিজ সম্পত্তি দান করেন।[৪] এব দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ১৩০৪ পর্যন্ত যখন মেরুতুঙ্গ নিজ রচনা সমাপ্ত করেছিলেন, গ্রামের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি যেসকল গ্রামাধীশেব উল্লেখ করেছেন তাদেব মধ্যে জৈন ও ব্রাহ্মণ মন্দির এবং পণ্ডিত-পুরোহিতদেরই সংখ্য'ধিক্য ছিল। কিন্তু বাকি গ্রামাধীশদের মধ্যে এমন সামন্ত বা রাজপদাধিকারী হয়ত ছিল, যাঁরা চৌলুক্য ও পরমার রাজাদের কাছ থেকে গ্রাম অনুদান পেয়েছিল। প্রায়ই এমনও হত যে রাজা রাজস্ব আদায় করার জন্য যাদের পট (অর্থাৎ সনদ) প্রদান করতেন এমন পট্টকিলরা[৫] কালক্রমে গ্রামাধীশ হয়ে যেত এবং আদায়ীকৃত রাজস্বের সামান্য অংশই কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা দিত।

যদিও প্রাচীন সাহিত্যে সামন্ত এবং তার প্রতিশব্দগুলি বার বার উল্লিখিত হয়েছে, তবু রাজনৈতিক সামন্তবাদের কোনো ভিত্তি সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে একাদশ শতাব্দীর পূর্বে রাজনৈতিক সামন্তবাদের মূল জনমানসের গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি। স্মৃতির ভাষ্যকারদের ভাষ্যেও এই নতুন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সচেতনতা লক্ষিত হয় না। কারণ মিতাক্ষরাতেও দেখা যায় যে সামন্ত শব্দটি প্রথাগত প্রতিবেশী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শিল্প ও বস্তু-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে রাজনৈতিক সামন্তবাদের আদর্শগত দিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১২শ শতাব্দীর রচনা 'মানসারে' সামন্তশ্রেণীর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া

১। ঐ, ১০১০-১১
২। ঐ, ১০১৪
৩। ঐ, ১০১৬
৪। "দেশাধীশো গ্রামমেকং দদাতি, গ্রামাধীশঃ ক্ষেত্রমেকং দদাতি, ক্ষেত্রাধীশঃ শিম্বকাঃ সম্প্রদত্তে, সর্বভূষ্ট সম্পদংশাং দদাতি।" প্রবন্ধচিন্তামণি পৃঃ ৫৭
৫। এ. ই. ix, সং ১৩, প ১৮ ; ই. এ. vi, ৪৮

যায়। এই গ্রন্থের ৪২শ অধ্যায়ে রাজাদের নটি শ্রেণীর উল্লেখ আছে, সর্বোচ্চ শ্রেণীতে চক্রবর্তী, তারপর ক্রমশ মহারাজ অথবা অধিরাজ, মহেন্দ্র বা নরেন্দ্র, পার্ষণিক, পট্টধর, মণ্ডলেশ, পট্টভাজ, প্রহারক এবং অস্ত্রগ্রাহী।[১] এই রাজাদের মর্যাদানুসারে এঁরা প্রত্যেকে কত ঘোড়া, সৈনিক, সেবিকা এবং রানী রাখতে পারবেন, তাও এই গ্রন্থে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। এই শ্রেণীর সর্বনিম্নে যাঁর স্থান সেই অস্ত্রগ্রাহী ৫০০ ঘোড়া, ৫০০ হাতি, ৫০,০০০ সৈনিক, ৫০০ স্ত্রী-সেবিকা এবং একটি রানীর অধিকারী ছিলেন।[২] এইভাবে শ্রেণীর ক্রমানুসারে এই সকলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেত এবং সর্বোচ্চ শ্রেণীর রাজা চক্রবর্তী স্বাভাবিকভাবেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় ঘোড়া, হাতি, সেবিকা ও রানীর অধিকারী ছিলেন।[৩] মানসারে ৯ শ্রেণীর রাজার জন্য তাঁদের মর্যাদা অনুসারে ৯ প্রকার রাজমুকুট, ৯ প্রকার রাজসিংহাসনেরও বর্ণনা আছে।[৪] কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এই গ্রন্থে রাজার মর্যাদানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হারের উল্লেখও এই গ্রন্থে আছে। চক্রবর্তী উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশের মহারাজ এক ষষ্ঠাংশের, নরেন্দ্র এক-পঞ্চমাংশের, পার্ষণিক এক-চতুর্থভাগের এবং পট্টধর এক তৃতীয়াংশের অধিকারী ছিলেন।[৫] মণ্ডলেশ, পট্টভাজ, প্রহারক এবং অস্ত্রগ্রাহী এই চার শ্রেণীর রাজার রাজস্বের বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু প্রাসঙ্গিক বর্ণনা থেকে অনুমান করা চলে যে এঁরা অর্ধাংশ অথবা তারও বেশি অংশ গ্রহণ করে থাকতেন। রাজস্বের এইরূপ শ্রেণীবিভাগের বৈশিষ্ট্য কি? আমাদের মনে হয় যে নিম্ন-শ্রেণীর রাজাদের হয়ত তাদের উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত রাজাদের আদায়ীকৃত রাজস্বের অংশবিশেষ কররূপে প্রদান করতে হত। তবেই নিম্ন-শ্রেণীর রাজাদের কর্তৃক উচ্চতর হারে রাজস্ব আদায়ের নিয়মটি বোধগম্য হয়।

১২শ শতাব্দীতে[৬] ভট্ট ভুবনদেব তাঁর রচিত 'অপরাজিতপৃচ্ছা' গ্রন্থে গুরুত্ব অনুসারে রাজাদের নয়টি শ্রেণীর বর্ণনা দিয়েছেন, সেগুলি এই প্রকার মহীপতি, রাজা, নরাধিপ, মহামণ্ডলেশ্বর, মাণ্ডলিক, মহাসামন্ত, সামন্ত, লঘুসামন্ত ও চতুরশিক।[৭] এঁদের মধ্যে কতটা ভূমি কার কাছে থাকবে, তারও নির্দেশ আছে। মহীপতিকে

১। পি. কে. আচার্য, মানসার সিরিজ vi, ১২৫
২। ঐ
৩। ঐ
৪। ঐ, ১২৬। এর বর্ণনা ৪৫শ ও ৪৯শ অধ্যায়ে করা হয়েছে।
৫। ঐ
৬। পি. এ. মানকড় সম্পাদিত গা আ সি, নং ১১৫, প্রারম্ভিক পৃঃ ১২
৭। ৮১'২-১০

যেখানে সম্পূর্ণ ধরিত্রীর অধীশ্বর বলা হয়েছে চতুরশিককে সেখানে মাত্র ১০০০টি গ্রামের অধিপতি বলা হয়েছে।[১] নিম্নতম শ্রেণীর নিকট কত বড় খেত থাকবে, সে কথা অবশ্য বলা হয় নি; তবে ২০ থেকে ১০০টি পর্যন্ত গ্রামের অধিকারী এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।[২] বাস্তুশিল্প-বিষয়ক দুটি গ্রন্থে শাসকদের যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, ব্যবহারিক দিক থেকেও যে তা প্রযুক্ত ছিল তা মনে হয় না। তবু মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগের পক্ষে এই বিভাগ উপযুক্ত বলেই মনে হয়। কারণ উক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাই যেখানে শাসকগণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন এবং নিম্নতর শাসক তাঁর উর্দ্ধতন শাসকের অধীনে থাকতেন এবং তাঁকে কর প্রদান করতেন এবং অন্যান্যভাবেও সাহায্য করতেন। এই প্রথা নীচে থেকে উপর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

অপরাজিতপৃচ্ছায় সামন্ত দরবারের গঠনসম্বন্ধেও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তদনুসারে সম্রাটের (যাঁর উপাধি মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর) দরবারে ৪ জন মণ্ডলেশ, ১২ জন মাণ্ডলিক, ১৬ জন মহাসামন্ত, ৩২ জন সামন্ত, ১৬০ জন লঘু-সামন্ত এবং ৪০০ জন চতুরশিক থাকা বাঞ্ছনীয়।[৩] চতুরশিকের নীচের সকল রাজপুরুষকে রাজপুত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[৪] গ্রন্থটিকে কয়েকজন রাজপুরুষের আয় সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। তদনুসারে লঘুসামন্তের আয় ৫০০০, সামন্তের আয় ১০০০০, এবং মহাসামন্তের আয় ২০০০০ হওয়া উচিত। ১৪শ শতাব্দীর বাস্তুশিল্প-বিষয়ক গ্রন্থ 'রাজবল্লভমণ্ডলে'ও উপরোক্ত বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়।[৫] অপরাজিতপৃচ্ছায় এই সকল সামন্তের দ্বারা প্রজাদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের হার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি, কিন্তু রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে একটি পর্যায়ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ সমাজের চিত্র অবশ্যই দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও অন্যান্য রচনায় কেবল বর্ণের উপর ভিত্তি করেই রাজনৈতিক অধিকার, আয়, বাস্তু, সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তুশিল্প-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে ভিন্নরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। এইগুলিতে বংশানুক্রমিক বর্ণের ভিত্তিতে কাউকে কোনো সুবিধা প্রদানের উল্লেখ নেই। বরং বর্ণভিত্তিক শ্রেণীর সঙ্গে সামন্তীয় শ্রেণীর সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। ময়মত এবং

১। ঐ
২। ৮১'১১-২
৩। ৭১'৫৩-৪, ৩৯
৪। অগ্রওয়াল—হর্ষচরিত পৃঃ ১৩৮, পাদটীকা ৩
৫। অগ্রওয়াল কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃঃ ২০৩

বরাহমিহিরকৃত বৃহদসংহিতার বাস্তু-বিষয়ক কয়েকটি অনুচ্ছেদে উক্তরূপ বর্ণনা দেখা যায়। বরাহমিহির বিভিন্ন শ্রেণীর শাসকদের উপযুক্ত বাসস্থানের আকার সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন ; সেই সঙ্গে চারিবর্ণের ব্যক্তির বাসগৃহের বর্ণনাও দিয়েছেন। ময়মতের মতানুসারে সম্রাটের বাসস্থান ১১তলা এবং ব্রাহ্মণের (দ্বিজাতি) বাসস্থান ৯তলা, সাধারণ নৃপের বাসস্থান ৭তলা, বৈশ্য বা সাধারণ সেনানায়কের (যোধসেনেশ) ৪তলা, শূদ্রের ১ থেকে ৩তলা এবং সামন্তপ্রমুখ ব্যক্তিদের বাসস্থান ৫তলা হওয়া উচিত।[১] ময়মতে বৃহদসংহিতা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্টভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর রাজা, সামন্ত ও অন্যান্যদের বাসস্থানের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অপরাজিতপৃচ্ছায় বাসস্থানের আকার-প্রকার বর্ণের উপর ভিত্তি করে করা হয় নি, বরং সামন্তীয় শ্রেণীর উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। এখানে নয়টি শ্রেণীর সর্দারদের মধ্যে মহামণ্ডলেশ্বর, মাণ্ডলিক, মহাসামন্ত, এবং লঘুসামন্ত ব্যতীত আরও কয়েকজন অন্তভূত আছে, কিন্তু তাদের স্থান সর্দারদের নীচে।[২] সিংহদ্বার নির্মাণের অধিকার কেবল চক্রবর্তী, মহামণ্ডলেশ্বর, মহাসামন্ত এবং সামন্ত'র ছিল।[৩] 'মানসার' অনুসারে সর্বনিম্ন দুই শ্রেণীর শাসক অর্থাৎ প্রহারক ও অস্ত্রগ্রাহী চারিবর্ণের লোকই হতে পারতেন এবং এঁদের অধিকার ও সুবিধাগুলি নির্ভর করত প্রহারক ও অস্ত্রগ্রাহীর পদমর্যাদার উপর। এইসকল গ্রন্থে সমাজে ব্যক্তির স্থান তার বর্ণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত না ; বরং তার পদমর্যাদার উপর ভিত্তিতে হত। কারণ সামন্ততান্ত্রিক রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না।

এই অধ্যায়ের পরিশেষে উপসংহার হিসাবে আমরা বলতে পারি যে এই সময়ে উত্তর ভারত বহু ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং ভূমি অনুদানের ব্যাপক প্রথা ও শাসক পরিবারের ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে পৈতৃকরাজ্য ভাগ করে নেওয়ার ফলেই এইরূপ ঘটেছিল। মন্দির ও ব্রাহ্মণদের ভূমি অনুদানের যত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সামরিক ও প্রশাসনিক সেবার ক্ষেত্রে তত পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ যেসকল প্রমাণের উপর নির্ভর করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে রাজপদাধিকারী এবং সামন্তদের অনুদান দেওয়া হত, সেগুলিও ঐ সকল পদাধিকারীদের দেওয়া ধর্মীয় অনুদান থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। ভারতে রাজার সঙ্গে ধর্মীয় প্রধানের সেরূপ কোনো কলহের প্রমাণ পাওয়া যায় না,

১। ময়মত, XXIX, ৮০-২। 'ষটতলম্ মণ্ডলীকুড্য পঞ্চভূমাবরাজতে' (ঐ, পৃঃ ৮১) অর্থ স্পষ্ট নয়।

২। ৮১'২-১২

৩। ৮১'২১ ২৪

যেমন ইউরোপে পোপের সঙ্গে রাজাদের মধ্যে দেখা যায়। যেখানে নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে ক্যারোলিং রাজবংশ গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিজ গৃহস্থ সামন্তকে দিয়ে দিয়েছিল।[১] কিন্তু ভারতে রাজাদের মধ্যে ধর্মীয় অনুদান দেওয়ার ব্যাপারেই প্রতিযোগিতা দেখা যায়। সরকারী আমলাদের প্রাধান্য ক্রমশ কমতে আরম্ভ করেছিল এবং ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ গৃহস্থ সামন্তদের প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তা ছাড়া ভূমি অনুদান প্রাপ্তির ফলে সরকারী আমলারাও ক্রমশ সামন্তে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য পূর্ব ভারতের পরিস্থিতি গুজরাট ও রাজস্থান অপেক্ষা ভিন্নরূপ ছিল। এই দুই প্রদেশে প্রভু ও সামন্ত'র সম্পর্ক চুক্তিবদ্ধ ছিল। পাল ও সেনদেব আমলের তাম্রপটে প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানেব অপেক্ষাকৃত অভাব দেখে অনুমান করা যায় যে এই রাজ্যগুলিতে সাধারণ রাজপদাধিকারী ও সামন্তদের ততটা শক্তিশালী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নি, যার দ্বারা তারা তাম্রপটে স্থায়ীভাবে অনুদান প্রাপ্তির দাবি করতে পারে। কিন্তু চৌলুক্য, পরমার, চাহমান, চন্দেল ও উড়িষ্যার বাজ্যগুলির অবস্থা ভিন্নরূপ ছিল।

বঘেলখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে রাজপদাধিকারীদেব জন্য রাজস্বের একটা অংশ পৃথক কবে রাখা হত, এটাও এইকালেরই একটা বৈশিষ্ট্য। মুসলমান আমলেও এই প্রথা অব্যাহত ছিল, তার পরিচয় আমরা পাই শেরসাহের রাজত্বে। তিনি কব সংগ্রহকার তহশীলদের জন্য রাজস্বের একটা অংশ পৃথক করে রাখতেন। শেষ কথা এই সময়ে সামন্তপ্রথা এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল যে সংস্কৃতগ্রন্থেও স্থান পেয়েছিল। সংস্কৃতগ্রন্থাদি সাধারণতঃ রক্ষণশীল হত এবং ধর্মশাস্ত্রের বর্ণিত চতুর্বর্ণ বিভক্ত সামাজিক ব্যবস্থার বাইরের কিছুতে সহজে স্বীকৃতি দিতে চাইত না। মানসোল্লাস, লেখপদ্ধতি এবং শিল্পকলা ও বাস্তুশিল্প-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে সামন্তদের শ্রেণীবিন্যাসের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা পূর্ববর্তী কোনো রচনাতে পাওয়া যায় না। এইযুগের কোনো-কোনো রচনায় ধর্মনিরপেক্ষ অনুদান প্রদানের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কোনো-কোনো রচনায় দানগ্রহীতার দায়-দায়িত্বের স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত কারণে দিল্লীর সুলতানদের দ্বারা জায়গীরপ্রথা প্রবর্তন করার উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল।

১। গনসফ—ফিউড্যালিজম্ পৃঃ ৩৫-৬

৬

সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চরমোৎকর্ষ ও অবনতি

(প্রায় ১০০০—১২০০ খ্রীঃ)

তুর্কীদের ভারত বিজয়ের পূর্ববর্তী দুই শতাব্দীর যেসকল ভূমি অনুদানপত্র আমরা পেয়েছি তার উপর ভিত্তি করে সেইকালের উত্তর ভারতে পুরোহিত, মন্দির, সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদের গ্রাম অনুদানের পূর্ণাঙ্গ ক্ষেত্রীয় বিবরণ দেওয়া সম্ভব, কিন্তু এখানে সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে গুজরাট পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত গ্রাম অনুদানের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছিল।

মনে হয় কৃষক ও শিল্পীদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ অর্থ নৈতিক দিক থেকে স্বাধীন ও স্বনির্ভর, এমন কোনো গ্রাম আসামে ছিল না। এই প্রদেশে ব্রাহ্মণদের অনুদান হিসাবে প্রধানতঃ এমন সব বড় বড় আরণ্যক ও পার্বত্য ক্ষেত্র দান করা হত, যার মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হত এবং এইকারণেই অর্থ নৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর পৃথক পৃথক গ্রামের উদ্ভব কঠিন ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলবর্মের তাম্রপত্রে (৯৭৫) ৪০০০ মাপক ধান উৎপাদনকারী ক্ষেত্র দান করা হয়েছিল[১] এবং রত্নপালের (১০১০-৫০) তাম্রপত্রে ২০০০ মাপক ধান উৎপাদনের উপযুক্ত ভূমি দান করা হয়েছিল।[২] অনুরূপভাবে ইন্দ্রপালের গৌহাটি তাম্রপত্রে ধর্মীয় অনুদানরূপে ৪০০০ মাপক ধান উৎপাদনের যোগ্য ভূমি দান করা হয়েছিল।[৩] এই তিনটি উদাহরণ থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে বড় বড় উর্বর ভূমি তখনও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দান করা হত।

এবার আমরা পাল ও সেনদের শাসনাধীন বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখব যে এখানে বড় বড় ভূখণ্ডের পরিবর্তে গ্রাম অনুদান দেওয়া হত। আলচ্য-কালের পাল শাসকদের মধ্যে তৃতীয় বিগ্রহপাল আধুনিক সাহারসা জেলার কোনো-স্থানে অর্ধেক গ্রামদান দিয়েছিলেন।[৪] অনুরূপভাবে মদনপাল (১১৪০-৫৫) উত্তরবঙ্গে চম্পাহিট্টির কোন ব্রাহ্মণকে একটি গ্রামদান করেছিলেন।[৫] পালদের অধীনস্থ ছোট ছোট রাজারাও অনুদান দিতেন। সম্ভবতঃ তৃতীয় বিগ্রহপালের

১। জা. বি. এ. সো. lxvi, ভাগ ১, ২৯১-৯২
২। ঐ lxvii, ভাগ ১. ১২০
৩। ঐ lxvi, ভাগ ১, ১৩০-৩১, প ৬-৯
৪। এ. ই. xxix, নং ৭, প ২৪-।২
৫। জা. বি. এ. সো. lxix, ভাগ ১, ৬৬, প ২৭-৪৯

সামন্ত ঈশ্বরঘোষ দক্ষিণবঙ্গের চন্দ্রবারে কোনো এক ব্রাহ্মণকে একটি গ্রামদান করেছিলেন।[১] অন্য আর একজন পাল সামন্ত ভোজবর্মণ পূর্ববঙ্গে ১১শ শতাব্দীর শেষ অথবা ১২শ শতাব্দীর সুরুতে কোন সময়ে মধ্যদেশীয় একজন পুরোহিতকে একটি ভূক্ষেত্র অনুদান দিয়েছিলেন।[২]

চন্দ্রগণ সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গে পালদের সামন্ত ছিলেন, তাঁরা ভূমি অনুদান দিয়েছিলেন শ্রীচন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির পাঁচটি গ্রামে ইতস্ততঃ বিস্তৃত ভূখণ্ড ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদান দিয়েছিলেন।[৩] শ্রীচন্দ্র এই ভুক্তিতে একই স্থানে একটি বড় ভূখণ্ড সম্ভবতঃ এই কারণেই দিতে পারেন নি যে সেখানে গুপ্তদের কাল থেকেই ভূমির অভাব দেখা দিয়েছিল। তাঁর পৌত্র লাড়হচন্দ্র ১১ পাটক ও কয়েক দ্রোণ জমিসহ দুটি গ্রাম লাড়হমাধব দেবতাকে দান করেছিলেন এবং পুনরায় ১৩শ শতাব্দীতে বীরধরদেব এই দেবতাকে সম্ভবতঃ শ্রীহট্ট জেলার কোনো দুইটি স্থানে ১৭ পাটক ভূমিদান করেছিলেন।[৪] বাংলাদেশের সেন শাসকগণও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদানরূপে গ্রামদান করতেন। পার্থক্য শুধু এই যে কখনও কখনও নগদে অথবা বস্তুতে গ্রামের বার্ষিক উৎপন্নের উল্লেখ করা হত। একটি অনুদানপত্রে লক্ষ্মণসেন উত্তরবঙ্গে একটি গ্রামদান করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে চারটি বিভিন্ন গ্রামে ভূমিখণ্ডও দান করেছিলেন।[৫] বিশ্বরূপসেনের শাসনকালে ৬টি গ্রামে বিক্ষিপ্ত ১১টি ভূখণ্ড যার মোট ক্ষেত্রফল ছিল ৩৩৬১ উন্মান এবং বার্ষিক আয় ছিল ৫০০ পুরাণ, ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন।[৬] একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর ভূমি অনুদানগুলি লক্ষ্য করলে মনে হয় যে বাংলাদেশে ভূমি অনুদান সেই সকল অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যাকে অধুনা পূর্ববঙ্গ বলা হয়। কিন্তু সেখানেও সম্ভবতঃ ভূমির অভাবের জন্য ব্যাপকভাবে ভূমি অনুদানে অসুবিধা ছিল।

বিহারে পুরোহিত ও মন্দির পূর্বের মতনই বহুলভাবে গ্রাম অনুদান পেত, যদিও অদ্যাবধি মিথিলার কর্ণাটকদের কোনো তাম্রপত্র পাওয়া যায় নি। তবুও সংগ্রামগুপ্ত নামক জনৈক শাসক ১২শ অথবা ১৩শ শতাব্দীতে দক্ষিণ মুঙ্গেরে একটি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন। ১৩শ শতাব্দীর সুরুতে জাপলায় খয়রওয়াল শাসক পালামৌতে কিছু গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদের এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে জাল অনুদানপত্রের বলে কোনো ব্রাহ্মণ যেন কোনো

১। ই. বে. iii, নং ১৬, প ২১-২৯
২। ঐ, পৃঃ ২৩-২৪, প ২৪-৫১
৩। ঐ, পৃঃ ১৬৫-৬
৪। বীরধরদেবের ময়নামতী তাম্রপত্র। এটি প্রথমে ডঃ এ. এইচ. দানীর নিকট ছিল, কিন্তু এখন পাকিস্তানের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগের নিকট আছে।
৫। এ. ই. xxvi, নং ১, পৃঃ ৫৭-৯
৬। ই. বে. iii নং ১৫, প ৪২-৬৮

গ্রাম ভোগদখল না করে।[১] কিছুকাল পর্যন্ত বিহারের পশ্চিমাঞ্চলে খয়রওয়ালদের প্রভু গাহরওয়ালদের অধিকারে ছিল এবং সেই সময়ে গাহরওয়াল শাসক ১১৩৪-এ মনের এক ব্রাহ্মণকে একটি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[২]

গাহরওয়ালগণ তাঁদের প্রভুত্বের প্রধান কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশে সর্বাধিক অনুদান দিয়েছিলেন। পূর্বে আমরা যেমন দেখেছি একটিমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবারকে রাজ্যের ৬০টি পত্তলার মধ্যে থেকে ১৮টি পত্তলায় প্রধানতঃ গার্হস্থ্যসেবার পুরস্কাররূপে ১৮টি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[৩] অনুরূপভাবে একজন ক্ষত্রিয় রাউতকে ৬টি জায়গীর এবং অন্য একজন রাউতকে তিনটি গ্রামদান করা হয়েছিল।[৪]

ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানের অতিরিক্ত গাহরওয়াল রাজাগণ বহু ধর্মীয় অনুদানও দিয়েছিলেন। চন্দ্রদেব এই ধরনের সর্বাপেক্ষা বেশি অনুদান দিয়েছিলেন। ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৫০০ জন ব্রাহ্মণকে একটি সম্পূর্ণ পত্তলা দান করেছিলেন।[৫] পত্তলার ক্ষেত্র কতটা বিস্তৃত ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো সঠিক ধারণা নেই, তবে এতে সম্ভবতঃ কমপক্ষে ১০০টি গ্রাম ছিল। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে এই ৫০০ জন ব্রাহ্মণকে তিনি পুনরায় ৩২টি গ্রামদান করেছিলেন। ১০৬৩-তে যখন তিনি সম্পূর্ণ পত্তলা দান করেছিলেন, তখন দুটি গ্রাম নিজের অধিকারে রেখে দিয়েছিলেন। পরে যে ৩২টি গ্রামদান করেছিলেন তার মধ্যে পূর্বোক্ত পত্তলার ঐ দুটি গ্রাম এবং বাকি ৩০টি গ্রাম অন্য পত্তলায় দান করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ পত্তলা দান করার উদ্দেশ্যে পত্তলার অবস্থিতি থেকে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। এই কঠহলী পত্তলা ছিল বেনারসের নিকটে এবং আর তিনদিক দিয়ে গোমতী, ভাগীরথী ও বরুণা এই তিনটি নদী প্রবাহিত ছিল।[৬] প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল গাহরওয়ালদের প্রভাব ও প্রতিপত্তির অন্যতম কেন্দ্র; আর একটি অনুরূপ কেন্দ্র ছিল কনৌজে। এই অঞ্চলটি ব্রাহ্মণদের দান দেওয়া হয়েছিল অনুন্নত অঞ্চলকে বাসযোগ্য ও উন্নত করার জন্য, এই অনুমান খুব সমীচীন বলে মনে হয় না, কারণ অঞ্চলটি পূর্বাবধিই উন্নত ছিল। সম্ভবতঃ উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় পুরোহিতগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল এবং তাদের

১। সম্প্রতি এইরূপ একটি জাল অনুদানপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যেটি শ্রী এস. বি. সোহনী, আই-এ-এস.'র নিকট সুরক্ষিত আছে।
২। জা. বি. উ. রি. সো. ii, ৪৪৩-৪, প ৮-১৯
৩। রমা নিয়োগীর 'হিস্ট্রী অফ দি চন্দেল ডাইনেষ্টিজ' পরিশিষ্ট, 'বি', নং ১০-৩, ১৫-৬, ২১, ২৩, ৩৭, ৫০, ৫২, ৫৬, ৫৮ ইত্যাদির উত্তর ভিত্তি করে কাল নির্ধারণ করা হয়েছে।
৪। উপরোক্ত পুস্তকের পৃঃ ১৭৩-৪
৫। এ. ই. xiv, নং ১৫
৬। রমা নিয়োগী পৃঃ ১৮৭

সন্তুষ্ট করার জন্যই গাহরওয়ালগণ এইরূপ অনুদান দিয়েছিলেন। যে কারণেই হোক না কেন ৫০০ জন ব্রাহ্মণকে ১৩০টি গ্রামদান করা হয়েছিল। পরবর্তীকালেও পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের গ্রামদানের প্রথা অব্যাহত ছিল। গোবিন্দচন্দ্র কয়েকজনকে ৬টি গ্রাম[১] ও জয়চন্দ্র দুটি গ্রাম[২] অনুদান দিয়েছিলেন। তা ছাড়া রাজার অনুমতি নিয়ে রাজপরিবারভুক্ত রাজকুমার ও রানীরাও দুটি বা তিনটি গ্রামদান করেছিলেন। প্রাপ্ত প্রমাণসমূহ থেকে অনুমিত হয় যে গাহরওয়ালরা ধর্মনিরপেক্ষ অপেক্ষা ধর্মীয় অনুদানই বেশি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে এই ঘটনা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও আধুনিক কালের সম্পূর্ণ উত্তরপ্রদেশ গাহরওয়াল-রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল না বা দক্ষিণেও তাঁদের রাজ্যসীমা যমুনা অতিক্রম করে নি, তবুও তাঁরা তাঁদের রাজ্যে সম্পূর্ণ একটি পত্তলা, অন্ততঃ ১০০টি গ্রাম যার অন্তর্ভূত ছিল, তা ছাড়া ১০০টি অন্য গ্রাম[৩] ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন। এই দানগ্রহীতাগণকে কোন কর দিতে হত না এবং রাজা ও প্রজাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তীর কাজ করত।

যমুনার দক্ষিণতীরে বিস্তীর্ণ বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে চন্দেলরাজ্যের অবস্থাও কিছু ভিন্ন ছিল না। এখানেও অধিকাংশ অনুদানে সম্পূর্ণ গ্রাম দেওয়া হয়েছে এবং চন্দেলরাজগণ ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক ভাবে ১৬টি গ্রামদান করেছিলেন।[৪] কেবল এই কয়েকটি অনুদানের উপর নির্ভর করেই অনুমান করা যেতে পারে যে সামরিক সেবার জন্য প্রায় অনুদানের ভোক্তারাও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত অনুদানভোগীদের তুল্য প্রাধান্য ভোগ করত। কিন্তু পরমর্দিনের একটি দলিলকে উপেক্ষা করলে, তবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। তবে ১১৬৩ সালের সেমরা তাম্রপটে ৩০৯ জন ব্রাহ্মণকে চারটি বিষয়ে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি গ্রাম-দান করা হয়েছিল।[৫] এই তাম্রপটে মাত্র ১১টি স্থানের নামোল্লেখ করা হয়েছে, সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মাত্র এই কয়েকটি গ্রামই দান করা হয়েছিল। কিন্তু এই নামগুলির প্রতি মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখি যে নামগুলির মধ্যে দিয়ে একটি গ্রাম নয় বরং গ্রামসমূহের বোধ জন্মায়। পীলিখিনী-পঞ্চেল, ইটাব-পঞ্চেল এবং ইসরহার-পঞ্চেল তিনটি পৃথক পৃথক গ্রাম নয় বরং

১। এ. ই, xi, নং ৩, প ১২
২। ই. এ. xviii, পৃ: ১৩১, প ২০
৩। রমা নিয়োগীর পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'বি'র বর্গ 'এ' খণ্ড ২-এ প্রদত্ত ভূমিদানপত্রের উত্তর ভিত্তি করে অনুমিত।
৪। এস. কে. মিত্র রচিত, 'দি আর্লি রুলার্স অফ খজুরাহো' পরিশিষ্ট ১, অনুসরণে অনুমিত। কিন্তু এদের মধ্যে ১০শ গ্রামটি ত্রৈলোক্যবর্মণের টিহরী ফলক অনুসারে সংযুক্ত করা হয়েছে।
৫। এ. ই. iv, নং ২০

পাঁচ-পাঁচটি গ্রামের সমূহ অর্থাৎ মোট ১৫টি গ্রাম বোঝায়। অনুরূপভাবে খটৌড়-দ্বাদশক ও টাণ্ট-দ্বাদশক বারটি গ্রামের সমূহকে বোঝায় এবং হাটাষ্টাদশক একটি নয় বরং ১৮টি গ্রামের সূচক। শেষ পাঁচটি নাম অবশ্য এক-একটি গ্রামই বোঝায়। অতএব পরমর্দিনের দলিলে মোট ৬২টি গ্রামদান করা হয়েছিল। কিন্তু দান-গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ৩০৯ জন। অতএব প্রদত্ত গ্রামের সংখ্যাটিকে খুব বেশি মনে করা যায় না। কিন্তু এই অনুদানে মদনপুর শহর ও দুটি গ্রাম এবং শহরের সঙ্গে সংযুক্ত ৪ হল পরিমাণ জমি অন্তর্ভূত করা হয় নি। এর থেকেও বোঝা যায় যে ঐ সব স্থানের নামগুলি এক-একটি গ্রামের নয় বরং গ্রামসমূহের বোধক। এ ছাড়া পুরোহিত ও অন্যান্যদের আবো বহু খণ্ড জমিদানের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক থেকে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে এই দলিলেও ভট্টাগ্রহারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভট্টাগ্রহারগুলি হল ধর্মীয় ও শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গ্রাম, যেখান থেকে ব্রাহ্মণেরা অন্যত্র বসবাসের জন্য চলে গিয়েছিলেন। যদি আমরা এই সকল গ্রামকে অন্তর্ভূত নাও করি, তা হলেও চন্দেলদের দ্বারা অনুদত্ত গ্রামের সংখ্যা ৮০-তে পৌঁছায়। বুন্দেলখণ্ডের আবাদযোগ্য ভূমির ক্ষেত্র-ফলের (৮০০০ বর্গ মাইল) প্রতি দৃষ্টি রেখে বলা চলে যে এই সংখ্যাটি খুব ছোট সংখ্যা নয়।

গুজরাটের চৌলুক্যরাও বহু অনুদান দিয়েছিলেন। পুরোহিত এবং জৈন ও হিন্দু মন্দিরকে তাম্রপত্রে যেসকল অনুদান দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই এক-একটি পূর্ণ গ্রাম, যদিও সব মিলিয়ে গ্রামের সংখ্যা দুই ডজনেরও বেশি হবে।[১] কিন্তু একটি অর্ধ-ঐতিহাসিক রচনা প্রবন্ধচিন্তামণিতে বলা হয়েছে যে বালাকদেশে সিদ্ধরাজ ব্রাহ্মণদের জন্য সিংহপুর নামক একটি অগ্রহার স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে ১০৬টি গ্রাম অন্তর্ভূত ছিল। চৌলুক্যগণ বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেগুলির ব্যয়নির্বাহের জন্য গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন। কুমারপাল ১৪৪০টি জৈনমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সম্ভবতঃ প্রত্যেক গ্রামে একটি করে।[২] আমরা অবশ্য সঠিক জানি না যে এই সকল মন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য কতগুলি গ্রাম অনুদান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিক সোমনাথ মন্দিরের অধীনস্থ গ্রামগুলির যে সংখ্যা দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। বলা হয়েছে যে ১০০০০ সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রাম এই মন্দিরের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল।[৩] এই সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত হলেও হতে পারে,

১। এ. ই. vi, পৃঃ ১৯১, ১৯৩, ১৯৯ ; xviii, পৃঃ ১০৮ ; Xi, পৃঃ ৩৩৭

২। এ. কে. মজুমদার, 'চৌলুক্যজ অফ গুজরাট', পৃঃ ৩১৮-৯,' সিদ্ধরাজ সিংহপুর অগ্রহারে অনেকগুলি গ্রামদান করেছিলেন। ঐ পৃঃ ২১১

৩। ইলিয়ট ও ডসন iv, ১৮

কিন্তু এই উক্তিতে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই যে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন স্থানের রাজারা সম্মিলিতভাবে দু-হাজার গ্রামদান করেছিলেন। যাই হোক না কেন, এ কথা ঠিক যে অন্য কোনো ধর্মীয় সংস্থার অধীনে এত বেশি গ্রাম ছিল না। এমন কি নালন্দার অধীনেও মাত্র ২০০টি গ্রামই ছিল। সোমনাথকে বাদ দিলে এটিই সর্বোচ্চ সংখ্যা।

মনে হয় চৌলুক্যগণ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে যেরূপ উদারতার সঙ্গে গ্রামদান করেছিলেন অনুরূপ উদারতা সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদের গ্রামদানের ক্ষেত্রেও দেখিয়েছিলেন। রাজপরিবারের একজন সদস্য হিসাবে রাজাকেও তাঁর ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য ১২৬টি গ্রামের একটি একক দান করা হয়েছিল।[১] সামন্ত ও রাজ-পদাধিকারীদেরও বড় বড় জায়গীর দেওয়া হয়েছিল। ১২০৯ সালে ত একজন উচ্চ পদাধিকারীকে জায়গীররূপে একটি সমগ্র পত্তলা দান করা হয়েছিল এই পদাধিকারী ভীমদেবের নিকট থেকে সমগ্র সৌরাষ্ট্রমণ্ডল জায়গীররূপে পেয়েছিলেন।[২] প্রবন্ধচিন্তামণি থেকে জানা যায় যে কুমারপাল আলিগ নামক জনৈক কুম্ভকারকে চিত্রকূট নামক পট্টিকা দান করেছিলেন যার মধ্যে ৭০০টি গ্রাম অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৩] সম্ভবতঃ এই সংখ্যাটি অতিরঞ্জিত। সম্ভবতঃ 'রাসমালায়' উল্লিখিত এই জনশ্রুতিও অতিরঞ্জিত যে মূলরাজ বহুসংখ্যক ঔদীচ্য ব্রাহ্মণকে গুজরাটে নিয়ে এসে তাদের বহু গ্রামদান করেছিলেন। কারণ এই বর্ণনার সমর্থনে অদ্যাবধি কোনো দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া যায় নি।[৪] কিন্তু মূলরাজ ব্রাহ্মণদের সিংহপুর নামক সুন্দর ও সমৃদ্ধ নগর দান করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে সিদ্ধপুর ও সিহোরের নিকট বহু ব্রাহ্মণকে ছোট ছোট গ্রামদান করেছিলেন[৫] এই জনশ্রুতি একেবারে ভিত্তিহীন বলে মনে হয় না। প্রধানতঃ কনৌজ ও উজ্জয়িনী থেকে এই সকল ব্রাহ্মণ গুজরাটে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং গুজরাটে এসে তাঁরা মঠের সংস্থাপক বা প্রধান হয়েছিলেন।[৬] গুজরাটে ব্রাহ্মণদের অপেক্ষা মন্দিরকেই বেশি গ্রাম অনুদান দেওয়া হয়েছিল এবং ব্রাহ্মণগণ এই সকল মন্দিরের পুরোহিত অথবা অর্চ্ছি হয়েছিলেন। ভূমি অনুদানের এই সকল শিলালৈপিক এবং সাহিত্যিক দলিল থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে গুজরাটে

১। এ. ই. i. নং ৩৬, প ৩-৪। এখানে ব্যবহৃত 'স্বভুজ্যমান' শব্দটির অর্থ প্রত্যক্ষভাবে রাজা কর্তৃক ভুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে।
২। ই. এ. xviii, ১১৩, প ১৯-২৩
৩। মেরুতুঙ্গাচার্যকৃত, 'প্রবন্ধচিন্তামণি', জিনবিজয় মুনি সম্পাদিত পৃঃ ৮০
৪। এইচ. ডি. সাঙ্কলিয়া, 'আর্কিওলজি অফ গুজরাট', পৃঃ ২০৮
৫। ফরবেস, 'রাসমালা' পৃঃ ৬৪-৫। লক্ষ্মীশংকর ব্যাসকৃত চৌলুক্য কুমারপাল (হিন্দীতে রচিত) পৃঃ ১৭৭-এ উদ্ধৃত।
৬। ঐ

চৌলুক্যদের আমলে ধর্মীয় এবং বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ দানগ্রহীতাদের দখলে বিরাট ভূক্ষেত্র ছিল।

এইকালে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কলচুরি রাজবংশের বিভিন্ন শাখার শাসনাধীন বঘেলখণ্ডে অনুদত্ত ভূমিরও একটা মোটামুটি আন্দাজ আমরা করতে পারি। এখানে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদেরই গ্রামদান করা হত, কারণ সম্ভবতঃ এই ব্রাহ্মণদের সাহায্যেই কলচুরি শাসকগণ অনুন্নত অঞ্চলগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন। অধিকাংশ অনুদানের ক্ষেত্রে এক-একটি গ্রামই দান করা হয়েছিল।[১] দৃষ্টান্তস্বরূপ কর্ণ (১০৪১-৭৩) যে বৈশালীতে জনৈক গ্রহীতাকে একটি গ্রামদান করেছিলেন তার উল্লেখ করা যায়।[২] কিন্তু একটি অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে রাজা ও রাজপরিবারের সদস্যগণ সম্ভবতঃ উক্ত নগরের বিষ্ণুমন্দিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ৮ জন ব্রাহ্মণকে পাঁচটি গ্রামদান করেছিলেন।[৩] দ্বিতীয় যুবরাজদেবের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে তাঁর প্রিয়তমা পত্নী নোহালা কোনো একজন শৈবসাধুকে ২টি এবং শিবমন্দিরকে ৩টি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[৪] তিনি একটি অন্য অনুদানে সম্ভবতঃ ২৩টি এবং তা যদি নাও হয়, অন্ততঃ ১৬টি গ্রামদান করেছিলেন।[৫] কলচুরিদের গোরখপুরের সরযূপার শাখাও ভূমি অনুদান দিয়েছিলেন। সোঢ়দেব (১১৩৫) দ্বারা ১৪ জন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত অনুদান থেকে জানা যায় যে প্রদত্ত ২০ নালু ভূমি ৬টি বিভিন্ন গ্রামে বিক্ষিপ্ত ছিল।[৬] ত্রিপুরী ও রতনপুরের কলচুরিগণ এবং তাদের সামন্তবৃন্দের অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে তাঁরা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে মোট ৬৫টি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন। এই সংখ্যাটিকে চন্দেলগণ প্রদত্ত গ্রাম অনুদানের সংখ্যার মত বড় মনে হয় না। কিন্তু যদি আমরা একটি শিলালিপিতে অঙ্কিত কাহিনী বিশ্বাস করি তা হলে স্বীকার করতে হবে যে ত্রিপুরীরাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ কোনো এক মঠকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল। এই শিলালিপিটির অনুসারে গোলকী মঠের প্রধান সম্ভাব শম্ভুকে কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ তিন লক্ষ গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে প্রথম যুবরাজের রাজ্যের কেন্দ্রীয় প্রদেশ তাহলে নয় লক্ষ গ্রাম ছিল।[৭]

১। ক. ই. ই. iv, নং ৬৩, প ১৯-২৫, শ্লোক ২৯-৩০
২। ঐ, নং ২৪৮, প ৩২-৪১
৩। ঐ, নং ৪২, শ্লোক ৩০-৪২
৪। ঐ, নং ৪৫, শ্লোক ৪৩-৫
৫। ঐ, নং ৪৬, শ্লোক ৩৬-৪২
৬। ঐ, নং ৭৪, শ্লোক ৩০, প ৩২-৫৯, সম্প্রতি একজন এই শিলালিপিতে উল্লিখিত ৬টি স্থানের নামকে একই গ্রামভুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন (পি. নিয়োগী, পৃঃ ১৬) কিন্তু এগুলি ৬টি গ্রামের ইঙ্গিতই বহন করছে বলে মনে হয়।
৭। মিরাশি-ক. ই. ই. iv, প্রারম্ভিক পৃঃ ১৫৮

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে তিনি মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ উক্ত মঠকে দান করেছিলেন। স্পষ্টতঃই এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না কারণ তাঁর রাজ্যে নয় লক্ষ গ্রাম কোথা থেকে আসবে ? কিন্তু কলচুরিরাজগণ যে মঠসমূহকে মুক্ত হস্তে দান দিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[১] বিশেষ করে শৈবমঠগুলিই এই দান-দাক্ষিণ্যের ফললাভ করেছিল। হর্ষ ও পাল রাজাদের আমলে যেমন বৌদ্ধমঠগুলি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল, কলচুরি-রাজাদের আমলে তেমনি শৈবমঠের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে পরমারদের অধীনস্থ মধ্যভারতের পশ্চিমাংশ মালবে আমরা ভিন্ন চিত্র দেখি। এখানে রাজপরিবারের সদস্য, সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদের হাতেই সম্ভবতঃ বেশিরভাগ জমি ছিল। মনে হয় অনুদত্ত ভূমির বৃহত্তর অংশের ব্যবস্থাপনার ভারও মন্দির পুরোহিতদের হাতে না থেকে এঁদের হাতেই ছিল। পরমাররাজ্যের সীমান্ত এলাকায় একজন সামন্তের অধীনে প্রায় ১৫০০টি গ্রাম ছিল, সেগুলি তিনি রাজসেবার পুরস্কার হিসাবে লাভ করেছিলেন। মালব ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা এইরূপ বহু জায়গীরে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ মনে হয় শাসক-পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত করে নেওয়ার প্রবৃত্তি। তাঁরা এই রাজ-বংশের দুটি পৃথক শাখার স্থাপনা করেছিলেন। পরমাররাজ্যের অধিকাংশই বোধ করি জায়গীরে বিভক্ত ছিল। ধর্মীয় প্রয়োজনে অনুদত্ত গ্রামের সংখ্যা ছিল খুব কম এবং এই উদ্দেশ্যে যে অনুদানগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি ছিল এক-একটি সম্পূর্ণ গ্রাম।[২] এ ছাড়া ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ছোট ছোট ভূমিও দান করা হয়ে থাকত।[৩]

রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে গ্রামসমূহ ভাগ করে দেওয়ার অধিকতর দৃষ্টান্ত চাহমান শিলালিপিতেই পাওয়া যায়। রাজস্থানের চাহমানরাজ্যের অন্তর্ভূত এলাকায় মন্দির[৪] অথবা ব্রাহ্মণের মালিকানাধীন গ্রামের সংখ্যা বিরল। এ কথা নিশ্চিত যে সেখানে যত গ্রাম রাজপরিবারের সদস্য, সামন্ত বা রাজপদাধিকারীর অধীনে ছিল তত গ্রাম, মন্দির বা ব্রাহ্মণদের মালিকানাধীনে ছিল না। অবশ্য এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ, সামন্তগণ বা রাজপদাধিকারীরাও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমি অনুদান দিয়ে থাকতেন।

১। মিরাশি—ক. ই. ই. iv, প্রারম্ভিক পৃঃ ১৫৮
২। এ. ই. xix, নং xxxix, অনুদান 'এ'; এ. ই. vi, পৃঃ ৫২-৩, প ৭-২৪; এ. ই. viii, ২১ নং পৃঃ ২০৬, নং ১৭, 'বি'।
৩। এ. ই. xı, নং ১৮, প ৭-১৮
৪। 'এ কপার প্লেট গ্রাণ্টস অফ অহ্লনস্ রেন ভি ১২০৫' দশরথ শর্মা, 'আর্লি চৌহান ড ইনেষ্টিস্' পৃঃ ১৮১-২, প ১৩-৪

১০ম শতাব্দীর উত্তরার্ধে এবং ১১শ শতাব্দীতে চম্বার পার্বত্যরাজ্যেও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভূমি অনুদান দেওয়া হত এবং কখনও কখনও অনুদান অগ্রহাররূপেও দেওয়া হয়েছিল।[১] কিন্তু এখানে গ্রাম অনুদানের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ আবাদযোগ্য ভূমির অভাবের জন্যই ছোট ছোট ভূমিই অনুদান দেওয়া হত। গার্হস্থ্য প্রয়োজনেও ভূমি অনুদান দেওয়া হত।[২] কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা করা কঠিন। যে বিভিন্ন প্রকার দানগ্রহীতার মধ্যে উপহার বা জায়গীররূপে প্রাপ্ত মোটমাট কত জমি ছিল।

৮ম থেকে নিয়ে ১০ম শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতে পাল ও প্রতীহারদের শাসনকালে এই অঞ্চলে প্রদত্ত গ্রাম অনুদানের যতগুলি শিলালিপি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অধিকাংশই দিল্লীর সুলতানশাহী প্রতিষ্ঠার পূর্বের দুই শতাব্দীব। উত্তর-প্রদেশ ও মধ্যভারতে প্রতীহারদের আমলে এত বেশি গ্রাম আর কখনও দেওয়া হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর ভূমি অনুদান প্রথার প্রচলন উত্তর ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মালব গুজরাট ও রাজস্থানের শিলালিপিগুলি থেকে মনে হয় যে অধিকাংশ জায়গীর রাজপরিবারের আত্মীয়-কুটুম্ব। সামন্ত এবং রাজ-পদাধিকারীগণের হাতেই ছিল এবং মনে হয় এই সকল ধর্মনিরপেক্ষ গ্রহীতাদের ধর্মীয় গ্রহীতাগণ অপেক্ষা বেশি অনুদান দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যভারতে পুরোহিতদের হাতেই বেশি জমি ছিল। বিহার, বাংলা ও আসামের বিষয়ে তথ্যাদির বড় অভাব। অতএব সামান্য যে তথ্যাদি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কোনো মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। তবে এইটুকু বলতে পারা যায় যে এই অঞ্চলে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত নালন্দার মত মঠ ও বিহারগুলি বহু গ্রাম ভোগ করেছিল।

ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ জায়গীর ভোগীদের দখলে ঠিক কত গ্রাম ছিল, তার সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। ইউরোপে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সেখানেও এ বিষয়ে যথেষ্ট পরিসংখ্যান হয় নি। উত্তর ভারতে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে প্রদত্ত গ্রামের সংখ্যাগুলি যোগ দিলেও সেই সংখ্যা মোট প্রদত্ত গ্রামের সংখ্যার আনুপাতিক হিসাব কি সেটা বলা কঠিন হবে, কেননা সবসুদ্ধ প্রদত্ত গ্রামের সংখ্যা আমাদের জানা নেই। তবুও এইযুগের ভূমি অনুদানপত্রগুলির সাক্ষ্যে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানরূপে গ্রামদানের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং এই অনুদান সংক্রান্ত কাজের জন্য উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, ধর্মলেখী ইত্যাদি রাজপদাধিকারী নিয়োগ করা

১। আ. সা. রি. ১৯০২-৩, পৃঃ ২৫২-৩, প ১১-২৫, পৃঃ ২৬০-১, প ১৫-৩২
২। ঐ

হত। এই সমস্ত থেকেই জানা যায় যে এইযুগে ভূম্যধিকারী মধ্যবর্তীদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল—এ যুগের অর্থব্যবস্থার এটিই বৈশিষ্ট্য।

পাল ও প্রতীহারদের রাজ্যে সাধারণতঃ অনুদত্ত গ্রামের সীমানা নির্ধারিত করে দেওয়া হত না।[১] তার ফলে একদিকে যেমন অনুদানভোগীরা নিজ নিজ জমির সীমানা বাড়িয়ে নিতে পারত, অন্যদিকে তেমনি কর্ষণযোগ্য জমির বিস্তার হয়েছিল, কারণ অনুদানভোগীরা নিজ নিজ ভোগ্য অঞ্চল বৃদ্ধির জন্য গ্রামের আশেপাশের জঙ্গল ও পতিত জমিগুলিকেও আবাদযোগ্য করে তুলত।

পূর্ব বিহার ও বাংলায় ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮)[২], তৃতীয় বিগ্রহপাল[৩] এবং মদনপালের (১০৪০-৫৭)[৪] শাসনকালে অনুদত্ত গ্রামের সীমা নির্দিষ্ট না করার প্রথা কায়েম ছিল। এই রাজাদের অনুদানপত্রে যে গ্রামসকল দান করা হয়েছিল, তার চারপাশের গোচারণভূমি ও ঝোপঝাড়ের উল্লেখ মাত্র করা হয়েছিল।[৫] সীমা নির্ধারণ না করার এই প্রথার অনুসরণ পূর্ব-বাংলায় বর্মণেরা[৬] এবং পালরাজাদের কোনো-কোনো সামন্তও[৭] করেছিলেন। পরবর্তীকালেও গয়ার নিকটবর্তী পীঠীর সেনরাজা[৮] এবং সংগ্রামগুপ্তও (ইনি ১২শ শতাব্দীর শেষের বৎসরগুলিতে, অথবা ১৩শ শতাব্দীর সুরুতে দক্ষিণ মুঙ্গেরে শাসন করতেন)[৯] এই প্রথাটিকে কায়েম রেখেছিলেন। সংগ্রামগুপ্তের অনুদানপত্রে 'চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ'[১০] শব্দটি প্রয়োগ করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হয় নি।

কিন্তু সেনরাজারা যাঁরা ১২শ শতাব্দীতে এবং ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ববঙ্গে ধীরে ধীরে বর্মণদের প্রভুত্বকে সমাপ্ত করে দিয়েছিলেন এবং পালরাজ্যের একটা বড় অংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন। তাঁরাও সর্বদা অনুদত্ত গ্রামের বা জমির সীমা নির্ধারিত করে দিতেন।[১১] সেনদের সমসাময়িক পূর্ববঙ্গের শাসক চন্দ্ররাও এই

১। কিন্তু কয়েকটি পাল ও রাষ্ট্রকূট অনুদানপত্রে গ্রামের পারিপার্শ্বিকের উল্লেখ করে সুনির্দিষ্ট-ভাবে গ্রামের সীমানির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে।

২। এ. ই. xxix, নং ১ 'বি', প ৪১। কিন্তু বেলোয়া তাম্রপত্র নামে পরিচিত এই অনুদানপত্র ৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িককালে জারী করা হয়েছিল।

৩। ঐ, নং ৭, প ৩২

৪। জা. এ. সো. বে. lxix, ভাগ ১, প ৩৯

৫। কখনও কখনও যুক্তি শব্দের পরিবর্তে পুক্তি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে

৬। ই. বে. iii, পৃঃ ২৩-৪, প ৩৭-৪১

৭। জা. বি. উ. রি. সো. iv, ২৮০, শ্লোক ২-৩

৮। ঐ, পৃঃ ১৫৬-৭, প ২১-৩২

৯। ঐ v, ৫৯৩-৪, প ১০

১০। ঐ

১১। ই. বে. iii, পৃঃ ৭৮, প ৩৭-৫৪ ; পৃঃ ১১৪-৫, প ৩৯-৫১ ; পৃঃ ১২৯-৩১, প ৪৬-৫০

প্রথারই অনুসরণ করেছিলেন। লাড়হচন্দ্রের ময়নামতী তাম্রপত্রে অনুদত্ত গ্রামের সীমা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছিল।[১] পরবর্তীকালে অনুদত্ত জমির সীমা, ক্ষেত্রফল এবং আয় নির্ধারিত করে দেওয়ার ফলে প্রতীয়মান হয় যে অনুদান দিয়ে জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলার সম্ভাবনা আর ছিল না। কিন্তু আলোচ্যকালে আসাম সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযুক্ত হতে পারে না যদিও আসামে জমির সীমানা নির্ধারিত করে দেওয়া হত এবং জমিতে উৎপন্ন ফসলের বর্ণনাও দেওয়া হত।[২] আসামে গ্রামের পরিবর্তে জমির খণ্ড দান করা হত বলেই, সম্ভবতঃ জমির সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু সীমা নিধারণ করে দেওয়ার ফলে প্রতীয়মান হয় যে অনুদান দিয়ে জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলাব সম্ভাবনা আর ছিল না। কিন্তু আলোচ্যকালে আসাম সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযুক্ত হতে পারে না, যদিও আসামে জমির সীমানা নির্ধারণ করে দেওয়া হত এবং জমিতে উৎপন্ন ফসলের বর্ণনাও দেওয়া হত।[৩] আসামে গ্রামের পরিবর্তে জমির খণ্ড দান করা হত বলেই, সম্ভবতঃ জমির সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু জমির সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার ফলে অনুদানভোগী নিজ জমির সীমা বাড়িয়ে নিতে পারত না।

পূর্ববঙ্গের এ ব্যবস্থার বিপরীত দেখি উত্তরপ্রদেশ ও গাহরওয়ালে। সেখানে সামন্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত গ্রামের সীমা সাধারণতঃ নির্ধারিত করে দেওয়া হত না।[৪] এই বিষয়ে সাধারণতঃ 'সীমাপর্যন্ত গ্রাম:' শব্দাবলীর প্রয়োগ হত, 'চতুরাঘাট বিশুদ্ধ:'[৫]-এর ব্যবহারও করা হত। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র গোবিন্দচন্দ্রের বসাহী অনুদানপত্রেই জমির চারপাশের সীমা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।[৬] গাহরওয়ালেবা সাধারণতঃ উন্নত অঞ্চলেই জমিদান করেছিলেন। এইজন্য সীমা নির্দিষ্ট না করার কোনো কারণ বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ ধরে নেওয়া হত যে অনুদত্ত ক্ষেত্রের সীমা সকলেরই জ্ঞাত, অতএব তার উল্লেখের, কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই কারণেই যদি জমির সীমা অনির্ধারিত রাখা হত তা হলেও জমির মালিক নিজ ব্যক্তিগত জমির সীমানা বাড়িয়ে নেবার সুযোগ নিশ্চয়ই গ্রহণ করত।

বঘেলখণ্ডের কলচুরিরাজ্যেও অনুদত্ত গ্রামের সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত না। ত্রিপুরী ও রতনপুরের কলচুরিও তাদের সামন্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত ৬৫ গ্রাম অনুদানের

১। তাম্রপত্র ১, প ৬-১১, ২, প ৮-১১। এই তাম্রপত্রগুলি এখন পাকিস্তানের পুরাতত্ত্ব বিভাগের নিকট আছে।

২। জা. এ. সো. বে. lxvi. ভাগ ১; পৃ: ২৯৫-৭; ঐ lxvii, ভাগ ১, পৃ: ১২০; ঐ lxvi, ভাগ', ৯ পৃ: ১৩০-১

৩। ই. এ. xviii, ১১, ১৬, ১৩১, ১৩৬-৭, ১৩৯-'১, ১৪৩

৪। ঐ

৫। ই. এ. xiv, ১০৩

যে শিলালৈপিক প্রমাণ পাওয়া যায়[১], তাদের মধ্যে একটিরও সীমানা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। বহু অনুদত্ত গ্রামের উল্লেখমাত্র করা হয়েছে ; তাদের কোনো-প্রকার বর্ণনাও দেওয়া হয় নি। বিশেষ করে সামন্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান-গুলিতে। এর কারণ এই হতে পারে যে বাইবে থেকে[২], বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ থেকে, ব্রাহ্মণগণ এসে মধ্যভারতে বসতিস্থাপন করতেন। ফলে এই সকল অঞ্চলে চাষ-আবাদের নতুন নতুন পদ্ধতির প্রচলন হয়ে থাকবে এবং কৃষির উন্নতিও হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে অনুদত্ত ভূমির উপব প্রকৃত চাষীদের কোনো স্বত্ব জন্মাত না।

মালবের পশ্চিম অংশে ও মধ্যভারতের পূর্বপ্রান্তে অনুরূপ অবস্থা বর্তমান ছিল। এখানেও পরমার বাজাদেব অনুদানপত্রে প্রদত্ত গ্রামের সীমানা নির্ধারণ করা হয় নি। একটি অনুদানপত্রে একটি গ্রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে গ্রামটিব বিস্তার এক ক্রোশ[৩], কিন্তু অন্যান্য অনুদানপত্রে এইটুকুও উল্লেখ করা হয় নি।[৪] পাল অনুদানপত্র এবং অন্যান্য দলিলদস্তাবেজে যে 'স্বসীমাতৃণযুতি গোচব পর্যন্ত' শব্দাবলীব বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, তার ব্যবহার এই অনুদানপত্রগুলিতেও কবা হয়েছে। মনে হয় মালবে এখনও পতিত জমি আবাদযোগ্য করে তোলাব অবকাশ ছিল, কাবণ বাইরের বহু স্থান থেকে ব্রাহ্মণদেব আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল।[৫] কিন্তু এও সম্ভব যে তাদের অনেককেই পতিত জমি আবাদ করার জন্য নয়, ববং পবমাব রাজাদের সমর্থন জানাবার জন্যই আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল।

বহু চন্দেল অনুদানপত্রেও অনুদত্ত গ্রামের সীমা নির্দেশ কবে দেওয়া হয় নি। এই মন্তব্য অবশ্য বিশেষ করে ১২শ শতাব্দীর পূর্বে প্রদত্ত অনুদানগুলি সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য[৬] অবশ্য পরের কিছু-কিছু অনুদান সম্পর্কেও এ কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।[৭] চন্দেল অনুদানপত্রেও গাহবওয়াল অনুদানপত্রে প্রযুক্ত শব্দাবলীর

১। ক. ই. ই. iv, নং ৪২, শ্লোক ৩০-৪২ ; নং ৪৫, শ্লোক ৪৩-৫ ; নং ৪৬, শ্লোক ৩৫-৪২ ; নং ৪৮, প ৩৬-৪০ ; নং ৫০, প ৩৮-৪৮ ; নং ৫৬, প ২৮ ; নং ৬০, শ্লোক ২৯-৩০ ; নং ৬৩' প ২৭ ; নং ৬৫, প ১১-২ ; নং ৬৮, প ৭-১০ , নং ৭০. প ১৩ ; নং ৭৫, প ৮-১১ ; নং ৭৭, শ্লোক ৩৩ ; নং ৮২ প ১৮-২১ ; নং ৮৩, শ্লোক ২০, নং ৮৬, শ্লোক ১৬ ; নং ৮৮, শ্লোক ২৩ ; নং ৮৯, শ্লোক ১৬ ; নং ৯১, শ্লোক ১৫-৬ ; নং ৯৪, শ্লোক ১৫। নং ৯৬, শ্লোক ৩৯ ; নং ৯৭, শ্লোক ১৩ ; নং ৯৮ শ্লোক ৪২ ; নং ৯৯, শ্লোক ১৮ ; নং ১০১, শ্লোক ১৯ ; নং ১০২, শ্লোক ১৯ ; নং ১১৭, প ৮-১০ ; নং ১২৩, শ্লোক ১৫ ; ক. ই. ই iv, ৬৫২

২। মিরাশি—ক. ই. ই. iv, পৃঃ cixvi

৩। ই. এ. xi, পৃঃ ৫২-৩, প ৭-২৪

৪। ঐ xiv, পৃঃ ১৬০, প ৯-১৭, "প্রসিডিংস অফ (পরে 'অল. ইণ্ডিয়া') ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স" i, ৩২৫-৬

৫। পি. সি. গাঙ্গুলী, "হিস্ট্রী অফ দি পরমার ডাইনেষ্টি" পৃঃ ২৪০

৬। ই. এ. xvi, ২০৪, প ৬-১১ ; ঐ ২০৬-৭, প ৬ ১৫

৭। এ. ই. xvi, নং ২০, প ৭-১৪ ; ই. এ. xvi, পৃঃ ২০৯-১০, প ৫-৭, ১৫-৭ ; এ. ই. xxxii. ১১৯-২০ ; xxxi, নং ১১, প ১১-৮

ব্যবহার করা হয়েছে। সীমার নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে 'চারটি প্রত্যন্ত সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রাম'। কিন্তু চারটি সীমার কোনো বর্ণনা দেওয়া হয় নি। পরমর্দিনের একটি অনুদানপত্রে (১১৬৭) সম্ভবতঃ ৬২ এবং না হলে অন্ততঃ ১১টি গ্রাম অনুদানের উল্লেখ ত পাওয়া যায়ই, কিন্তু এগুলির মধ্যে একটিরও সীমার উল্লেখ করা হয় নি।[১] কিন্তু ১১৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মদনবর্মণ কর্তৃক অনুদত্ত একটি ভূমিখণ্ডের সীমার এবং জমিতে উৎপন্ন ফসলের উল্লেখ করা হয়েছে।[২] পরমর্দিনের মহোবা প্লেটেও (১১৭৩) অনুদত্ত ভূমির সীমানা এবং ক্ষেত্রফলের উল্লেখ আছে। এর ফলে অনুমান করা চলে যে চন্দেলরাজগণ ভূমিখণ্ড অনুদান করলে তার সীমানা নির্দিষ্ট করে দিতেন, কিন্তু গ্রাম অনুদানের ক্ষেত্রে এইরূপ করতেন না। সব মিলিয়ে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে চন্দেল অনুদানভোগীরা প্রাপ্ত গ্রামের সীমানা বাড়িয়ে নেবার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।

চৌলুক্যদের শাসনাধীন গুজরাটের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। অনুদত্ত গ্রামের সীমানা অনির্ধারিত রেখে দেবার প্রথা সম্ভবতঃ ১০ম শতাব্দীর শেষ চরণে মূলরাজের শাসনকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।[৩] অজয়পালের জনৈক চাহমান সামন্ত দ্বারা ৫০ জন ব্রাহ্মণের ভরণ-পোষণের জন্য ১১৭৫-এ প্রদত্ত গ্রামের কোনো সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হয় নি।[৪] কিন্তু প্রথম ভীমদেব কর্তৃক প্রদত্ত একটি গ্রাম[৫] এবং দ্বিতীয় ভীমদেব[৬] এবং তার অধীনস্থ কোনো রাজপুরুষের[৭] দ্বারা প্রদত্ত কয়েকটি অনুদত্ত ভূমিখণ্ডের সীমানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এগুলির মধ্যে বেশির-ভাগ অনুদানই দেওয়া হয়েছিল ১৩শ শতাব্দীতে। এইভাবে সমস্ত দিক বিবেচনা করে দেখলে মনে হয় যে গুজরাটে ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে অনুদত্ত গ্রামের সীমানা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হত, এ নিয়ম ঐ রকম উন্নত অঞ্চলের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে সাধারণতঃ অনুদত্ত গ্রামের সীমানা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হত না এবং তার ফলে দানগ্রহীতা নিজ মালিকানাধীন গ্রামের সীমানা বাড়িয়ে নেবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারত।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর ভূমি অনুদান দানগ্রহীতাকে ভূমি ও অন্যান্য বিষয়-

১। এ. ই. iv, নং ২০, প ৬-১১
২। ই. এ. xvi, পৃঃ ২০৯-১০, প ৫-৭
৩। ই. এ. vi, পৃঃ ১৯২-৩, প্লেট ১, প ৬-১১
৪। ই. এ. viii, পৃঃ ৮৩, প ১৮-২১
৫। প্রথম ভীমদেবের ভদ্রেশ্বর শিলালিপি, প ৩-৫। 'স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিক্যান স্টাডিজ'-এর ডঃ জে. ডি. কাসপেরি উক্ত শিলালিপির পাঠের একটি প্রতিলিপি অনুগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।
৬। ই. এ. xviii, পৃঃ ১১০, প ৭-১২
৭। ঐ, পৃঃ ১১৩, প ২৬-৪২

সম্পদ অর্জনে সাহায্য করেছিল। কিছু প্রাথমিক পাল অনুদানপত্রে দেখা যায় যে গ্রাম অনুদানের সময় সামন্ত, রাজপদাধিকারী এবং গ্রাম্যসমাজের নিকট প্রথাগত অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালের অনুদানে এই প্রথার কোনো মর্যাদা দেওয়া হয় নি। তখন অনুমতি প্রার্থনা না করে অনুদানের সূচনামাত্র তাদের দেওয়া হত।[১] অবশ্য পূর্ববঙ্গের চন্দ্রদের তাম্রপত্রে[২] প্রাচীন প্রথারই অনুসরণ দেখা যায়।[৩] কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত ও গুজরাটের নৃপতিগণ গ্রাম্য অধিবাসীদের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করতেন না। তাঁরা গ্রামপ্রধান, নেতৃস্থানীয় গ্রামবাসী এবং কদাচিৎ কখন কৃষকদের অনুদানের সূচনা দিতেন, কিন্তু প্রথাগতভাবে তাদের কাছে অনুদানের অনুমতি নিতেন না। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে গ্রামের বিষয় সম্পদের উপর গ্রামবাসীদেব অধিকার ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

ভূমি-বিষয়ক অধিকার অনুদানভোগীর নামে হস্তান্তরিত করার জন্য যেসকল অনুদানপত্র দেওয়া হয়েছিল, সেগুলির এই সময় পাল ও প্রতীহারদের অনুরূপ প্রথা অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু দানগ্রহীতাকে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের সকল-প্রকার আয়ের উৎসের অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে। গোচারণভূমি, ঘাসের জমি, আম ও মহুয়া-বৃক্ষ, জলাশয়, ঝোপঝাড়, বনভূমি, পতিত জমি, নাবাল জমি, উর্বর জমি, যখন-তখন বানে ডুবে যায় এমন জমি, এগুলি তো দানগ্রহীতাকে পূর্বের মত দেওয়াই হত উপরন্তু এগুলির সঙ্গে আরও অনেক কিছু সংযুক্ত করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ববঙ্গে দানগ্রহীতাকে নারিকেল ও সুপারি-বৃক্ষ ব্যতিক্রমবিহীনভাবে দেওয়া হত।[৪] প্রথম দিককার অনুদানপত্রে এগুলির উল্লেখ সম্ভবতঃ ছিল না। বৃক্ষরোপণকারীর পক্ষে এখন এই বৃক্ষগুলি নগদ আয়ের একটি প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছিল সন্দেহ নাই। এ ছাড়া অনুদানে প্রদত্ত গ্রামের লবণখনির অধিকারও গ্রহীতাকে দেওয়া হত।[৫] বিহার[৬] উত্তরপ্রদেশ[৭] ও বঘেলখণ্ডের কিছু অনুদানপত্রে 'সলোহলবণকরঃ' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে এই সকল বিষয়-সম্পদ হস্তান্তরের ফলে গ্রামবাসীদের উপর

১। 'মতবস্তু'র স্থলে 'বিদিতমস্তু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ই. এ. xxix, নং ৭, প ৩১ ; জা. এ. সো. বে. lxix, ভাগ ১, পৃঃ ৬৬, প ৩৯

২। লাড়হচন্দ্রদেবের দুটি ময়নামতী তাম্রপত্র প্রথমে ডঃ এ. এইচ. দানীর নিকট ছিল, এখন পাকিস্তানের পুরাতত্ত্ব বিভাগে আছে।

৩। জা. বি. উ. রি. সো. v, ৫৯৩-৪, প ৯

৪। ঐ

৫। ই. বে. iii, পৃঃ ২৩-৪, প ৩৭-৪১

৬। জা. বি. উ. রি. সো.•v, ৫৯৩-৪ প ১০-৩১

৭। এ. ই. ix, নং ৪৭, প ৩-১৪

তার কিরূপ প্রভাব পড়ত তা সঠিক জানা যায় না বটে, কিন্তু দানভোগীর হাতে গ্রামের সম্পদের অধিকার যে চলে যেত সেটা অনুমান করা যায়।

আশ্চর্যের বিষয় বাংলাদেশে কিন্তু মাছ ধরার অধিকার দানগ্রহীতাকে দেওয়া হত না, যদি না পুষ্করিণী বা অন্যান্য জলাশয়ের উপর দানগ্রহীতার অধিকারের মধ্যে মাছ ধরার অধিকাবও থাকত। এই প্রদেশের অধিবাসীদের সার্বজনীন মৎস্যপ্রীতিই কি এব কারণ? কিন্তু গাহরওয়াল অনুদানপত্রে গ্রহীতাকে মাছ ধরার রাজকীয় অধিকার (মৎস্যাকবঃ)[১] স্পষ্টভাবেই দেওয়া হত। লবণ বা লৌহখনি হস্তান্তরের ফলে[২] গ্রামের অধিবাসীদের উপব তার কোনো প্রতিকূল প্রভাব পড়ে নি, কাবণ এইগুলি সকল গ্রামে পাওয়া যেত না। কিন্তু মাছ ধবাব অধিকার হস্তান্তর গ্রামবাসীদের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তাব করত, কাবণ তারা এর ফলে যথেচ্ছ মাছ ধরতে পারত না।

চন্দেল অনুদানপত্রে অনুদত্ত গ্রাম এবং গ্রামে উৎপন্ন ফসল ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীব বৃক্ষাদি এবং খনি ছাড়া, এগুলিতে কুসুম (কেশর উৎপাদনকারী ফুল), আখ, কার্পাস এবং শণ ইত্যাদিও দানগ্রহীতাকে হস্তান্তরিত কবা হয়েছিল।[৩] কয়েকটি অনুদানপত্রে ত হরিণ, পাখি ও জলচরের নামের উল্লেখও আছে।[৪] স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের অধিবাসীদের এই সকলের উপর যে অধিকার ছিল তা হবণ কবা হত। একইভাবে কিন্তু সে অনুদানপত্রে এবং প্রায় সকল চন্দেল অনুদানপত্রেই[৫] গ্রহীতাকে অনুদত্ত গ্রামে অবস্থিত মন্দিরও হস্তান্তরিত করা হত। সম্ভবতঃ এই মন্দির গ্রামবাসীগণ সম্মিলিতভাবে নির্মাণ করত এবং সার্বজনীন ধর্মীয় প্রয়োজনে ব্যবহাব কবত। এই মন্দিরগুলি কিন্তু অনুদানভোগীর নিকট হস্তান্তরিত হয়ে গেলে, সম্ভবতঃ এগুলির অবাধ ব্যবহার একটু কঠিন হয়ে পড়ত। বিশেষ করে দানগ্রহীতা যদি ব্রাহ্মণ হতেন, তা হলে মন্দিরের পূজার্চনা, ভোগ, প্রসাদ ইত্যাদির উপব নিশ্চিতরূপে সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করতেন।

গ্রহীতাকে অন্যান্য ভোগ্যবস্তুর সঙ্গে খনিজসম্পদও হস্তান্তরিত করা হত। এই সকল খনিজসম্পদের উপর রাজার অধিকার ত ছিলই, কিন্তু আমলাদের সাহায্যে সেগুলির পূর্ণভোগ রাজার পক্ষে কঠিন ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় গ্রামবাসীগণই সেগুলির সদ্ব্যবহার করত। কিন্তু দানগ্রহীতা স্বয়ং গ্রামের অধিবাসী হলে গ্রামের অন্যান্য অধিবাসীদের ঐ সকল সম্পদ ভোগ করার কোনো সুযোগ থাকত না।

১। জা. বি. উ. রি. সো. II, ৪৪৩-৯, প ১৪
২। ঐ
৩। এ. ই. xx, নং ১৪, প ১৭-২০
৪। এ. ই. xvi, নং ২, প ২৬
৫। ঐ, প ২৫ (এখানে 'সমন্দির প্রকার' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে)

অতএব গ্রাম অনুদানের ফলে গ্রামের অধিবাসীদের সার্বজনীন অধিকার ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হতে থাকে। পাহাড়, নদী, জঙ্গল ইত্যাদি হস্তান্তরের অর্থই এই যে ভূমিসম্বন্ধীয় সকল প্রকার অধিকারই দানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করে, সেগুলির উপব গ্রহীতার স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া। চন্দেলদের রাজত্বে ব্যবসায়িক ফসলেব উপর কর আরোপ করা হত এবং পরমারবাজ্যে গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে 'বাপী-কূপ-তড়াগ' ইত্যাদি হস্তান্তর করা হত, এই দেখে মনে হয় সাধারণকে প্রদত্ত সেচ-ব্যবস্থা থেকেও রাজ্যের কিছু আয় হত। জলসেচন কর ত কৌটিল্যের সময় থেকেই চলে আসছিল। এখন সম্ভবতঃ সেগুলি থেকে আয়ের অধিকার দানগ্রহীতাকে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ বহু অনুদানপত্রে যে পাহাড়, লবণ ও লৌহখনি ইত্যাদি হস্তান্তবের উল্লেখ আছে সেগুলি নিতান্তই নিয়মরক্ষার জন্য, কাবণ সকল গ্রাম বা ভূখণ্ডেই এসব থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু যেখানে এগুলি পাওয়া যেত, সেখানে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার দানগ্রহীতাই নিশ্চয় করত। অর্থাৎ এখন যারা পাহাড় থেকে পাথর কাটত, অথবা গৃহনির্মাণের জন্য সার্বজনীন জমি থেকে মাটি সংগ্রহ কবত, তাদের দানগ্রহীতাকে কিছু কর দিতে হত। অন্যথায় এই সকল সম্পদেব হস্তান্তরের উল্লেখের আব কিই বা প্রয়োজন থাকতে পারে?

অনুদানভোগী অর্থিক অধিকার সীমা লঙ্ঘন করছে কিনা, সেটা দেখাশোনার জন্য শাসক কোনো ব্যবস্থা করতেন না। কৃষকগণ সম্পূর্ণভাবে দানগ্রহীতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করত—তা দানগ্রহীতা ধর্মনিরপেক্ষ অথবা ধর্মীয় যে অনুদানভোগীই হোক না কেন। সম্ভবতঃ ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানভোগীর অধীনে কৃষকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল, কারণ এইরূপ অনুদানভোগীদের রাজ্যকেও কিছু কর দিতে হত। কিন্তু সব মিলিয়ে কৃষকদের অবস্থা স্বাধীন, শক্তিমান চাষী ভূস্বামীব মত ছিল না, বরং তারা দানগ্রহীতাব অধীনস্থ কৃষিদাসে পরিণত হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে অনুদত্ত গ্রামের বিষয়-সম্পদেব সুখ-সুবিধার বিবরণী দেওয়া হত, তার উপর অনুদানভোগীর যে শুধু ভোগাধিকাব ছিল তাই নয়, সেগুলির উপর তাদেব স্বত্বাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হত। একজন পণ্ডিতের মতে কলচুরি অনুদানপত্রে গ্রহীতাকে প্রভুত্বের অধিকার দেওয়া হত না, বরং শুল্ক বা কর ইত্যাদি আদায় করার রাজকীয় বিশেষাধিকার দেওয়া হত।[১] যে অনুদানে মাত্র গ্রামের নাম এবং রাজকরের উল্লেখ আছে, সেই গ্রাম সম্পর্কে এই মন্তব্য সত্য হতে পারে, কিন্তু যে অনুদানপত্রে গ্রামের সকল-প্রকার আয়ের উৎসের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেই গ্রাম সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য বলে মনে হয় না। পরমার অনুদান-

১। মিরাশি—ক.ই. ই. ৪, প্রারম্ভিক পৃঃ ১৭১

পত্রে গ্রাম্য বিষয়সম্পদ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেখা যায়।[১] এগুলিতে গোচারণভূমি এবং ঘাস-খড়ের জমির উল্লেখমাত্র আছে। চৌলুক্য অনুদানপত্রে কেবল বৃক্ষপংক্তিরই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[২] চাহমান অনুদানপত্রেই সবচেয়ে ছোট সূচী পাওয়া যায়। এটিতে গ্রামের নামমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] রাজস্থান, মালব এবং গুজরাটে অনুদানভোগীকে ভূমি-বিষয়ক সকল-প্রকার অধিকার প্রদান করা হত না। কিন্তু আমরা সাধারণভাবে গাহড়ওয়াল অনুদানপত্র এবং বিশেষভাবে চন্দেল অনুদানপত্র সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করতে পারি না।

উপরন্তু এ কথাও বলা হয়েছে যে গ্রামের সম্পদের উৎসগুলি হস্তান্তর করার ফলে গ্রামবাসীদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হত না। অনুদত্ত গ্রামের জলাশয়, পুষ্করিণী, সার্বজনীন গোচারণভূমি ইত্যাদি তারা পূর্ববৎ ভোগ করতে পারত।[৪] কিন্তু এগুলি দানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করে দিলে সে গ্রামবাসীদের পরম্পরাগত অধিকার কতদূর রক্ষা করত সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। পূর্বে যেরূপ বলা হয়েছে, সরকারী আমলাদের গ্রামে সাময়িক অবস্থিতিতে গ্রামের সার্বজনীন অধিকার বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হত বলে মনে হয় না, কিন্তু দানগ্রহীতা অনুদত্ত গ্রামে স্থায়িভাবে বসবাস করার ফলে গ্রামবাসীদের সার্বজনীন অধিকারসমূহ ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হতে থাকল।

অনুদত্ত ভূমি থেকে পুনরায় অনুদান[৫] দেবার প্রবৃত্তি এইকালে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমরা অন্যত্র দেখেছি যে রাজপরিবারের সদস্য, সামন্ত এবং রাজপদাধিকারীগণ কখনও কখনও রাজার অনুমতি নিয়ে, আবার কখনও কখনও রাজার অনুমতি ছাড়াই, পুরোহিত এবং মন্দিরকে নিজ নিজ জায়গীর থেকে অনুদান দিতেন।[৬] তা ছাড়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরকে অনুদান দিতে কখনও কখনও স্বয়ং রাজাকেও বাধ্য করতেন। স্থানীয় বণিকদের উপরেও তাঁরা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করে, প্রতি বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করতেন। এ কথা সত্য যে দাতার প্রতি ধর্মীয় অনুদানভোগীর কোনো আর্থিক দায়-দায়িত্ব ছিল না, দাতা তাদের কাছ থেকে কেবল শুভেচ্ছা এবং নৈতিক সমর্থনই আশা করতে পারতেন, কিন্তু এই অনুদানের ফলে বিভিন্ন স্তরের ভূম্যধিকারীর উদ্ভব হয়েছিল, মূল দানগ্রহীতা রাজানুগ্রহের,

১। ই. এ. xiv, পৃঃ ১৬০, প ১৩
২। ঐ, xviii, পৃঃ ৫৩, প ১৯
৩। এ. ই. ii, নং ৮, শ্লোক ৪৮-৯। দশরথ শর্মাকৃত 'আর্লি চৌহান ডাইনেস্টিজ', পৃঃ ১৮২-তে 'এ কপারপ্লেট গ্রাণ্ট অফ অহ্লনস রেন' শীর্ষক প্রবন্ধ।
৪। মিরাশি—ক. ই. ই. iv, প্রারম্ভিক পৃঃ ১৩১-২
৫। এ. ই., ii, নং ৮, শ্লোক ৪৯
৬। ঐ, সামন্ত, মহাসামন্ত এবং অনুরূপ অন্য রাজপুরুষদের দ্বারা অনুদান দেওয়া কিছু উদাহরণ পি. নিয়োগী সংগ্রহ করেছেন। দ্রঃ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৪-৬

ধর্মীয় দানগ্রহীতা মূল দানগ্রহীতার অনুগ্রহের এবং কৃষক উভয়েরই অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী ছিল। এ কথা সত্য যে কলচুরিরাজ্যের মত ধর্মীয় অনুদানভোগীকে সর্বত্র ভূমির উপর বিস্তৃত অধিকার প্রদান করা হত না। কিন্তু যেসকল মঠ বা ব্রাহ্মণকে ২৬টি গ্রাম অনুদান দেওয়া হত, তারা সেই গ্রামসমূহের ব্যবস্থা নিজেরাই করতে পারতেন না, অন্য লোক নিযুক্ত করতেই হত, এই মধ্যবর্তীদের বেতনরূপে ভূমিদান দেওয়া হত, অথবা রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়া হত।

এবার আমরা রাজকীয় সেবার পরিবর্তে অনুদান দেওয়ার প্রসঙ্গে আসি। এই প্রথায় ছোটখাট রাজসেবার প্রতিদান হিসাবে ভূমি অনুদান দেওয়া হত। এই প্রথার প্রচলন কৌটিল্যের সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায়। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে নতুন জনপদে গ্রামেব শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকারীর বিভিন্ন রাজকর্মচারীদের ভূমি অনুদান দেওয়া বিধেয়। সামন্তবাদী ইউরোপেও এই প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। মনে হয় মধ্যকালের প্রারম্ভে উত্তর ভারতের কোনো-কোনো অংশেও অনুদানের এই প্রথা প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ গঙ্গের অধীনস্থ উড়িষ্যায় তাম্রকার, কাংস্যকার এবং বারুজীবীদের অনুদানের অঙ্গরূপে, মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হত এবং তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে তাদের জীবিকার ব্যয়নির্বাহের জন্য ভূমিখণ্ড বৃত্তিরূপে দেওয়া হত।[১] বাংলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যভারতে এই বিষয়ে কোনো শিলালৈপিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু জানা যায় যে চম্বাতে এই প্রথা বেশ ভালভাবে প্রচলিত ছিল। এই পার্বত্যরাজ্যের ১১শ শতাব্দীর একটি অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে একটি মন্দিরকে এমন কতকগুলি ভূখণ্ড অনুদানরূপে দেওয়া হয়েছিল, যেগুলি প্রথমে পাচক, গোষ্ঠীক চৌকিদার (অষ্টপ্রহারিকাঃ) এবং অন্যান্য ছোটখাট কর্মচারীদের তাদের সেবার পরিবর্তে প্রাপ্য ছিল।[২] এই ভূমির একাংশ মন্দিরের অষ্টপ্রহারিকের বৃত্তির জন্য বিশেষভাবে পৃথক করে রাখা হয়েছিল।[৩] মন্দিরের সেবাকারীর পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য এইরূপ ভূখণ্ড দান করা হত। মন্দিরের সেবকদের জন্য যেমন ভূমিবৃত্তিদানের প্রচলন ছিল, মনে হয় রাজা ও ছোটখাট সামন্তদের (রণকিল) সেবাকারী ছোট ছোট কর্মচারীদের বৃত্তিদানের জন্যও অনুরূপ প্রথারই অনুসরণ করা হত।

এই প্রথা অনুসরণের কিছু দৃষ্টান্ত রাজস্থানেও পাওয়া যায়। উদয়পুরে দুটি মন্দিরকে প্রদত্ত অনুদানটিই এর প্রথম দৃষ্টান্ত।[৪] এই অনুদানপত্রে কায়স্থ

১। জা এ. সো. বে. lxv, ভাগ ১, পৃঃ ২৫৪-৬, প ১-১১
২। আ. সা. রি. ১৯০২-৩, পৃঃ ২৬২-৪ প ১১-৩২
৩। ঐ, প ২৮-৩১
৪। এ. ই. xx, পৃঃ ১২৩

পরিবারোদ্ভূত বৈদ্য গৌয়ক কর্তৃক কিছু জমিদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এই পরিবারের কেউ কেউ গুহিলোত সর্দারের অধীনে লিপিক ও বৈদ্যরূপে কাজ করতেন এবং সম্ভবতঃ এই সেবার পরিবর্তে তাঁরা কিছু জমি উপহার পেয়েছিলেন।[১] এই প্রথা নডোলের চাহমানদের রাজ্যেও প্রচলিত ছিল। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি ১১৪১ সালের একটি শিলালিপি।[২] এটির মতে ধালেপনগর আটটি ভাগে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক বিভাগের জন্য দু-জন করে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা এসব বিভাগের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।[৩] যদি তারা চোরের অনুসন্ধানে ব্যর্থ হওয়া সত্বেও রাজ্য থেকে জীবিকার দাবি করতেন, তা হলে তাঁদের শাস্তিদান করা হত।[৪] স্পষ্টতঃই এই ১৬ জন ব্রাহ্মণকে তাঁদের জীবিকানির্বাহের জন্য ভূমিদান করা হয়েছিল এবং পরিবর্তে তাঁরা উক্ত দায়িত্বপালন করতেন।

গুজরাটের একটি চৌলুক্য অভিলেখেও বৈষয়িক সেবার পরিবর্তে ভূমি অনুদানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ভীমসেনের শাসনকালে জনৈক উচ্চপদস্থ রাজপদাধিকারী, যিনি জাতিতে সম্ভবতঃ বণিক ছিলেন, তিনি একটি সেচকূপ এবং তৎসংশ্লিষ্ট সেচনালী নির্মাণ করে সেটি দেখাশোনার জন্য প্রাগবৎ গোত্রের কোনো এক ব্যক্তিকে (সম্ভবতঃ বণিক) কিছু জমি অনুদান দিয়েছিলেন।[৫] সম্ভবতঃ গুজরাটে অনুরূপ আরো অনুদান দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল।

পূর্ববর্তীকালের কিছু অনুদানে অনুদত্ত গ্রাম বা ভূখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও কারিগরদেরও হস্তান্তরের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু মনে হয় অগ্নিপুরাণের সংকলন সম্পূর্ণ হওয়া অবধি, অর্থাৎ ১১শ শতাব্দীর সুরুতেই[৬] এই প্রথা বেশ ভালভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই পুরাণে কৃষকসমেত গ্রামদানের বিধান দেওয়া হয়েছে।[৭] আরো বলা হয়েছে যে মঠ-মন্দিরকে ভূমি ও দাস দান করা বিধেয়[৮] এবং সেই সঙ্গে তাদের নৃত্যগীতাদির সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া উচিত। নৃত্যগীতাদির সুযোগ-সুবিধাদানের অর্থ সম্ভবতঃ গায়ক-গায়িকা ও নর্তক-নর্তকীর হস্তান্তর। এই-

১। এ. ই. xx, পৃঃ ১২৩
২। ঐ xi, নং ৪, ৯
৩। ঐ
৪। ঐ, পৃঃ ৩৮-৯
৫। ই. এ. xviii, পৃঃ ১১৩, প ২৫-৪৫
৬। 'পোলিটী ইন দি অগ্নিপুরাণ' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বি. বি. মিশ্র এই গ্রন্থটির কাল নির্ধারণ করেছেন। পাটনা বিশ্বালয়ের পি-এইচ-ডি'র থীসিস (১৯৬৩)
৭। ২১১, ৩৪ ; ২১৩, ৯
৮। ২১১, ৭২ ; ২২২, ১৩-৪

কালের শিলালিপিতে এই ধরনের অনেক অনুদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আসামে ভূমি অনুদানের সঙ্গে ঘরবাড়িও[১] হস্তান্তরিত করা হত। শ্রীহট্ট জেলায় প্রাপ্ত ১১শ শতাব্দীর মধ্যভাগের একটি অনুদানপত্র এর একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এটির মতে ভগবান শিবের মন্দিরকে রাজা গোবিন্দ কেশবদেব ৩৭৫ হল ভূমির সঙ্গে সঙ্গে পৃথক পৃথক গ্রামে বিক্ষিপ্ত ২৯৬টি গৃহদান করেছিলেন।[২] ভগবান শিবের জন্য সমর্পিত এই গৃহস্থদের মধ্যে শুধু কৃষকরাই ছিল না, উপরন্তু রাখাল ও শিল্পীরাও ছিল। সেই সঙ্গে এই দেবতাকে প্রদত্ত ভূমিতে বসবাসকারী ঘণ্টকার (ঘণ্টানির্মাণকারী), রজক, নাবিক, দোকানদার ইত্যাদি বহু ব্যক্তিকেও মন্দিরের অধীন করে দেওয়া হয়েছিল।[৩]

বাংলাদেশের শিলালিপিতে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত কৃষকদের হস্তান্তর করার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না; কিন্তু পরে এই প্রদেশেও এই প্রথার প্রচলন হয়েছিল। সেন অনুদানপত্রে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদত্ত ভূমির কৃষকদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত প্রায় ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দের তাম্রপত্রে ২০ জন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত একটি গ্রামে অবস্থিত ১২টি গৃহের হস্তান্তরের উল্লেখ আছে।[৪] এই সম্পর্কে প্রযুক্ত 'গৃহটি' শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ করা হয়েছে।[৫] আমাদের বিচারে 'টি' শব্দের দ্বারা টিলা বোঝানো হয়েছে। বাংলা ও বিহারে গৃহনির্মাণের জন্য নির্বাচিত উচ্চ-স্থানকে অথবা সেই প্রয়োজনে মাটি ঢেলে উঁচু করা জমিকে টিলা বলা হয়ে থাকে। এই অনুদান দেওয়া হয়েছিল পূর্ববাংলায়। সেখানে এখনো কৈবর্ত বা অন্যান্য কৃষক জাতির ব্যক্তিগণ উঁচু জমিতে গৃহনির্মাণ করে, যাতে বাড়ি জলে ডুবে না যায়। অতএব ১২টি গৃহ হস্তান্তর করার অর্থই এই যে অনুদত্ত ভূমিতে কর্মরত কারিগর বা ক্ষেতে কাজ করা মজুরদেরও সেই ভূমির সঙ্গে সঙ্গে দানগ্রহীতাকে সমর্পণ করা হয়েছিল। নবম শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে প্রায় পরবর্তী এক শতাব্দী পর্যন্ত উড়িষ্যায় অনুদানভোগীদের তন্তুবায়, মদ চোলাইকারী, রাখাল ও অন্যান্য শ্রেণীর অধিবাসীদের হস্তান্তর করা হত। এদের সকলের জন্য 'প্রকৃতি' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।[৬] আলোচ্যকালে বুন্দেলখণ্ডের চন্দেলদের রাজ্যে এই প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। এখানকার অনুদানপত্রে গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক,

১। জা. এ. সো. বে. xvi, ভাগ ১, পৃঃ ২৯৫-৬ ; তুঃ ঐ ix (১৮৪০) ৭৬৬, শ্লোক ২৪
২। এ. ই. xiv, নং ৪৯, প ২৯-৫১
৩। ঐ
৪। ঐ xxx, নং ১০ (দামোদরদেবের মেহার তাম্রপত্র) প ১৭-৩২ এবং ৫৭ ৮
৫। ঐ xxvii, ১৮৮, পাদটীকা ৩ ; xxx, ৫৩
৬। পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য

শিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের হস্তান্তর করার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] চাহমানদের রাজ্যেও এই প্রথার চল ছিল, যদিও সেখানে ব্যবস্থা একটু ভিন্ন ছিল। নডোলের কুমার সাহণপালদেবের ১১৩৫-এর অনুদানপত্র অনুসারে নন্দান গ্রামবাসী সোহিয় এবং অসার নামক দুই ব্যক্তিকে তাদের পুত্র, পৌত্র ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান ত্রিপুরুষদেবের সেবার জন্য চিরকালের মত সমর্পণ করা হয়েছিল।[২] ১১৪৮-এ অহ্লনদেব এই দেবতাকে এই গ্রামেরই উমপোল্লাল এবং মহষসীহ নামক দু-জন কৃষক দান করেছিলেন।[৩] এই অনুদানটির সঙ্গে সম্পর্কিত গ্রামটিও দান করা হয়েছিল কিনা, সেটা অবশ্য স্পষ্ট জানা যায় না। কিন্তু যেসকল ব্যক্তিকে দেবতার সেবায় নিযুক্ত করা হয়েছিল, নিশ্চিতরূপে তাবা কৃষক (কুটুম্বিন) ছিল[৪] এবং যে উদ্দেশ্যে তাদের দেবতার নিকট সমর্পণ করা হয়েছিল, তা কৃষিকর্ম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এইজন্য রুশদেশীয় কৃষিদাসদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা হয়েছে।[৫] ১২০৭-এর একটি চৌলুক্য অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে চৌলুক্যদের সামন্ত মেহেররাজ জগমল্ল তলাঝা নামক বিশাল নগরে স্বয়ং স্থাপিত দুটি শিবলিঙ্গকে নিকটবর্তী দুটি গ্রামে, দুই খণ্ড ভূমিদান করেছিলেন এবং সেই খণ্ড জমি চাষ করার জন্য তিনজন কৃষকও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।[৬] এই ধরনের কৃষিদাসের প্রথা কেবল চম্বাতেই পাওয়া যায়। এখানে প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে হস্তান্তরিত কৃষকদের নামের উল্লেখও করা হয়েছে।[৭]

যদিও বর্তমান বিশ্লেষণে দক্ষিণ ভারতকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি, তবু মনে হয় মহারাষ্ট্রে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ১২৭৯-এর যাদব অনুদানপত্র থেকে জানা যায় একটি অগ্রহার শিল্পীদেরসমেত দান করা হয়েছিল।[৮] এই অনুদানে প্রযুক্ত 'কারুকাদি'[৯] শব্দের মধ্যে কৃষকরাও অন্তর্ভূক্ত ছিল নিঃসন্দেহে। কোঙ্কনেও অনুদানের সঙ্গে শিল্পীদেরও হস্তান্তর করা হত। ১০০৮-এ জারী করা মাণ্ডলিক-

১। 'সকারু-কর্ষক-বণিগ্বাস্তব্যম্', এ. ই. XX, নং ১৪ 'বি' প্লেট, পংক্তি ১৯। এই শিলালিপির সম্পাদক হীরালাল 'কর্ষক'কে 'কপষ্ক' পড়েছিলেন বলে 'বণিকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত এবং কুম্ভকারের মৃত্তিকাসহ' এইরূপ ভুল অনুবাদ করেছিলেন ঐ, ১৩১, পাদটীকা ১। এ. ই. XXXII, নং ১৪, অনুদান ১, প ৩১ ও দ্রঃ।
২। দশরথ শর্মাকৃত 'আর্লি চৌহান ডাইনেস্টিজ' পরিশিষ্ট 'জি' iii, প ২০-১
৩। ঐ, প ২২-৩
৪। ঐ, প ২০-২
৫। ঐ, পৃঃ ২৯৯
৬। ই. এ. xi, ৩৩৭-৪০
৭। আ. সা. রি. ১৯০২-৩, পৃঃ ২৫২-৩, প ১৬-২৫
৮। এম. জি. দীক্ষিত সম্পাদিত, সেলেক্টেড ইনস্ক্রিপসন্স ফ্রম মহারাষ্ট্র, পৃঃ ৯৯
৯। ঐ

রট্টরাজের খারেপাটন তাম্রপত্রে মত্তময়ূর গোত্রের গুরুদেরকে তিনটি গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে পরিচারিকাদের কয়েকটি পরিবার, একটি তেলী পরিবার, একটি মালী পরিবার, একটি কুম্ভকার পরিবার এবং একটি রজক পরিবারও প্রদান করা হয়েছিল।[১] স্পষ্টতঃই গুরু এবং তাঁর সম্পর্কিত ব্যক্তিদের সেবার জন্য এই সকল পরিবার তাঁদের দান করা আবশ্যক মনে হয়েছিল। যদিও এখানে হস্তান্তরিত ব্যক্তিগণ শিল্পী ছিল, তবু এটি নিতান্তই কৃষিদাসত্ব প্রথারই স্পষ্ট প্রমাণ।

উড়িষ্যায় পরবর্তীকালের অনুদানপত্রগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই প্রথা গ্রাম থেকে ক্রমশ শহরেও প্রসারিত হচ্ছিল। ১২৩০-এ জারী করা তৃতীয় অনঙ্গভীমের নগবী তাম্রপত্র থেকে জানা যায় যে জনৈক ব্রাহ্মণকে শহরবাসীসমেত (পুরজনসমেত) একটি শহর দান করা হয়েছিল।[২] এই শহরে রাজপ্রাসাদতুল্য চারটি অট্টালিকা ছিল, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে এই শহরে আরো ৩০টি এমন গৃহ ছিল যেগুলিতে দোকানদার গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, করাতী, স্বর্ণকার, কাংস্যকার ইত্যাদিরা বাস করত এবং অনুদানপত্রে তাদের সকলের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল।[৩] পানবিক্রেতা, মালাকর, শর্করাবিক্রেতা, গোয়ালা, তন্তুবায়, তেলী, কুম্ভকার এবং কৈবর্তদেরকেও এই অনুদানে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল এবং অনুদানপত্রে তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল।[৪] আবার একজন নাপিত, কিছু অন্যান্য শিল্পী এবং রজককেও হস্তান্তরিত করা হয়েছিল।[৫] এইভাবে গতিহীন গ্রাম্য অর্থব্যবস্থার শহরে অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে শহরবাসী ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের শহরের গতিহীন অর্থব্যবস্থার সঙ্গে আবদ্ধ থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না—তা শহরের মালিক যাই হোক না কেন—তাদের অবস্থায় কোন পরিবর্তন হত না। শহরে বাস করেও তারা নিজেদের বসবাসের স্থান অথবা নিজেদের পেশা বদল করতে পারত না এবং তাদের অনুদত্ত গ্রামের কৃষকদের অনুরূপ জীবিকানির্বাহ করতে হত।

মধ্যযুগীয় অর্থব্যবস্থায় শিল্পীদের গতিশীলতার কোন সুযোগ ছিল না এবং কৃষকদের অবস্থা আরো শোচনীয় ছিল। কৃষক ও শিল্পীদের সুস্পষ্ট করে অনুদানভোগীর অধীন করে না দেওয়া হলেও সকল গ্রামবাসীর উপর অনুদানভোগীর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কিছু কম হত না। গ্রামবাসীদের প্রতি দাতার স্পষ্ট নির্দেশ থাকত যে তারা দানগ্রহীতার

১। এ. ই. iii, নং ৪০, প ৫৮-৯
২। ঐ xviii, নং ৪০, প ১২৭-২৯
৩। ঐ, প ১২৭-৩১
৪। ঐ, প ১৩২-৩৪
৫। এ. ই. xxviii, নং ৪০, প ১৩৪

সর্বপ্রকার আদেশপালন করবে এবং তাকে সকল-প্রকার কর দেবে অর্থাৎ দানগ্রহীতার হাতেই সকল গ্রামবাসীকে সমর্পণ করে দেওয়া হত। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে কয়েকটি অনুদানপত্রে কৃষক ও শিল্পীদের দানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করার সুস্পষ্ট উল্লেখের প্রয়োজন কি ছিল? আসাম, উড়িষ্যা এবং চম্বা অনুন্নত অঞ্চল হওয়ায়, সেখানে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, কারণ বাইরে থেকে অনুন্নত এলাকায় লোক আসার সম্ভাবনা ছিল কম এবং শ্রমশক্তির অভাবও ছিল যথেষ্ট। বুন্দেলখণ্ডের অনুন্নত এলাকাতেও এই নীতি অনুসরণের আবশ্যকতা ছিল। এই প্রথায় শিল্পী, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সেবা সুলভ করে দেওয়া যেত, কারণ শ্রমশক্তির অভাব ছিল, অথচ অবাদযোগ্য জমির প্রাচুর্যও ছিল। কিন্তু এই সকলের পরিণামে কৃষিদাসপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে উপসামন্তীকরণ ও সেবানুদানপ্রথা যেসকল গ্রামে প্রযুক্ত হয়েছিল, সেখানে গ্রাম্য কৃষকদের অবস্থার ক্রমাবনতি হচ্ছিল। যেসকল অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে রাজার অধীনে ছিল সেগুলির অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল তা নয়। গাহরওয়াল অনুদানপত্রে[১] করের যে সূচী দেওয়া হয়েছে তার থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাদের শাসনকালে কৃষকদের যে পরিমাণ কর দিতে হত, পূর্বে কখনও তা দিতে হত না। গাহরওয়াল শিলালিপিতে কৃষকদের উপর প্রয়োজ্য ১১ প্রকার করের উল্লেখ আছে। সকল-প্রকার কর আদায় দেবার পর কৃষকদের নিজেদের ভরণ-পোষণের জন্য কি পরিমাণ ফসল অবশিষ্ট থাকত তা বোঝা কঠিন। ত্রিপুরীর কলচুরিদের ১১৬৩ সালের একটি শিলালিপিতে ১১ প্রকার করের উল্লেখ আছে। তা ছাড়া পরম্পরাগত করও ছিল যার উল্লেখ এখানে করা হয় নি।[২] ১১৮০-৮১ সালের অন্য একটি কলচুরি অনুদানপত্রেও এই ১১টি করেরই উল্লেখ আছে।[৩] এগুলির মধ্যে 'ভাগ' ও 'ভোগ' ত নিশ্চিতরূপেই ছিল, কারণ এই শিলালিপিটিতে 'প্রধান' শব্দের পূর্ববর্তী ছটি শব্দপদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।[৪] এইভাবে করের সংখ্যা ১৩ পর্যন্ত গিয়ে পৌছয়। যদিও কলচুরি অনুদানপত্রে স্পষ্ট

১। রমা নিয়োগীকৃত 'হিস্ট্রী অফ দি গাহরওয়ালস্' (পৃঃ ১৬৭-৯০) গ্রন্থে এই সকল করের সূচী দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার করের জন্য প্রযুক্ত কিছু-কিছু শব্দের অর্থ স্পষ্ট হয় নি।

২। ক. ই. ই. iv, নং ৬৩, প ২৯-৩০। কিছু শব্দ অস্পষ্ট এবং করের সূচীও বেশ দীর্ঘ— "ভাগকর প্রবণিবাড়চন্নীর সবত্তীশমত বিশোনিমাদায় পট্টকিলাদায় দুসসাধ্যায় (বৈ) যয়িকাদায়াদিকৃত করিষ্যমানাদায়ৈঃ সহ।"

৩। ঐ, পরিশিষ্ট নং৪

৪। ঐ, ৬৪৯, পাদটীকা ১৪

ভাষায় সাধারণতঃ কেবল তিন বা চার প্রকার (ভাগভোগহিরণ্যাদিরাজপ্রত্যাস্তঃ)[১] করের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সমাপ্তিতে 'রাজপ্রত্যাস্তঃ সংযুক্ত থাকায় মনে হয় যে অন্য আরো কর আদায় করা হত, যার স্পষ্ট উল্লেখ করা হয় নি। আমরা বড় জোর এই পর্যন্তই অনুমান করতে পারি যে সকল ব্যক্তিকেই সকল-প্রকার কর দিতে হত না, কারণ শিল্পী, ব্যবসায়ী ও কৃষকগণ পৃথক পৃথক ধরনের কর দিত। কিন্তু কৃষকদের নিকট থেকেই উপরোক্ত করগুলির অধিকাংশ আদায় করা হত বলে মনে হয়। অনুদানভোগী নিজ দখলাধীন গ্রামে স্বয়ং কর আরোপ করতে পারত কিনা তা ঠিক জানা যায় না, যদিও পরবর্তীকালে কখনও কখনও অনুদাভোগীকে কর আরোপের (করিষ্যমাণ) অধিকারও দেওয়া হত। এমনিতেই কৃষকগণ সর্বদা করবৃদ্ধির আশঙ্কায় আতঙ্কিত থাকত, কারণ দানগ্রহীতা পুরাতন করের হারে সন্তুষ্ট থাকত না।

এইযুগে পূর্ব ভারতে আরো একটি কারণে কৃষকদেব অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। সেটি এই যে পৃথক পৃথক জমি থেকে রাজ্যকে কি পরিমাণ ফসল দেওয়া হবে তা নির্ধাবিত করে দেওয়া হতে লাগল। পূর্ববর্তী করপদ্ধতি ছিল ভাগচাষীরূপে, যাতে কৃষক উৎপন্ন ফসলের অংশবিশেষ সরকারকে দিত। সামন্তবাদের বিকাশের ফলে শুধু যে সরকারই প্রজার কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের দাবিদার ছিলেন তাই নয়, প্রজাও আবার উপ-প্রজার নিকট থেকে উৎপন্ন ফসলের অংশ দাবি করত, এইভাবে ভাগীদারের এক পরম্পরার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যখন জমির পরিমাপ ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হতে থাকল, তখন কৃষকদের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হতে লাগল। কারণ জমি পরিমাপের এতে তাতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্ধারণের সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা হিসাবে ধরাই হত না অথচ প্রকৃতির বিরূপতা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, বিশেষ করে সেযুগে। ফলে নতুন করপদ্ধতিতে কৃষক অপেক্ষা রাজাই বেশি লাভবান হতেন কারণ ফসল উৎপন্ন না হলেও রাজা বা সামন্ত নিজেদের ভাগ দাবি করতে পারতেন। দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাজা সম্ভবতঃ কর মকুব করে দিতেন, কিন্তু অনুদানভোগীরা এতটা উদারতা দেখাতেন কিনা সন্দেহ।

কলচুরি, চন্দেল এবং চাহমান রাজ্যে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর খরচের বোঝা কৃষকদের বহন করতে হত বলে, সেই সকল রাজ্যে তাদের অবস্থা নিশ্চিতরূপে খুবই শোচনীয় ছিল। কলচুরিদের অধীনস্থ চারজন পদাধিকারী যেমন বিষেণিম্ (এই পদাধিকারীর কার্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না) পট্টকিল,

১। ঐ iv, নং ৫০, প ৪৩-৪

দুঃসাধ্য এবং বৈষয়িক নিজেদের ব্যয়নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শুল্ক (আদায়) আদায় করার অধিকার পেত।[১] চন্দেল দলিলে এই ধরনের পদাধিকারীর সংখ্যা আরো অধিক ছিল বলে মনে হয়। এই দলিলে বনাধিকারী (আটবিক) অনিয়মিত সৈনিক (চাট)[২] এবং সাধারণভাবে সকল রাজকর্মচারীই নিজ নিজ পাওনা আদায় (স্বং-স্বাম-আভাব্যম্)[৩] করার অধিকার পেত। কিন্তু চাহমানগণ এই অধিকার কেবল প্রতীহার এবং বলাধিপদেরই প্রদান করেছিলেন। 'আদায়' এবং 'আভাব্য' নামে পরিচিত করগুলি রাজপদাধিকারীদের বেতনের অতিরিক্ত ভাতাস্বরূপ ছিল কিনা সেটা ঠিক স্পষ্ট নয়। পূর্ববর্তীকালে এইরূপ কর কেবল রাজপরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যই আদায় করা হত, যার প্রমাণ হর্ষ এবং প্রারম্ভিক পালরাজাদের অনুদানপত্র থেকে পাওয়া যায়। আলোচ্যকালেও এই কর 'রাজকুলাভাব্য' নামে পরিচিত ছিল।[৪] প্রথমে সম্ভবতঃ রাজপরিবার নিযুক্ত কর্মচারীই এইরূপ কর আদায় করত। কিন্তু পরে যে এইরূপ করের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছিল তাই নয়, উপরন্তু সেগুলি আদায় করবার অধিকার সম্ভবতঃ সেই সকল কর্মচারীকে দেওয়া হয়েছিল যাদের ভরণ-পোষণের জন্যই কর আরোপ করা হয়েছিল। এই পদ্ধতি ভারতীয় সামন্তবাদের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল এবং তার ফলে এই করের আওতাভুক্ত কৃষকগণ যে শোষিত হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এইযুগে শিল্প ও ব্যবসায়ের সামন্তীকরণ রাজস্থান, মালব এবং গুজরাটে ক্রমশ বাড়তে থাকে, ঐ দুটি থেকে রাজ্যের যে আয় হত, সেটা মন্দিরকে সমর্পণ করা হতে থাকে। চাহমান শিলালিপি থেকে এর অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। অহ্লনদেবের ১১৬১ সালের দলিলে জৈনমন্দিরকে নড্ডুল শহরের কোনো স্থানে অবস্থিত একটি চুঙ্গিঘরের আয় থেকে প্রতি মাসে ৫ দ্রম্ম অনুদান দেওয়া হয়েছিল।[৫] নড্ডুলের চুঙ্গিঘরের আয়ের অংশবিশেষ অনুদান দেওয়ার অন্য উদাহরণও পাওয়া যায়। ১১১৪ সালের একটি অনুদানপত্রে ভগবান ত্রিপুরুষকে চুঙ্গিঘরের আয় থেকে ৬ দ্রম্ম (মাসিক অথবা বার্ষিক তার উল্লেখ নেই) অনুদান দেওয়া হয়েছিল।[৬] আরো

১। ক. ই. ই. iv, নং ৬৩, প ২৯-৩০
২। এ. ই. xxxii, নং ১৪, অনুদান ১, প ৩৩
৩। এ. ই. xxxii, নং ১৪, অনুদান ২, প ১৬
৪। ই. রে. iii, ১৫৬-৭, প ৩১-২
৫। এ. ই. ix, পৃঃ ৬৩ এবং ঐ পৃষ্ঠার পাদটীকা ৮
৬। দশরথ শর্মা—পরিশিষ্ট iii, প ১৮-৯। কিছু শব্দ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে স্পষ্ট অর্থ করা কঠিন। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে রাজা ধর্মীয় প্রয়োজনে চুঙ্গিঘরের আয়ের কিছু অংশ অনুদান দিয়েছিলেন।

জানতে পারা যায় যে রানী শঙ্করীদেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌরী প্রতিমার দৈনিক ভোগরাগের ব্যয়নির্বাহের জন্য অহ্লন চুঙ্গিঘরের আয় থেকে মাসিক ৪ দ্রম্ম অনুদান দিয়েছিলেন।[১] ১১৫৬ সালের একটি তাম্রপত্র থেকে জানা যায় যে কুমারপালের একজন সামন্ত কয়েকটি জৈনমন্দিরকে মণ্ডপিকার (চুঙ্গিঘর) আয় থেকে দিনপ্রতি এক রূপক হিসাবে অনুদান দিয়েছিলেন।[২] ৯৭৩ সালের একটি দলিল থেকে জানা যায় যে সাকম্ভরীর কোন একজন উচ্চ-পদাধিকারী প্রতি কটুক লবণে ১ বিশোপক হিসাবে অনুদান দিয়েছিলেন। এবং অন্য একজন পদাধিকারী ঐ একই দেবতাকে প্রতি ঘোড়া বিক্রয়ের উপর এক দ্রম্ম হিসাবে অনুদান দিয়েছিলেন।[৩] এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে বিভিন্ন বস্তু বিক্রয় থেকে সরকারের যে শুল্ক আয় হত তার থেকে অংশবিশেষ ধর্মীয় প্রয়োজনে, জৈন, ব্রাহ্মণ বা মন্দিরকে অনুদান হিসাবে দেওয়া হত। তা ছাড়া চাহমানদের রাজ্যে কলকারখানা থেকে আদায়ীকৃত সরকারী শুল্কের আয়ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদান দেওয়া হত। ১১৬২ সালের একটি দলিল থেকে জানা যায় যে দু-জন রাজকুমার এবং তাদের মা, প্রত্যেক ঘাণক (ঘানি) থেকে রাজপরিবারের যে আয় হত, তার থেকে নাডুলভাগিকা (নাদলাই) বা তার বাইরে বসবাসকারী সাধুদের প্রত্যেককে দুই পল্লিকা করে অনুদান দিয়েছিলেন।[৪] এইরূপ শুল্কাদি থেকে রাজ্যের যে নগদ আয় হত, তার অংশবিশেষ যদি ব্রাহ্মণদেরও অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। এই ধরনের দলিলের সন্ধান কতিপয় ছোট ছোট রাজ্যে পাওয়া যায়। ভূতপূর্ব ভরতপুর রাজ্যে স্থিত বয়ানা নামক স্থানে প্রাপ্ত ৯৫৫ সালের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে একজন দেবতার জন্য একটি মণ্ডপিকা থেকে তিন দ্রম্ম আদায় করা হয়েছিল।[৫] বৈদ্যনাথের প্রশস্তি অনুসারে একজন স্থানীয় সর্দার নিজ মণ্ডপিকার আয় থেকে দিনপ্রতি দুই দ্রম্ম অনুদান দিয়েছিলেন।[৬]

পরমারদের রাজ্যেও শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত সামন্তীকরণ হচ্ছিল। নাসিক জেলায় পরমারদের একজন সামন্ত যশোবর্মণ ১১শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জৈনমন্দিরকে কয়েকটি ভূখণ্ড, দুটি ঘাণক ১৪টি দোকান এবং নগদ ১৪ দ্রম্ম অনুদান দিয়েছিলেন[৭] চামুণ্ডরাজের ১০৮০ সালের একটি শিলালিপিতে আরো বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

১। ঐ iv, প্লেট ২, প ১৫-৭
২। ই. এ. xli, পৃঃ ২০৩
৩। এ. ই. ii, নং ৮, শ্লোক ৪৮-৯
৪। ঐ, xi, ন° ৪, প ১-৯
৫। ঐ xxii, পৃঃ ১২০
৬। ঐ i, পৃঃ ৯৭
৭। ঐ xix, নং ১০, প ১৭-৩১

এই শিলালিপিটি রাজস্থানের বাঁসওয়ারা শহর থেকে ২৮ মাইল দূরবর্তী অর্থুনা নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছিল। এই অর্থুনাকে পরমারদের দুটি রাজধানীর মধ্যে একটি বলে বর্ণিত করা হয়েছে। এই শিলালিপিতে নগদ এবং বস্তু অনুদানের সূচনা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া পেশাগত এবং দ্রব্যগত সূচনাও দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় বাজারের প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে চৈত্রোৎসব উপলক্ষে এক দ্রম্ম দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাংস্যকারদের দোকানপ্রতি মাসিক এক দ্রম্ম এবং শুঁড়িদের চার দ্রম্ম দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১] বস্তু অনুদানের দিক থেকে দেখা যায় যে প্রত্যেক ভরক উত্তম শর্করা বা গুড়ের জন্য এক বর্ণিকা, প্রত্যেক ভরক বঙ্গদেশীয় লাল রঙ, কার্পাস ও সূতার জন্য এক রূপক, এক কোটক বস্ত্রের জন্য দেড় রূপক এবং এক মূটক লবণের জন্য এক মানক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।[২] বাজারে পৃথক পৃথক দ্রব্যবিক্রয়কারীর নিকট থেকে নগদে আদায় করা এই শুল্ক ছাড়া, তাদের কাছ থেকে তোলাও আদায় করা হত। এক ভরক নারিকেলে একটি নারিকেল, হাজার প্রতি একটি সুপারি, এক ঘড়া মাখন বা তিল তেল প্রতি ১/ পলা মাখন বা তেল এবং এক বোঝা ফুল প্রতি এক গোছা ফুল শুল্করূপে আদায় করা হত।[৩] তেলজাত বস্তু, শস্য (বিশেষ করে যব) লেবু এবং পশুখাদ্যের উপর থেকে আরোপিত নগদ ও তোলারূপে আদায়ীকৃত শুল্কাদিও ভগবান মণ্ডলেশকে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল।[৪] এইভাবে আমরা দেখি যে শিল্পব্যবসায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (ধ্বংসাবশেষ থেকে যার সমর্থন পাওয়া যায়) অর্থুনাতে শুল্কাদির একটি বড় অংশ স্থানীয় মন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য অনুদানরূপে দেওয়া হয়েছিল।

চৌলুক্যদের অধীনে এই ধরনের বহুল উদাহরণ আশা করা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ গুজরাটের সমুদ্রতটবর্তী অঞ্চলে শিল্পব্যবসায়ের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা ছিল। শুল্ক-মণ্ডপিকা শব্দের উল্লেখ বহু চৌলুক্য শিলালিপিতে পাওয়া যায়[৫] এবং মনে হয় অনুদান হিসাবে রাজ্যের আয়ের অংশবিশেষ দান করার প্রথা সেখানে প্রচলিত ছিল। ১১৫৬ সালের একটি অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে কুমারপাল একটি মন্দিরকে নডোলের মণ্ডপিকার আয়ের একটি অংশ প্রতিদিন এক দ্রম্ম হিসাবে অনুদান দিয়েছিলেন।[৬] একটি অন্য শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে দ্বিতীয়

১। এ. ই. XIV, নং ২১, শ্লোক ৭৩-৪

২। ঐ, শ্লোক ৬৯-৭২

৩। ঐ, শ্লোক ৭১-২। পাদটীকাসমেত বার্নেটের অনুবাদ, এ. ই. xiv, পৃঃ ৩০৯-১০ অনুসারে।

৪। ঐ, শ্লোক ৭৬-৮১

৫। ই. এ. vi, ২০২, প ৯

৬। এ. বি. ও. আর. আই. xxiii, ৩১৬-৮

ভীমদেব ১২৩০ সালে কয়েকটি বস্তুর বিক্রয়ের উপর আরোপিত কর থেকে যে আয় হত, তা দুটি মন্দিরের ভোগরাগ এবং ব্রাহ্মণভোজনের ব্যয়নির্বাহের জন্য মন্দিরকে হস্তান্তরিত করেছিলেন।[১] সলখনপুরীর কয়েকজন ব্যবসায়ী কোনো-কোনো বস্তু বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত নগদ আয় অনুদানরূপে মন্দিরকে সমর্পণ করেছিল এবং স্পষ্টতঃই তারা রাজাদেশে এইরূপ করেছিল।[২]

ব্যবসায় থেকে রাজার যে আয় হত ধর্মীয় প্রয়োজনে তা অনুদান দেওয়ার প্রথার প্রভাব বিদেশী বাণিজ্যের উপরও পড়েছিল। কোঙ্কনে তার একটি উদাহবণ পাওয়া যায় সেখানে বহিরাগত বাণিজ্য-জাহাজ থেকে স্বর্ণমুদ্রায় আদায়ীকৃত শুল্ক এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের অনুদান দেওয়া হয়েছিল।[৩] ধর্মনিরপেক্ষ গৃহস্থদেরও এইরূপ অনুদান দেওয়া হয়ে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

পশ্চিম ভারতে প্রাপ্ত এই সকল উদাহরণগুলি শিল্প ও বাণিজ্যের সামন্তীকরণের সাক্ষ্য প্রদান করে। বিক্রয়কব ও চুঙ্গি থেকে যে নগদ আয় হত তা মন্দিরকে অনুদান দেওয়ার প্রথা মধ্যযুগীয় ইউরোপে নগদ জায়গীরদানের সঙ্গে তুলনীয়। ভারতে গৃহস্থ দানগ্রহীতাদেব এমন জায়গীব দেওয়া হত কিনা তা আমাদের জানা নেই। অবশ্য কলচুরি, চন্দেল ও চাহমান বাজ্যে সরকারী আমলাদের জন্য নির্ধারিত কিছু কর নগদে আদায় করা হত—আমরা তাকে জায়গীররূপে গণ্য করতে পারি। কিন্তু এইরূপ মন্তব্যের কোনো নিশ্চিত ভিত্তি নেই। সেজন্য ইউরোপের সঙ্গে তুলনার ব্যাপারে খুব জোর দেওয়া যায় না।

১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতির বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে এইযুগে সামন্তীয় অর্থব্যবস্থা এই অঞ্চলে চরম সীমায় পৌছেছিল। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ গৃহস্থ অনুদানভোগীরা এত বেশি জমি আর কখনও পায় নি এবং সেই সঙ্গে ভূমি অনুদানের ফলে সাবজনীন ও ভূমি-বিষয়ক অধিকারগুলির এত অবনতিও আর কখনও হয় নি। তা ছাড়া পূর্বে আর কখনও কৃষকদের উপর এত করের বোঝাও চাপানো হয় নি বা তারা উপসামন্তীকরণের দ্বারা এতটা প্রভাবিতও হয় নি। আবার এই যুগেই সরকারী সেবার পুরস্কার ও প্রতিদানস্বরূপ অনুদান প্রদানের এত বাহুল্যও পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। তা ছাড়া শিল্পব্যবসায় থেকে প্রাপ্ত শুল্কাদি অনুদানরূপে প্রদান করার উদাহরণও এই যুগেই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই যুগেই সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থায়

১। পি. নিয়োগী—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২০১
২। ই. এ. vi, ২০২, প ৮-১৬
৩। এ. ই. iii, নং ৪০, প ৫৬-৭

ফাটল দেখা দিয়েছিল, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে। পরে আমরা এই বিষয়ে আরো আলোচনা করব। যাকে ইতিহাসে হিন্দুযুগ বলা হয়। সেই যুগের শেষ দিনগুলিতে উত্তর-ভারতে কয়েকটি নতুন আর্থিক শক্তির বিকাশ ঘটেছিল এবং তার ফলস্বরূপ আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থা, মুদ্রার অভাব এবং কৃষকদের শোষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরাতন সামন্তবাদের ভিত্তি নড়ে উঠেছিল।

এই যুগের শেষ হওয়ার প্রাক্কালে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মালব ও গুজরাটে পতিত জমি আবাদ করানোর দিক থেকে ভূমি অনুদানের গুরুত্ব প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের অনুদানপত্রে অনুদত্ত ভূমির উৎপন্ন ফসলের পরিমাণকে নগদ মুদ্রায় পরিবর্তিত করে প্রকাশ করা হতে লাগল, এবং জমির সীমাও স্পষ্ট ভাষায় নির্ধারিত করে দেওয়া হতে থাকল।[১] ফলে দানগ্রহীতাব পক্ষে নিজ জমির সীমানা বাড়িয়ে পতিত জমি আবাদ করাব সুযোগ কমে গেল। মালব ও গুজরাটেও অনুদত্ত গ্রামের সীমানা স্পষ্ট করে নির্ধাবিত করে দেওয়া হতে লাগল। অর্থাৎ দাতা এখন থেকে এ বিষয়ে সচেতন হলেন, যেন দানগ্রহীতাকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা লঙ্ঘন করে যেন অনুচিতভাবে নিজের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে নিতে না পারে। ফলে দানগ্রহীতার পক্ষে নতুন জমি গ্রাস কবা বা আবাদ করা সম্ভব ছিল না।

বেগার প্রথা ও 'বিষ্টি'র সম্বন্ধেও আমরা এই অবস্থাই লক্ষ্য করি। এগুলিও সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থারই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং বলভীর মৈত্রক, রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর-প্রতীহারদের অধীনস্থ পশ্চিম ভারতে এগুলিকে উৎপাদনের মাধ্যম বলে গ্রহণ করা হত।[২] কিন্তু পরমাব, চৌলুক্য ও চাহমানদের শিলালিপিতে এ দুটির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্পষ্টতঃই ঐ রাজ্যগুলিতে এই প্রথার সমাপ্তি ঘটেছিল। অনুরূপভাবে গাহরওয়াল ও চন্দেল শিলালিপিতে 'বিষ্টি'র কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু পাল ও সেন অনুদানপত্রে 'সর্বপীড়া' ও কলচুরি শিলালিপিতে 'বিষ্টি'র উল্লেখ আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে বেগার প্রথার অবনতি ঘটছিল এ কথা বলা চলে। এটিকে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আর্থিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়ার একটি লক্ষণ বলে মনে করা যেতে পারে। সম্ভবতঃ বেগারের পরিবর্তে এখন নগদ কর আদায় করা হত। এই অনুমানের সমর্থনে কিন্তু বিশেষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় তাও কাশ্মীরে যাকে আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভূত করি নি। কিন্তু এখানে কাশ্মীরী প্রমাণের উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় না। 'রাজতরঙ্গিনী'তে বলা হয়েছে বেগার

১। ই. বে. iii, নং ৭, প ৩৭-৫৪ ; নং ১১, প ৩৯-৫৯
২। শিলালিপিতে 'উৎপাদ্যমানবিষ্টি' শব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়।

হিসাবে শ্রমিক ভার বহন (রুঢ়-ভারোধি) করত। ভার বহন ছিল তেরটি বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু গ্রন্থে সেগুলির বর্ণনা দেওয়া হয় নি। একটা উল্লেখ পাওয়া যায় যে কিছুসংখ্যক গ্রামবাসী এক বছর পর্যন্ত কোনো ভার বহন করে নি বলে তাদের সকলকে ভারের তুল্য-মূল্য জরিমানা দিতে হয়েছিল এবং আশেপাশে প্রচলিত দর অপেক্ষা বেশি দরে মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল।[১] যতদূব সম্ভব এই জরিমানা নগদ মূল্যেই আদায় কবা হয়েছিল এবং এই অনুমান সত্য হলে এ কথাও সত্য যে নগদ মুদ্রা দিয়ে বেগার থেকে রেহাই পাওয়া যেত। কখনও কখনও রেহাই পাবার জন্য নগদ মুদ্রা ও বস্তু দুই দিতে হত। হর্ষের আমলে (১০৮৯-১১০১) মন্দিব লুণ্ঠিত হলে মন্দিরের পুরোহিতগণ নগদ ও বস্তু প্রদান করে বেগাবেব হাত থেকে বেহাই প্রার্থনা করেছিলেন।[২] কিন্তু কৃষকদের সম্পর্কে এইরূপ উদাহরণ কাশ্মীর বা উত্তর ভারতের অন্য কোনো অংশেই পাওয়া যায় না। তবুও এইযুগে মুদ্রার বহুল ব্যবহার থেকে অনুমান কবা যেতে পারে যে কৃষকগণও মুদ্রাদানের পরিবর্তে বেগার থেকে রেহাই পেয়ে থাকতে পারে। তা ছাড়া কৃষকবিদ্রোহ, যেমন পূর্ববঙ্গের কৈবর্ত-বিদ্রোহ ইত্যাদির ফলেও বাজারা বেগারপ্রথাব কঠোরতা কিছু হ্রাস করতে বাধ্য হয়ে থাকবে। পশ্চিম ভারতে 'বিষ্টি'র অন্তর্ধানই নগরের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ বলে মনে হয়, কারণ কৃষকগণ গ্রাম থেকে শহরে পলায়ন করে শ্রমিক বা শিল্পীর জীবিকা গ্রহণ করতে পারত।

গ্রামাঞ্চলে আত্মনিভর অর্থব্যবস্থার অবনতির আরও কিছু কারণ ঘটেছিল।[৮] তার মধ্যে একটি এই যে দীর্ঘকাল ধরে এক বিশেষ আর্থিক অঞ্চলে সংযুক্ত গ্রামকে ভিন্ন করে অন্য অঞ্চলে সংযুক্ত করে দেওয়া হত। মন্দিরকে দান করা বহু এমন গ্রাম বহুক্ষেত্রে মন্দিরের সংলগ্ন না থাকায়, মন্দিরের সঙ্গে এই অনুদত্ত গ্রামগুলির একটি নূতন আর্থিকসম্বন্ধ স্থাপন করতে হত এবং গ্রামগুলি যে পারিপার্শ্বিকের অর্থব্যবস্থার সঙ্গে দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিল তার থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হত। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় সোমনাথ মন্দিরের অধীনে ২০০০ গ্রাম ছিল এবং গ্রামগুলি ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত কারণ স্বভাবতঃই বিভিন্ন রাজাদের দান দেওয়া গ্রামগুলি নানান স্থানে ছড়ানো ছিল। উত্তরপ্রদেশে জাগুশর্মার প্রভাবশালী পুরোহিত পরিবারকে অনুদত্ত বিভিন্ন গ্রাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য। এই পরিবারের ভূসম্পত্তি গাহরওয়ালরাজ্যে ১৮টি পত্তলায় ছড়িয়ে ছিল। তার ফলে সেগুলিকে একটা আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থার এককে সংহত করা কঠিন ছিল। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে

১। অনুবাদ, এম. এ. স্টীন, খণ্ড ১, শ্লোক ১৩২-৪ ; ১৭২-৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য
২। রাজতরঙ্গিনী—এম. এ. স্টীন অনূদিত, খণ্ড ১, ১০৮১-৮৮

বিচ্ছিন্ন জমিতে দানগ্রহীতা নিজ ইচ্ছামত ফসল উৎপন্ন করতে পারত। জমি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চলের আত্মনির্ভর অর্থব্যবস্থার প্রতি দৃকপাত না করে দানগ্রহীতা নিজ প্রয়োজনানুসারে জমিতে চাষ-আবাদ করতে পারত।

এইকালে স্থায়ী গ্রামীণ অর্থব্যবস্থার অবনতির আরও বহু কারণ ছিল। রাজা ও অনুদানভোগী প্রত্যক্ষভাবে শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের সেবা গ্রহণ করতেন না। পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে নগদ বা বস্তু আদায় করতেন। পশ্চিম ভারতেই সম্ভবতঃ এই প্রথার প্রথম প্রচলন হয়। এখানে ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। বস্তুর দ্বারা রাজ্যের প্রদেয় দিতে হত। কালক্রমে তাদের কাছ থেকে নগদ আদায় করা হতে লাগল। বিশেষ করে তারা যখন নগদে মাল বিক্রি করত তখন তাদের কাছ থেকে নগদ শুল্কই আদায় করা হত। এখন আর ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের মন্দিরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করা হত না। পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে নগদ কর আদায় করা হত। মন্দিরের ব্যবস্থাপক সেই নগদ মুদ্রায় মন্দিরের প্রয়োজন মেটাতে পারতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মালব, রাজস্থান ও গুজরাটে ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত করে মন্দিরকে একটি আত্মনির্ভর এককে পরিণত করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হত না।

এই ব্যবস্থা প্রধানতঃ শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু শহরের সংখ্যাও কিছু কম ছিল না। বিভিন্ন উৎসের উপর ভিত্তি করে দশরথ শর্মা চাহমানরাজ্যের ১৩১টি স্থানের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন।[১] তার মধ্যে অধিকাংশই শহরের নাম। ডি. সি. গাঙ্গুলী পরমাররাজ্যে প্রধানতঃ মালবে স্থিত ২০টি শহরের নামের উল্লেখ করেছেন।[২] তার সঙ্গে পরমারদের দ্বিতীয় রাজধানী অর্থুনার নামও আমরা সংযুক্ত করতে পারি। পুষ্প নিয়োগী গুজরাটে চৌলুক্যদের রাজ্যে অবস্থিত ৮টি শহরের নামের তালিকা দিয়েছেন।[৩] তার মধ্যে বন্দরে অবস্থিত তটবর্তী শহরগুলির নাম অন্তর্ভূক্ত হয় নি, গুজরাটে সমগ্র সমুদ্রতট সেগুলির দ্বারা পূর্ণ ছিল। আরবদের লিখিত বিবরণী থেকে সিন্ধু ও পশ্চিম ভারতের বহু শহরের উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] অল বেরুনীর ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং সুলতান মাহমুদের ভারত বিজয় বৃত্তান্ত, এই দুটির উপর ভিত্তি করে পুষ্প নিয়োগী উত্তর ভারতের ২৫টি শহরের তালিকা প্রস্তুত করেছেন।[৫] এই তালিকাটিকেও পর্যাপ্ত বলা যায় না। এই ২৫টি নগরের

১। ঐ, পরিশিষ্ট ৫০
২। 'হিস্ট্রী অফ দি পরমার ডাইনেস্টি, পৃঃ ২৩৯
৩। পুষ্প নিয়োগা, পৃঃ ২০০-১
৪। ঐ, পৃঃ ২১৯-২১
৫। পৃঃ ১২১

অতিরিক্ত আরো অনেক নগর ঐ অঞ্চলে ছিল। কিন্তু পূর্ব ভারতে নগরের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, যদিও পালদের ৯টি বিজয় স্কন্ধাবার যতদুর মনে হয় নগরই ছিল। এর সঙ্গে উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের রাজধানীগুলিকেও সংযুক্ত করা যেতে পারে।[১] সব মিলিয়ে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তার থেকে এই মনে হয় যে পশ্চিম ভারতে যথেষ্ট সংখ্যক নগর ছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি ত বৃহৎ নগরীই ছিল।

পশ্চিম ভারতে এই বৃহৎ সংখাক নগর দেখে অনুমান করা যায় যে গ্রামীণ অঞ্চলে উৎপন্ন বা প্রস্তুত ফসল বা বস্তু নিশ্চয়ই গ্রামবাসীদের প্রয়োজন মিটিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকত, তা না হলে শহরের অধিবাসীদের প্রয়োজন মিটত কি করে? কিছু শহর ছিল ঘনবসতি পূর্ণ। অনহিল পাটকে ত ৪৮টি বাজার ছিল।[২] শহরের নিজস্ব প্রয়োজনেই শহরের সঙ্গে গ্রামের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে থাকবে, যা গ্রামের স্থায়ী অর্থব্যবস্থাকে সম্ভবতঃ নাড়া দিয়েছিল।

ঘোড়া, তেল ও লবণের ব্যবসা রাজস্থানে পূর্বেও হত, কিন্তু এখন আরো বৃদ্ধি পেল। চাহমান শিলালিপি থেকে এ কথা স্পষ্ট জানা যায় যে অশ্ববিক্রেতা, মহাজন, শেঠ এবং কলুদের ব্যবসা খুব ভালো চলত।[৩] বিশেষ করে ঘোড়া এবং সাম্ভর হ্রদে প্রাপ্ত লবণ থেকে রাজ্যের যথেষ্ট চুঙ্গিকর আদায় হত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে ১১শ শতাব্দী থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজনের বস্তুও অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় সাধারণ লোকের খুব অসুবিধা হয়েছিল। চাহমান শিলালিপি থেকে জানা যায় যে রাজস্থানে গম, মুগ, ধুনা, তেল, পান, মসলা, ডাল ইত্যাদির বেশ ভাল ব্যবসা হত।[৪] অনুরূপভাবে ব্রঞ্জ, বস্ত্র, ইত্যাদির ব্যবসায়ী এবং মদ চোলাইকারী ও তন্তুবায়দেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫] প্রকৃতপক্ষে চাহমান শিলালিপিতে মারওয়াড়ের সেই সকল ব্যবসায়ীদের বৃত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে যারা মারওয়াড়ি নামে খ্যাত হয়েছে।

পরমার দলিল থেকে এখনও নিদর্শন পাওয়া যায় যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজস্থানের অর্থুনা নগরেও বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল ছিল। এখানে খাদ্যশস্য, (বিশেষ করে যব) সুতা, কার্পাস, লবণ, শর্করা[৬], তেল ইত্যাদি দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিসের ব্যবসায় হত। সম্ভবতঃ

১। ঐ পৃঃ ১১৮-৯ (লখনৌতী, নদীয়া, বিজয়পুর, বিক্রমপুর)
২। কুমারপালচরিত থেকে পুষ্প নিয়োগীর উদ্ধৃতি. পৃঃ ১২০
৩। ডি. আর ভাণ্ডারকর সম্পাদিত। এ. ই. xi, নং ৪
৪। দশরথ শর্মা—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৯৮
৫। ঐ, পৃঃ ২৯৯
৬। এ. ই. xiv, নং ২১, ৬৯-৭৯

বাংলাদেশ থেকে লাল রঙ এনে এখানে বিক্রয় করা হত।[১] নাসিকের জনৈক পরমার সামন্তের দলিল থেকে জানা যায় যে সেখানেও বহু দোকানপাট এবং তেলের ঘানি ছিল।

গুজরাটে ব্যবসায়ীসম্প্রদায়, যাদের বণিক বলা হত, বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। বস্তুপাল, তেজপাল, জগড়ু এই তিনজন লক্ষপতি ব্যবসায়ী বেশ খ্যাতি-লাভ করেছিল।[২] এরা অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্য উভয় থেকেই সম্পদ আহরণ করেছিল এবং বলা বাহুল্য সাধারণ বণিকরাও এদের সহযোগিতা করেছিল এই সাধারণ বণিকরাই সাধারণের আর্থিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। পেদিও নামে অভিহিত বণিকেরা কেবল অন্নশস্য বিক্রয় করত (কণাদিবিক্রেতাবণিক)।[৩] এমন সব সাধারণ বণিকের কথা শোনা যায় যারা কেবল ছোলা বিক্রয় করত (চনকবিক্রয়কার)।[৪] এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে গ্রামাঞ্চলেও কিছু লোক খাদ্যান্ন ক্রয় করত।

উত্তরপ্রদেশে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না, যদিও গাহরওয়াল শিলালিপিতে প্রযুক্ত 'প্রবণিকর' শব্দটির অর্থ খুচরা বিক্রেতার উপর আরোপিত শুল্ক। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডে নীল, কার্পাস ও ইক্ষুর মত নগদ আয়ের ফসল উৎপন্ন হত বলে সেখানে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। জনৈক শ্রেষ্ঠিপরিবার কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত সামগ্রী দেখে অনুমান করা যায় যে, চন্দেলরাজ্যে ব্যবসায়ীসম্প্রদায় বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল।[৫] মনে হয় কলচুরিদের অধীনস্থ বুন্দেলখণ্ডে বাণিজ্যের বেশ ভাল বিকাশ হয়েছিল। সেখানকার প্রত্যেক শহর ও গ্রামে এক-একটি মণ্ডপিকা ছিল। শহর ও গ্রামের বাজারগুলিতে খাদ্যশস্য, লবণ, লঙ্কা, মদ, তেল, কার্পাস এবং শাকসব্জী ইত্যাদি বিক্রয় হত।[৬]

পূর্ব ভারতে এর পূর্ববর্তীকালে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যে একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায় নি তা পাল অনুদানপত্রে 'তরিক' (নৌবহনশুল্কাধিকারিক) এবং 'শৌলিক' (শুল্কসংগ্রহকারী) নামক পদাধিকারীর উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায়। অবশ্য সেন দলিলে এদের কোনো উল্লেখ নেই। এইকালে 'হট্টপতি'[১] নামক বাজার তত্ত্বাবধায়কের নতুন পদাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

১। এ.ই. xiv, শ্লোক ৬৯
২। ঐ, xix, নং ১০, প ১৭-৩১
৩। হেমচন্দ্রকৃত দেশীনামমাল, vi, ৫৯
৪। মেরুতুঙ্গকৃত প্রবন্ধচিন্তামণি ; জিনবিজয়মুনি সম্পাদিত, পৃঃ ৭০
৫। এস. কে. মিত্র, দি আর্লি রুলস অফ খজুরাহো, পৃঃ ১৮১-২
৬। মিরাশি—ক. ই. ই. iv, পৃঃ clxx
৭। ই. বে. iii, নং ১৬, প ১৬

সব মিলিয়ে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর চার শতাব্দী ধরে ভারতে বাণিজ্যের ক্রমাবনতি ঘটলেও, আলোচ্যকালে বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের নবোদ্যমই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির কারণ, আমরা সে সম্পর্কে এবার আলোচনা করব।

এ কথা মনে করা ভুল হবে যে ৭৫০ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ৬০০ থেকে ৯০০ পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য যে খুব কমে গিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এইকালের বিদেশী বাণিজ্যের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা সাতবাহন ও কুষাণকালে রোমসাম্রাজ্যের সঙ্গে এবং গুপ্তকালে বাইজাণ্টাইনসাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের তুলনায় কিছুই নয়। তা হলেও আরব সাগরের মাধ্যমে ভারত ও পারস্যের উপসাগর এবং আরবের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য বেশ ভালভাবেই চলত। সপ্তম শতাব্দীর আরব বিবরণীতে ভারতের পশ্চিমতট অবস্থিত কিছু বন্দরের উল্লেখ আছে।[১] কিন্তু ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আরবদের অধিকাংশ বিবরণী ৯ম থেকে ১০ম শতাব্দীর মধ্যেই পাওয়া যায়। এইকালের বিবরণীগুলিতে বহু ভারতীয় বন্দরের উল্লেখ দেখা যায়।[২] দশম শতাব্দী থেকে ভারতের পশ্চিমতটবর্তী অঞ্চলে ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতা লক্ষ্যণীয়। বাণিজ্যের এই পুনরুত্থানের সম্বন্ধ দশম শতাব্দীর শেষ বৎসরগুলিতে জাহাজ-বিষয়ক এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চোলদের উদ্যমের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে পরবর্তী শক্তিশালী চোল শাসকদের অবদান কিছু কম নয়।

১০০৮ সালের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে কোঙ্কন শুধু তটবর্তী দেশগুলির সঙ্গেই নয়, উপরন্তু দূর বিদেশের (দ্বীপান্তর) সঙ্গেও ঘনিষ্ট বাণিজ্যিক সম্বন্ধস্থাপন করতে পেরেছিল।[৩] এই বাণিজ্যের ফলে সেখানকার শাসক, মাণ্ডলিক রট্টরাজের নগদ আয়ও হত। বিদেশ থেকে আগত প্রত্যেক জাহাজ থেকে তিনি এক 'গদিয়ান' স্বর্ণ এবং তটবর্তী অঞ্চলে কণ্ডলমূলীয় নামক স্থান থেকে আগত প্রত্যেক জাহাজ থেকে এক 'ধরণ' স্বর্ণ আদায় করতেন।[৪] সম্ভবতঃ তটবর্তী অঞ্চলে বাণিজ্যের বাহন ছিল নৌকা। এ সমস্তই কোঙ্কনের তটবর্তী অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান

১। নদবী—'আরব-ভারত কে সম্বন্ধ' পৃঃ ৪৬
২। ঐ
৩। এ. ই. iii, ২৯৬-৭
৪। ঐ iii, নং ৪০, প ৫৬-৭

বাণিজ্যের লক্ষণ এবং ব্যবসায়ের এত বিকাশ ঘটেছিল যে মণিগ্রাম নামে শুধু বণিকদেরই একটি শহর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।[১]

অনুরূপভাবে চীনের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। এ বিষয়ে প্রথমে আরবদের আধিপত্য ছিল, পরে সে স্থান অধিকার করে চৈনিকগণ। এই দুই দেশই নিজেদের জাহাজে বাণিজ্য করত। ১০ম শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিদেশে গিয়ে বাণিজ্য করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।[২] কিন্তু ১২শ শতাব্দীর রচনা 'মানসোল্লাসে' এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, বন্দরে পৌছে ভারতীয় জাহাজ, জাহাজের মালের মূল্যের এক-দশমাংশ রাজাকে কর হিসাবে দেবে।[৩] ১৩শ শতাব্দীতে জগডু নামক একজন বণিকের কথা জানা যায়, সে পারস্যের সঙ্গে নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য করত এবং নিজের জাহাজের সাহায্যেই মাল পরিবহন করত।[৪] হরমোজে তার একজন ভারতীয় প্রতিনিধি ছিল। তা ছাড়া পশ্চিম ভারতীয় তটবর্তী অঞ্চলের যত্রতত্র ভারতীয় সামুদ্রিক দস্যুর উপদ্রবের উল্লেখও পাওয়া যায়। ১৩শ শতাব্দীতে মার্কোপোলো গুজরাটী জলদস্যুর অত্যাচারের কথা বর্ণনা করেছেন।[৫] এই সমস্তই ভারতের সামুদ্রিক জাহাজের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে।

এ কথা নিশ্চিত যে ১৩ শতাব্দীতে ভাবতে জাহাজ নির্মাণের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। মার্কোপোলো বেশ কয়েকটি ভারতীয় জাহাজের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি বহু বণিক ও বিভিন্ন প্রকার সওদা নিয়ে ফুটী (চীনের বন্দর) যাত্রা করত।[৬] এ ছাড়া পশ্চিম তটবর্তী কয়েকটি কর্মব্যস্ত বন্দরের উল্লেখও আছে, যেখানে আরব ও চৈনিক ব্যবসায়ীগণ যাতায়াত করত। আরব লেখকগণ দশম শতাব্দীতে কয়েকটি বন্দরের উল্লেখ করেছেন, সেগুলির সংখ্যা ৭ম শতাব্দীর আরব লেখকগণ কর্তৃক বর্ণিত সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি।[৭] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ভারতের পশ্চিমতটে ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্য পুনরায় নবোদ্যমে সুরু হয়েছিল যার সমর্থন পাওয়া যায় সমসাময়িক অনুদানপত্রগুলিতে। এগুলিতে নগদ চুঙ্গিকর এবং বিক্রয়করের বহুল উল্লেখ দেখা যায়।

১। ঐ, প ৪৪
২। এ. কে. মজুমদার—'দি চৌলুক্যজ' পৃঃ ২৬৭
৩। গা. ও. সি. xxviii, পরিচ্ছেদ ৪, শ্লোক ৩৭৪-৬
৪। এ. কে. মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৬৭। জগডুচরিত নামক গ্রন্থ, যার নায়ক একজন ব্যবসায়ী, ১৪শ শতাব্দীর কোনো এক সময়ে রচিত হয়েছিল। ঐ, পৃঃ ৪২০। ১২১১ সালে একজন হিন্দু ব্যবসায়ী গজনীতে ব্যবসা করত (ঐ, পৃঃ ২৬৭)।
৫। এ. কে. মজুমদার—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৬৮
৬। মার্কোপোলো ii, ২৩১
৭। নদবী—'আরব-ভারত কে সম্বন্ধ' পৃঃ ৪৬

বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলিতে ভারত প্রধানতঃ বিলাসদ্রব্য, মসলা, রেশমীবস্ত্র এবং মসলিন রপ্তানি করত। কিন্তু আলোচ্যকালে ভারত পাকা চামড়া, চর্মজাত বস্তু, বোক্রাম কাপড়, মোটা কাপড় এবং অন্যান্য প্রকার তন্তুজাত বস্তুও রপ্তানি করত।[১] সম্ভবতঃ মোটা কাপড় শণ অথবা পাট থেকে প্রস্তুত হত, কিন্তু চৈনিক বিবরণী থেকে জানা যায় যে উত্তম শ্রেণীর পাটও রপ্তানি হত।[২] চৈনিক ও আরবীয় বিবরণী অনুসারে এইযুগে মালব ও গুজরাট থেকে আখ এবং আদাও রপ্তানি হত। মোটা কাপড়, কার্পাসজাত বস্তু, পাট ও শর্করা বেশ ভালরকম রপ্তানি হত বলে মনে হয়, কারণ এই সকল বস্তুর ব্যবহার শুধু উচ্চ-শ্রেণীর আরব বা চৈনিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না। খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলিতে উত্তম বস্ত্রের রপ্তানি অবশ্যই হত, কিন্তু পাট বা শর্করা রপ্তানি হত না।[৩] সম্ভবতঃ এই সকল পণ্য পরে নতুন সংযোজন করা হয়েছিল। এই পণ্য দুটি রপ্তানির পরিমাণ কি ছিল তার সঠিক আন্দাজ আমাদের নেই, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই দুটি সামগ্রী বিলাসদ্রব্য ছিল না, ফলে এগুলির উৎপাদকগণের উপর এগুলির রপ্তানির প্রভাব পড়েছিল, কারণ তারা সম্ভবতঃ তাদের উৎপন্ন কার্পাস, পাট এবং আখের জন্য নগদ দাম পেত। প্রথম শতাব্দীতে মসলা আমদানি করার ফলে রোমকে যেমন প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করতে হত, তেমনি ১০ম-১২শ শতাব্দীতে বিলাসদ্রব্য আমদানি করার ফলে চীনের প্রচুর সোনা ও রূপা ভারতে চলে আসতে থাকল। তাই রোমের মত চীনকেও ১২শ শতাব্দীতে মালাবার ও কুইলনের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে হয়েছিল।[৪]

তুর্কীদের ভারত আক্রমণের পূর্বে দুই শতাব্দী ব্যাপী বাণিজ্যের পুনরুত্থানের কারণ নির্দেশ করা কঠিন। পূর্ব ভারতে ব্যবসায়ে নবোদ্যমের কারণ কিছুটা অনুমান করা চলে। কারণ সেখানে দুটি ব্যবসায়িক পণ্য, সুপারি ও নারিকেলের চাষের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বাংলার সেনদের অনুদানপত্রে মুদ্রার বহুল উল্লেখও সম্ভবতঃ এই ব্যবসায়িক পণ্যের বহুল উৎপাদনেরই ফল। ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে

১। ঐ, পৃঃ ২৬৫-৬

২। পুষ্প নিয়োগী—'দি ইকনমিক হিস্ট্রী অফ নর্দ র্ন ইণ্ডিয়া' পৃঃ ১৩৯

৩। পেরিপ্লাসের একস্থানে ভারত থেকে রপ্তানি করা পণ্যের মধ্যে শর্করার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই রপ্তানি এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যার ফলে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের মধ্যে এটির স্থান হতে পারে।

৪। চাও-জু-কুয়া, পৃঃ ১৮, পুষ্প নিয়োগীর গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। অদ্যাবধি ভারতের পশ্চিমতটে কোনো চৈনিক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নি; কিন্তু চৈনিক মুদ্রা সেখানে থাকার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্ভবতঃ চৈনিকগণ সোনা ও রূপার খণ্ড দিতেন বা গলিয়ে মুদ্রা ও অলঙ্কার নির্মাণ করা হত। কিন্তু তাঞ্জোরে বহু চৈনিক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে,যেগুলি দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে।

উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অনুদানে প্রদত্ত বস্তর মধ্যে এই দুটির বহুল উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু গুপ্তযুগের অনুদানপত্রে বা উত্তরবঙ্গে পালদের অনুদানপত্রে এগুলির কোনো উল্লেখই নেই। পূর্ববঙ্গে ৭ম-৮ম শতাব্দীর একটি অনুদানপত্রে প্রথম সুপারির উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] কিন্তু অনুদানপত্রে নারিকেলের স্থান হয়েছিল আরও দুই শতাব্দী পরে। চন্দ্র ও বর্মণদের অনুদানপত্রে অনুদত্ত ভূমির উৎপন্ন ফসলের বিবরণীতে সুপারি ও নারিকেলের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এগুলির মুদ্রামূল্যের উল্লেখ নেই। অপরদিকে সেন অনুদানপত্রে এই দুটি বস্তর উৎপাদনের যেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেখানেই শুধু মুদ্রায় ফসলের মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুটি ফলের বৃক্ষ সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছিল এবং এই দুটি বস্ত ১১শ শতাব্দী থেকে আয়ের উৎসরূপে পরিগণিত হতে লাগল। সেখানকার কৃষকগণ সম্ভবতঃ এই ফসলের জন্য রাজাকে কর প্রদান করত এবং রাজা ধর্মীয় অনুদান দিলে গ্রহীতারা এই করের অধিকার লাভ করত। বাংলাদেশের অধিবাসীদের নারিকেলের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের কথা জানা ছিল কিনা, সেটা আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সুপারি এবং নারিকেল কৃষকদের নগদ আমদানির প্রধান উপায় ছিল।

মধ্য এবং পশ্চিম ভারতে বাণিজ্যের পুনরুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে এখানে আখ, কার্পাস, শণ, এই তিনটি নগদ আয়-প্রদানকারী ফসলের বহুল চাষ হত। ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে চন্দেল অনুদানপত্র থেকে জানা যায় যে মধ্যভারতে এই তিনটি ফসলের বহুল চাষ হত। স্পষ্টতঃই এই ফসল থেকে প্রস্তুত দ্রব্যাদি গ্রাম্যবণিক ক্রয় করে রপ্তানির জন্য বন্দরে পাঠিয়ে দিত। এই কারণেই মধ্যপ্রদেশের কৃষকগণ নগদমুদ্রায় কর প্রদান করতে পারত।[২] ইক্ষু শুধু যে চন্দেলরাজ্যেই উৎপন্ন হত তাই নয় উপরন্তু মালবেও হত। এইযুগে 'ইক্ষুনিপিড়নযন্ত্রমে'র (আখ মাড়াই কলের) ব্যবহার হত, যার উল্লেখ হেমচন্দ্রের দেশীনামমালাতে পাওয়া যায়।[৩] এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পূর্বে আমরা আখ মাড়াই কলের কোনো সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাই নি।[৪] এই যন্ত্রের বহুল ব্যবহারের ফলে শর্করা শিল্প উন্নত হয়েছিল। কার্পাস থেকে সূতা বা কাপড় প্রস্তুতের প্রণালীর কোনো উন্নতি হয়েছিল কিনা

১। 'মেমোয়ার্স অফ এশিয়াটিক সোসাইটী অফ বেঙ্গল'এ প্রকাশিত 'দি আশরাফপুর কপারপ্লেট্স অফ দেবখড়্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ i, নং ৬, পৃঃ ৯০, প্লেট 'বি' প ৮
২। ক. ই. ই. iv, নং ১১৬, প ১-১১
৩। ii, ৬৫ ; vi, ৫১ ; iv, ৪৫
৪। যোগেশচন্দ্র রায়কৃত 'এনিসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান লাইফ' পৃঃ ৮৫১ ; এ. কে. মজুমদারকৃত পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৪৭৮-৯ এ উদ্ধৃত।

সেটা অবশ্য আমরা জানি না, কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ৭ম শতাব্দীতে রুহমী (বাংলাদেশের অপর নাম) থেকে সূতিবস্ত্র রপ্তানি হত এবং মালব ও গুজরাটেও কার্পাস চাষের প্রাচুর্য ছিল। মার্কোপোলো ভারতীয় কার্পাসের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে গুজরাটে কার্পাসের বড় বড় গাছ ছিল, সেগুলি ২০ বৎসরের মধ্যে ছ গজ উঁচু হত এবং তার থেকে প্রচুর তুলা পাওয়া যেত।[১]

ইক্ষু শুধু মধ্যভারতেই নয়, রাজস্থানের শুষ্ক এলাকাতেও ইক্ষু চাষের প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ সেখানে কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। এখানে 'অরহট্ট' বা 'অবঘট্টে'র উল্লেখ করা যায়। এটি একটি জল নিষ্কাশনচক্র যাতে বালটি বাঁধা থাকত এবং বলদের সাহায্যে কূপ থেকে জল তোলা হত। যন্ত্রটির উল্লেখ প্রথম ৯ম শতাব্দীর শিলালিপিতে পাওয়া যায় এবং এটির ব্যবহার সম্ভবতঃ পারস্যের কাছ থেকেই ভারত শিখেছিল। কিন্তু এটির বহুল প্রচলন হতে যথেষ্ট সময় লেগেছিল কারণ এখানকার স্থায়ী কৃষক সমাজের লোকেরা কোনো নতুন জিনিসকে সহজে স্বীকার করে নিত না। কিন্তু পরবর্তী তিন শতাব্দীতে এই যন্ত্র যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল কেননা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব মারওয়াড়ে প্রাপ্ত ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে চাহমান শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে এইরূপ চক্রচালিত যন্ত্রকূপের বহুল ব্যবহার ছিল। তার ফলে ইক্ষু, কার্পাস ও শণ চাষের যথেষ্ট উপকারও হয়েছিল।

মনে হয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্য ও চীনে পাকা চামড়া ও চর্মজাত বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতে আরম্ভ হয়েছিল। দেশে এই শিল্পের উন্নতির ফলে রপ্তানি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল তার প্রমাণ দেশী ও বিদেশী উভয় সূত্র থেকে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিনীতে কাশ্মীরের চর্মকারদের উল্লেখ আছে[২] এবং লক্ষ্মীধর চর্মকার সমিতির উল্লেখ করেছেন।[৩] হেমচন্দ্র কয়েক প্রকার জুতা ও জুতা প্রস্তুত-কারকদের উল্লেখ করেছেন।[৪] মার্কোপোলো বলেছেন যে গুজরাটে সবচেয়ে বেশি চামড়া পাকানো হত এবং সেখানে লাল ও নীল চামড়ার সুন্দর সুন্দর চাটাই তৈরি হত।[৫]

জলযাননির্মাণের উন্নতিও শিল্পব্যবসায়ের বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। পরমার ভোজ কর্তৃক ১১শ শতাব্দীতে রচিত 'যুক্তিকল্পতরু'তে কয়েক প্রকার জলযানের

১। এ. কে. মজুমদার—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৫৯
২। পুষ্প নিয়োগী—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৭
৩। বি. পি. মজুমদার—'সোসিও-ইকনমিক হিস্ট্রী অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া' পৃঃ ২০৪
৪। এ. কে. মজুমদার—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৬১
৫। ঐ, পৃঃ ২৬০-১

উল্লেখ আছে এবং বলা হয়েছে যে নৌকার তক্তাগুলি দড়ির দ্বারা যুক্ত করা উচিত, কারণ লোহার পেরেক ব্যবহার করলে চুম্বক পাহাড়ের টানে জলযান বিপর্যস্ত হতে পারে।[১] যদিও এটা লেখকের অন্ধবিশ্বাসমাত্র, তবু লোহার পেরেক অপেক্ষা দড়ি দিয়ে বাঁধা তক্তার ঝড়তুফানের সঙ্গে মোকাবিলা করবার ক্ষমতা ছিল বেশি।

১১শ-১২শ শতাব্দীতে বাইরের কোন প্রভাব ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক হয়েছিল কিনা তা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ ক্রুসেডের (ধর্মযুদ্ধ) ফলে ইউরোপের সঙ্গে আরবেরা বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটায়, আরবরা ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এদিকে ইউরোপের বাস্তব বিষয়ের উন্নতি হয়েছিল যথেষ্ট এবং জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। এইজন্য বিলাসদ্রব্যের চাহিদাও সেখানে নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাহমুদ ও মাসুদের শাসনকালে প্রচুর পরিমাণ উন্নত মানের মুদ্রা জারী করা হয়েছিল। ১১শ শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গে ইস্লামিক প্রাচ্য দেশগুলির বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনে এর সুবিধা হয়েছিল। অবশ্য এ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মত হল এই বাণিজ্যে ভারতই বেশি লাভবান হয়েছিল।[২] ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুত্থানের সূক্ষ্ম কারণ যাই হোক না কেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এই ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এবং এ কথা স্বীকার করা যায় না যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রগতির ফলে পশ্চিম ভারতে ভূমিভিত্তিক সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থার মূল দুর্বল হতে আরম্ভ করেছিল।

যাতায়াতের বাহনের উন্নতি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সহায়ক হয়েছিল। ভরতপুর-রাজ্যের বয়ানা নামক স্থানে প্রাপ্ত ৯৫৫-র একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে শূরসেন নামক শাসকবংশীয় কোন একজন মহিলা ভগবান বিষ্ণুকে একটি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন এই গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাতায়াতকারী ব্যবসায়ীদের মাল বোঝাই ঘোড়াপ্রতি চুঙ্গিকর আদায় করা হত।[৩] এর দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ১০ম শতাব্দীতে মাল বহনের জন্য ঘোড়ার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। একটি অন্য শিলালিপিতে উট দ্বারা বাহিত মালের উপর চুঙ্গিকর আরোপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভূতপূর্ব যোধপুররাজ্যে একটি মন্দিরকে অনুদানস্বরূপ এই অধিকার প্রদান

১। পুষ্প নিয়োগী—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৭০

২। সি. ই. বসওয়ার্থ—'দি গজনবাইডস্' পৃঃ ৭৯

৩। এখানে 'প্রতি ঘোটকং চ দানে দ্রম্মো দেবস্য ভোগবতো বিহিতঃ।' বাক্যের প্রয়োগ হয়েছে। ই এ. xxii, নং ২০, শ্লোক ৪১। দুটি গ্রাম এবং শ্রীপথা ও বুসাবটের মণ্ডপিকা (বাজার) থেকে যে আয় হত তার থেকে প্রতিদিন তিন দ্রম্ম হিসাবে অনুদান (ঐ শ্লোক ৩৯-৪০) .বিষয়ে আর. ডি. ব্যানার্জী এই মত প্রকাশ করেছেন যে প্রতি অশ্বতার মালের উপর কর আরোপ করা হত। এই মত ঠিক বলেই মনে হয়, অবশ্য তিনি এ কথাও বলেন যে, ঘোড়া বিক্রয় হলেই শুল্ক আদায় করা হত (ঐ ২১১)।

করা হয়েছিল যে সে নিজ এলাকার উপর দিয়ে যাতায়াতকারী বণিকদলের মধ্যে যে দলে দশের অধিক উট এবং বিশের অধিক বলদ থাকত তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে দল প্রতি এক পয়লা কর আদায় করতে পারবে।[১] যদিও এই শিলালিপিটি ১৩শ শতাব্দীর শেষের দিকের তবু উটের ব্যবহার সম্ভবতঃ আরও আগে থেকেই প্রচলিত হয়েছিল কারণ সেই সকল শিলালিপি এবং 'মানসোল্লাস'[২] অনুসারে সৈন্যাভিযানে যাতায়াতের জন্য মহিষ, উট ও বলদের ব্যবহার হত। এইভাবে এখন বলদ ছাড়া মাল পরিবহনের জন্য ব্যাপকভাবে ঘোড়া ও উটও ব্যবহার হতে লাগল। এ কথা সত্য যে পূর্ব ভারতে উটের ব্যবহার সম্ভব ছিল না, কিন্তু ঘোড়া সেখানে ভারবাহী পশুতে পরিণত হয়েছিল। শিলালিপিতে বার বার ঘোড়া বিক্রির প্রসঙ্গ থেকে অনুমান করা চলে যে শুধু সৈনিক অভিযানের জন্যই নয়, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেও ঘোড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। অতএব দীর্ঘ পথ যাতায়াতের জন্য এই সব বাহন ব্যবহারেব ফলে ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল বলে মনে হয়।

এইযুগেব মুদ্রা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে, আমবা অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দুই প্রকার বাণিজ্যিক প্রগতি সম্পর্কে সম্যক অনুধাবন করতে পারব। সমকালীন শিলালিপি ও সাহিত্যের অনেক স্থানে মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায় এবং এইযুগের বহু মুদ্রাও পাওয়া যায়। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে পুনরায় মুদ্রা ঢালাই হতে দেখা গেল, যদিও এটা প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত, মালব, গুজরাট এবং রাজস্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা ও বিহারে এর প্রমাণ খুব সংকীর্ণ। এ কথা সত্য যে কয়েকজন পণ্ডিতের এই মত যে এইযুগে পূর্ব ভারতে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কড়ি। এই মত সহজে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশে সেন ও তাদের সমসাময়িক শাসকদের ফলে অবস্থার নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটেছিল। সেন অনুদানে অনুদত্ত ভূমি বা গ্রামের রাজস্বের নির্ধারণ করা হয়েছে কপর্দক-পুরাণে। পালদের কালে এই বিনিময় মাধ্যমের কপর্দকপুরাণে কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত ১২৩৪-এর একটি শিলালিপিতে দামোদরদেব দ্বারা ২০ জন ব্রাহ্মণকে দানে প্রদত্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রের বার্ষিক আয় নগদ মুদ্রায় বলা হয়েছে যে এই ব্রাহ্মণদের এই সকল ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত আয় ১০০ 'পুরাণ'[৩] যদিও আমরা নিশ্চিতরূপে এ কথা বলতে পারি না যে দানগ্রহীতা নিজ প্রাপ্য নগদ মুদ্রাতেই আদায় করত।

১। এ. ই. xi, নং ৪ ; xxii, প ৪-৭
২। অধ্যায় xx, শ্লোক ১০৬৮
৩। এ. ই. xxx, ৫৭-৮

যতই পশ্চিমে অগ্রসর হওয়া যায় ততই মুদ্রার অধিক প্রচলন দেখা যায়। প্রথম যে গাহরওয়াল রাজা মুদ্রা জারী করেছিলেন তিনি হলেন মদনপাল (১১০২-১১১১)। দ্রম্ম নামে পরিচিত অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে, এগুলি তাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের (১১২২-১১৫৫) জারী করা বলে স্বীকৃত হয়েছে। এখনও যেরূপ ব্যাপকভাবে তাঁর প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে অনুমিত হয় যে এই মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল। অন্য শাসকদের প্রচারিত মুদ্রার সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান রাজবংশের মধ্যে প্রথম স্বর্ণমুদ্রা পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন কলচুরিরাজগণ। এই রাজবংশীয় কয়েকজন শাসকের প্রচারিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। কলচুরি স্বর্ণমুদ্রা প্রথম গাঙ্গেয়দেব (১০১৫-১০৪০) জারী করেছিলেন। পরে চন্দেল শাসকগণও জারী করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের শাসনের প্রথম শতাব্দীতে তাঁরা কোনো মুদ্রা জারী করেন নি। কিন্তু কীর্তিবর্মণ (১০৬০-১১০০) মুদ্রা প্রবর্তন করেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁরা তিন প্রকার দ্রম্মের প্রচলন করেছিলেন। চন্দেলদের রাজ্যে মুদ্রার ক্রমবর্ধমান প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায় ১২১২ সালের একটি শিলালিপিতে[১] এটিতে একটি বিত্তবন্ধ বা জমি বন্ধক রেখে মুদ্রা গ্রহণের উল্লেখ আছে, কিন্তু এই মুদ্রার পরিমাণ বা সংখ্যা কি তার উল্লেখ করা হয় নি।

প্রতীহারসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত রাজপুত রাজবংশের জারী করা বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। চাহমানগণও বহু মুদ্রা জারী করার গৌরব লাভ করেছেন এবং তাঁদের জারী করা প্রচুর মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে তাঁদের শাসনকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব উন্নতি হয়েছিল এবং এই কারণেও প্রচুর মুদ্রা জারী করা অত্যাবশ্যক ছিল। দোকান ও পণ্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব নগদে নির্ধারণ করে টাকাটা মন্দিরকে অনুদান দেওয়া হত। 'শ্রীগুহিল' চিহ্নাঙ্কিত প্রায় ২০০০ রৌপ্যমুদ্রা ১৮৬৯-এ আগ্রাতে পাওয়া গিয়েছিল[২] কিন্তু সেগুলি এখন কোথায় আছে তা জানা নেই। হাজার হাজার সংখ্যায় প্রাপ্ত 'গধইয়া' মুদ্রার মধ্যে অনেকগুলি গুহিল ও চাহমানদের বলে স্বীকার করা হয়েছে। যেসকল গধইয়া মুদ্রা অক্ষরাঙ্কিত, সেগুলি ১১শ শতাব্দীর পূর্বের হতে পারে না। এইভাবে ১০ম শতাব্দীর চতুর্থাংশ থেকে ১২শ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরের মুদ্রাগুলিকে কানিংহাম, আজমীর ও দিল্লীর তোমরবংশের বলে

১। এ. ই. xxv, নং ১, প ১০-৪

২। এ. এস. আই-এর ১৮৭১-৭২'র রিপোর্ট (ix, ৯৫)। এস. সি. কার্লাইল কর্তৃক প্রতিবেদিত।

বর্ণনা করেছেন। ১৩শ শতাব্দীতে গোয়ালিয়রের মারওয়াড়ী শাসকগণ কর্তৃক জারী করা তাম্রমুদ্রারও উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি স্থান থেকে প্রাপ্ত ৭৯১[১] ও ৯২৬[২] টি তাম্রমুদ্রাও এঁদেরই বলে স্বীকার করা হয়েছে।

মালবের পরমারদের শিলালিপিতে (রাজস্থানের বাঁসওয়াবায় প্রাপ্ত অর্থুনা শিলালিপি) আমরা মুদ্রার উল্লেখ পাই। পরমারদের মধ্যে একমাত্র উদয়াদিত্য যিনি ১০৬০ এবং ১০৮৭ সালের মধ্যবর্তীকালে মধ্য ও উত্তর ভারতে অংশবিশেষ শাসন করেছিলেন, তিনিই স্বর্ণমুদ্রা জারী করেছিলেন।[৩]

মধ্যভারত, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মালব ও গুজরাটে বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে মুদ্রা প্রচলনের পুনরাবর্তনের কারণ, মনে হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি। শিলালিপিতে মণ্ডপিকা ও দোকান থেকে প্রাপ্ত নগদ রাজস্ব অনুদান দেবার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে এ কথাও জানা যায় যে পশ্চিম ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে দেশী ও বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে আমদানি ও রপ্তানি কর নগদে আদায় করা হত। কোঙ্কনে বিদেশী বণিকদের 'গদ্যাণ' নামক স্বর্ণমুদ্রা দিতে হত এবং দেশীয় বণিকদের 'বরণ' নামক স্বর্ণমুদ্রায় সীমাশুল্ক দিতে হত। 'লেখপদ্ধতি'তে এমন দস্তাবেজের খসড়া দেওয়া হয়েছে যার থেকে প্রতীয়মান হয় যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পণ্যের বেশ ভাল খরিদ-বিক্রয় হত। এই গ্রন্থে আমরা বাণিজ্য ও টাঁকশাল তত্ত্বাবধায়কের বিভাগের ব্যবস্থার উল্লেখ দেখতে পাই। চৌলুক্যরাজের শিলালিপি থেকেও তার সমর্থন পাওয়া গিয়েছে।

মুদ্রাঙ্কনের ব্যাপারে পূর্ব ভারত ও পশ্চিম ভারতে অনেক পার্থক্য ছিল। পূর্ব ভারতে বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম ছিল কড়ি অবশ্য উড়িষ্যার কোনো-কোনো অংশে ছোট ছোট স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। এই অঞ্চলে যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল এবং যথেষ্ট সংখ্যক শহর ছিল শিলালিপি থেকে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্পষ্টতঃই স্বনির্ভর সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থা শক্তিশালী ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আমরা যদি উড়িষ্যাকে বাদ দিই, তা হলে সেবাবৃত্তি হিসাবে সামন্ত ও রাজপদাধিকারীগণকে প্রদত্ত ভূমি অনুদানের দৃষ্টান্ত পূর্ব অপেক্ষা পশ্চিমেই বেশি পাওয়া যায়। হয়ত প্রকৃতপক্ষে অবস্থা এরূপ ছিল না, পূর্ব ভারতে বন্যার প্রকোপ এবং যুদ্ধবিগ্রহের ফলে অনুদানের শিলালৈপিক প্রমাণগুলি হয়ত পূর্ব ভারতে বিনষ্ট হয়েছিল।

১। সি. আর. সিংহল—'বিব্লিওগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান কয়েন্স' ভাগ ১, পৃঃ ৯৫
২। ঐ, পৃঃ ১০২
৩। ঐ, পৃঃ ৯৬

আমরা মধ্যভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পেয়েছি, তার মধ্যে একটা বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পূর্বে দেশের বিভিন্ন অংশে বস্তু দ্বারা রাজস্ব প্রদান করা হত, কিন্তু এই দলিলটি থেকে জানা যায় যে এখন সেখানে নগদেই রাজস্ব আদায় করা হত, বস্তুতে নয়। ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের (১২১৩) একটি দলিল থেকে জানা যায় যে রতনপুরস্থ কলচুরি-সামন্ত মহামাণ্ডলিক পম্পরাজ দ্বারা জারী করা একটি দস্তাবেজে জয়পরা গ্রামের রাজস্ব পূর্ব নিয়মানুসারে ১৩০ 'সবাহগড়ামাচ্ছ' এবং ১৪০ 'বিজয়রাজটঙ্ক' নির্ধারিত করা হয়েছিল।[১] এটিতে আরও বলা হয়েছে যে অন্য একটি গ্রামের রাজস্ব বিজয়রাজটঙ্কে নির্ধারিত করা হয়েছিল।[২] যদিও এই দানপত্র গৈতা লক্ষ্মীধরের নামে জারী করা হয়েছিল, তবু এতে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব নির্ধারণের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এটিকে মুসলিম প্রভাবের পরিণাম বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ১২০৬-এ স্থাপিত দিল্লীর সুলতানের রাজ্যে এই এলাকা অন্তর্ভুক্তই হয় নি। বিপরীতপক্ষে দিল্লীসাম্রাজ্যে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থাকে সেই একই প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি বলে স্বীকার করা উচিত, যা উত্তর ভারতে ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে পরিবর্তিত হয়েছিল।

১০ম শতাব্দীর উত্তরার্ধে পাঞ্জাব ও পশ্চিমোত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক মুদ্রা ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিক থেকে এর কারণ ছিল আরবদের সিন্ধু বিজয়। সিন্ধুপ্রদেশে তাদের অবস্থিতির কারণে পশ্চিম ভারতের সঙ্গে আরব জগতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয়েছিল। এর অন্যান্য আরও কারণ যাই হোক না কেন, এটা নিশ্চিত যে ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ১০০৫-৬ সালে মাহমুদ যখন মুলতান জয় করে নিয়েছিলেন, তখন সেখানকার নাগরিকদের এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে তারা যদি নগরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে চায় তা হলে যেন মাহমুদকে দুই কোটি দিরহম (দ্রম্মতুল্য) প্রদান করে।[৩] কথিত আছে যে ১০০৮-৯ সালে উত্তর সিন্ধু উপত্যকার নগরকোট দুর্গের মন্দির থেকে মাহমুদ ঢালাই করা মুদ্রারূপে সাত কোটি দিরহম, ৭০০০০ মন সোনা ও রূপার তাল এবং মূল্যবান বস্ত্রাদি, একটি রূপার গৃহ এবং একটি মূল্যবান সুসজ্জিত সিংহাসন হরণ করেছিলেন।[৪] আরও বলা হয় যে তিনি সোমনাথ মন্দির থেকে

১। ক. ই. ই. iv, নং ১১৬, প ১-১১
২। ঐ, প ৭-৮
৩। সি. ই. বসওয়ার্থ—'দি গজনাবাইডস' পৃঃ ৭৬
৪। ঐ, পৃঃ ৭৮

দুই কোটি দিনার মূল্যের জিনিসপত্র লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। রায় পরাজিত হয়ে বন্দী হলে ৫০০০০০ দিনার মূল্যের রত্নাদি, ২৬০০০০ দিনার মুদ্রা, ৩০০০০ দিনারের অধিক মূল্যের সোনারূপার পানপাত্রাদি, ২০০০০ দিনার মূল্যের রাজকীয় বস্ত্রাদি এবং যেসকল মতজিলা, দর্শনশাস্ত্র ও শিয়া গ্রন্থাদি বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছিল সেগুলি ছাড়া ৫০ বোঝা পুস্তক মাহমুদের সৈন্যগণ লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল।[১] লুঠের অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে আমাদের আলোচনার বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু মুদ্রার এই পৃথক সংখ্যাটির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে সেযুগে গুজরাটে মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তা ছাড়া মুসলমানদের বিবরণীতে মুদ্রার বৃহৎ সংখ্যা থেকে যেমন অনুমান করা চলে যে মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল, তেমনই তাল তাল সোনারূপার বর্ণনাও এই ইঙ্গিত দেয় যে সেগুলিকে স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রায় ঢালাই করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। প্রকৃতপক্ষে সুলতান এই মন্দির থেকে যে সোনারূপার তাল ও বহুমূল্য রত্নাদি লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন কুশলী ধাতুবিদ্ ও জহুরীরা সেগুলিকে বিনিময়যোগ্য করে তুলেছিলেন।[২] এ কথা সত্য যে মাহমুদের আক্রমণের ফলে পশ্চিম ভারতে বহু মুদ্রা লুণ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু পাঞ্জাবে গজনীরা স্বয়ং নিজেদের মুদ্রা জারী করেছিল এবং সেখানে হিন্দু আদর্শানুযায়ী রৌপ্য ও তাম্রমিশ্রিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল।[৩] তামা ও রূপার সংমিশ্রণে প্রস্তুত এই মুদ্রার প্রচলন সাধারণের মধ্যেও মুদ্রা ব্যবহারের ইঙ্গিত বহন করে।

ধীরে ধীরে সোনার জায়গায় সোনার জল করা রূপা, বিশুদ্ধ রূপা, কাঁসা ও রূপার মিশ্রণ এবং তাম্রমুদ্রার ক্রমপবিবর্তনই সেকালের মুদ্রাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ছিল। চন্দেল ও কলচুরিদের মুদ্রাব্যবস্থা দেখে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। সাধারণভাবে সোনার জায়গায় অল্পমূল্যের ধাতুমুদ্রার প্রচার আর্থিক অবনতি সূচিত করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তন অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতও বহন করে। বড় বড় লেনদেনের ক্ষেত্রেই স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার হত এবং তা ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু রূপার, রূপা-কাঁসার মিশ্রণজাত এবং তামার মুদ্রা সাধারণ ব্যক্তিদেরও আয়ত্তে ছিল, তাই এগুলির অস্তিত্ব সর্বসাধারণের মধ্যে মুদ্রা ব্যবহারের প্রচলনের ইঙ্গিত দেয়। তাই যাকে আর্থিক অবনতির ইঙ্গিত বলে মনে হচ্ছে, সেটাই প্রকৃতপক্ষে সাধারণের দৈনন্দিন বিনিময়ের প্রয়োজন মিটিয়েছে।

জনসাধারণের মধ্যে তাম্রমুদ্রার প্রচলনই বেশি ছিল। উষ্ণমণ্ডল অঞ্চলে দীর্ঘকাল

১। সি. ই. বসওয়ার্থ—'দি গজনবাইডস' পৃঃ ৭৮
২। ঐ
৩। ঐ, পৃঃ ৭৯

থাকার ফলে তাম্রমুদ্রায় অবক্ষয় স্বাভাবিক হলেও, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে যত তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে তাও কিছু কম নয়। ছোটখাট বিনিময়ের ক্ষেত্রে এটির ব্যাপক ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। গাহড়ওয়াল রাজাদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রমুদ্রার কথা আমরা জানি। ১১শ শতাব্দীতে ডাহলের কলচুরি রাজা গাঙ্গেয়দেব, যিনি স্বর্ণমুদ্রা পুনরায় জারী করার গৌরব লাভ করেছিলেন, তিনি তাম্রমুদ্রাও জারী করেছিলেন কিন্তু বেশিরভাগ তাম্রমুদ্রা ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীর রতনপুরের কলচুরিদের জারী করা বলে স্বীকার করা যেতে পারে।[১] অবশ্য বিলাসপুরে প্রাপ্ত তাম্রমুদ্রার কিছুকে ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের বলে গ্রহণ করা যায়।[২] রতনপুরের কলচুরি শাসন প্রতাপমল্লের (১২০০ ২৬) শুধু তাম্রমুদ্রাই আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে।[৩] কলচুরিগণ হনুমানাঙ্কিত তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেছিলেন এবং চন্দেলরা এটিকে খুব জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।[৪] মনে হয় এই হনুমান মুদ্রা যাকে কখনও কখনও দ্রম্মও বলা হয়েছে। ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে কলচুরিদেরকালে সাধারণ বিনিময়-মাধ্যম ছিল।[৫] অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে এই রাজারা আর অন্য কোনোপ্রকার তাম্রমুদ্রা জারী করেন নি। চাহমানরাজগণও তাম্রমুদ্রা জারী করেছিলেন।[৬] তাঁদের রাজ্যে গ্রামীণ বাণিজ্যের ক্রমোন্নতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চাহমান[৭] এবং তোমরগণ প্রচুর মাত্রায় 'বিলন'মুদ্রা জারী করেছিলেন বলে মনে হয়! পাঞ্জাবে গজনীর শাসকগণ কর্তৃক পুরাতন হিন্দু আদর্শ অনুযায়ী[৮] রূপা ও তামার মিশ্রিত ধাতুমুদ্রা জারী করতেন। ভবিষ্যতে হয়ত আরও বহু তাম্রমুদ্রা ও বিলনমুদ্রা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত যত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে তার থেকে জানা যায় যে উত্তর ভারত ও পশ্চিম ভারতের জনসাধারণের একটা বড় অংশের মধ্যে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

বিনিময়ের আরও দুইটি মাধ্যম প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে প্রথমটি লৌহমুদ্রা দ্বিতীয়টি কড়ি। লৌহমুদ্রা পশ্চিম ভারতে এবং কড়ি বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় প্রচলিত ছিল। মনে হয় সেনদের আমলে কৃষকগণ কড়ির মাধ্যমেই কর প্রদান করত।

রূপা, বিলন (?), কাঁসা-রূপা এবং বিশেষ করে তাম্রমুদ্রা এবং সম্ভবতঃ কড়ির

১। মিরাশি, ক. ই. ই. iv, পৃঃ ১৮৫-৭
২। জা. নি. সো. ই. xviii, ১১১-২
৩। মিরাশি—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১২৩
৪। ঐ, পৃঃ ১৮৮
৫। এস. কে. মিত্র—'আর্লি রুলার্স অফ খজুরাহো' পৃঃ ১৮৩
৬। দশরথ শর্মা—'আর্লি চৌহান ডাইনেষ্টিজ' পৃঃ ৩০৩
৭। ঐ, পৃঃ ৩০৫
৮। সি. ই. বসওয়ার্থ—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৭৯

ব্যবহারও বস্তু ও শ্রমের দ্বারা কর আদায়ের প্রথাকে কিছুটা শিথিল করে দিয়েছিল। এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, যার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে পূর্বে যেসকল কর-শুল্কাদি বস্তুতে প্রদান করা হত, এখন তা নগদে দেওয়া হয়। কিন্তু সেনদের এবং পরবর্তী কলচুরিদের কয়েকটি ভূমি অনুদানপত্র থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে কর নগদ মুদ্রাতেই নির্ধারিত হত। দিল্লীসাম্রাজ্যের সর্বত্র নগদমুদ্রায় কর আদায়ের প্রথার প্রচলন, এই প্রক্রিয়ার চরম পরিণতি বলে মনে হয়। রাজসরকার যে বেগার আদায়ের পরিবর্তে নগদমুদ্রা গ্রহণ করে পরিত্রাণ দিত, নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে আমরা এরূপ মন্তব্যও করতে পারি না। কিন্তু মধ্য ও পশ্চিম ভারতে দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে প্রচলিত বেগারপ্রথা যে দশম শতাব্দীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তার কারণ নিশ্চয়ই তাম্রমুদ্রার ব্যাপক প্রচলন। জলাশয়, পথ, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণে কৃষকদের কাছ থেকে যে বেগার আদায় করা হত, এখন কৃষকরা নগদমুদ্রা দিয়ে তার হাত থেকে অব্যাহতি পেত এবং রাজাও সেই মুদ্রার সাহায্যে নিজ কার্য সমাধা করতে পারতেন। এইভাবে আমবা দেখি যে বস্তু বা শ্রমের দ্বারা কর প্রদানের পরম্পরাগত সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভিত্তি মুদ্রা প্রচলনের ফলে শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের আলোচনার ভিতর থেকে যে চিত্র ফুটে উঠে তার মধ্যে বৈপরীত্যও লক্ষিত হয়। একদিকে আমরা ধর্মীয় ও বৈষয়িক উদ্দেশ্যে ভূমি অনুদানের প্রাচুর্য, উপসামন্তীকরণের ক্রমোন্নতি, শিল্পবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ধর্মীয় অনুদানভোগীকে সমর্পণ, করভারে বিপর্যস্ত কৃষক সমাজ এবং সার্বজনিক অধিকার-সমূহ হরণ বা হস্তান্তর দেখি, আবার অপরদিকে অনুদত্ত ভূমির স্পষ্ট সীমা নির্ধারণ, ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের নগদমূল্য নির্ধারণ, বিষ্টি প্রথার বিলোপসাধন, অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের পুনরুত্থান ইত্যাদি লক্ষ করি, বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে মুদ্রার প্রচলনও লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের চরমোৎকর্ষের মধ্যেই তার ধ্বংসের বীজও নিহিত ছিল। তাই তুর্কী আক্রমণের পূর্ববর্তী দুই শতাব্দীতে ভারতের সামন্তবাদী অর্থব্যবস্থায় চরমোৎকর্ষ ও হ্রাস দুই-ই লক্ষ করা যায়।

৭

উপসংহার

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ভূমি অনুদানের মধ্যেই রাজনৈতিক সামন্তবাদের ইতিহাস খুঁজতে হবে। গুপ্তযুগে এইরূপ অনুদানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তখন থেকেই এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হর্ষের শাসনকালে নালন্দা মঠের অধীনে ২০০টি গ্রাম ছিল। মন্দির ও পণ্ডিত-পুরোহিতগণ পাল ও প্রতীহারদের কাছ থেকে বহু গ্রাম লাভ করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটদের কাছ থেকে প্রাপ্ত গ্রামের সংখ্যার তুলনায় এগুলি খুবই কম ছিল। রাষ্ট্রকূটদের একটি অনুদানপত্রে ১৪০০ এবং অপর এক অনুদানপত্রে ৪০০ গ্রামদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্পষ্টতঃই ব্রাহ্মণ বা মন্দিরকে প্রদত্ত ভূমিরাজস্ব তাদের কোনো নাগরিক বা সামরিক সেবার পরিবর্তে দেওয়া হত না, বরং তাঁদের আধ্যাত্মিক সেবার জন্যই দেওয়া হত। দানগ্রহীতাকে যেসকল এলাকা দান করা হত, সেই এলাকায় তাঁকে রাজস্ব-বিষয়ক ব্যাপক অধিকার দেওয়া হত এবং সেই সঙ্গে সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার এবং অপরাধীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করার প্রশাসনিক অধিকারও দেওয়া হত। হুয়েন স্যাঙের মতে রাজ্যের বড় বড় পদাধিকারীকে ভূমি অনুদান দেওয়া হত। কিন্তু সমসাময়িক শিলালিপি থেকে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে ব্রাহ্মণদের ভূমিরাজস্বের দ্বারা বৃত্তি দেওয়া হয়ে থাকলে, অন্যদের জন্য ভিন্ন পদ্ধতি কিভাবে গ্রহণ করা হতে পারে? রাজপদাধিকারী ও অন্যান্য আমলাদের তাদের সেবার জন্য নগদ বেতনই দেওয়া হত, তা হলে আধ্যাত্মিক সেবার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের কারণ কি? বস্তুতঃ সেকালে ধর্মের প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে পুরোহিতদের বৃত্তিদানের প্রথাই অন্যদের বেলাতেও অনুসরণ করা হয়ে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। বৃত্তিরূপে ভূমি অনুদান দেওয়ার শুধু যে ব্যবহারিক সুবিধা ছিল তাই নয়, এইরূপ অনুদানকে সুলক্ষণযুক্ত পুণ্যকর্ম বলে গ্রহণ করা হত। প্রধানতঃ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভূমি অনুদান দেওয়ার শিলালৈপিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শাসকসর্দারগণ তাঁদের আত্মীয়-স্বজন, পদাধিকারী ও সামন্তদের ভূমি অনুদান দিতেন। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রাক্‌যুগে বঙ্গ বিহার অপেক্ষা উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে ভূমি অনুদানের অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ করে গাহড়ওয়াল, চন্দেল, কলচুরি, চৌলুক্য এবং পরমারদের রাজ্যে ১১শ ও ১২শ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈষয়িক অনুদানভোগীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

সামন্তের বহু প্রতিশব্দ পাওয়া যায়। সেগুলি এইরূপ—ভূপাল, ভোক্তা, ভোগী,

ভোগিক, ভোগিজন, ভোগপতিক, ভোগিরূপ, মহাভোগী, বৃহদ্ভোগী, বৃহদ্ভোগিক, রাজা, রাজ্ঞ, রাজরাজনক, রাজন্যক, রাণক, রাজপুত্র, রাজবল্লভ, ঠকুর, সামন্ত, মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি, মহাসামন্তরাণক, সামন্তক রাজা, মাণ্ডলিক এবং অন্যান্য সামন্তদের ভূমি অনুদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মনে হয় অন্যান্য সামন্তদেরও অনুরূপ ভূমি অনুদান দেওয়া হত। এঁদের মধ্যে বড় বড় সামন্তকে পঞ্চমহাবাদ্য ব্যবহারের অধিকারও দেওয়া হত। প্রভুকে সামরিক সাহায্য প্রদানই সামন্তদের প্রধান কর্তব্য ছিল। অন্যান্য যাদের সামন্তীয় উপাধি ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বস্তু প্রদান করা হত, তারাও এইরূপ সাহায্যদানে বাধ্য ছিলেন কিনা, ঠিক জানা যায় না। কিন্তু বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে ও উত্তর ভারতেও তাদের ক্রম-সামন্তীকরণ হচ্ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রারম্ভিক ভারতীয় সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল রাজস্বের দৃষ্টি থেকে রাজ্যকে ১০, ১২ বা ১৬টি গ্রামেব এককে অথবা পূর্বোক্ত সংখ্যার গুণিতক সংখ্যক গ্রামে বিভক্ত করা। প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনো এক সময়ে রচিত 'মনুস্মৃতিতে' বলা হয়েছে যে দশটি গ্রামের এককের অথবা দশমিকপ্রথায় গঠিত বৃহত্তর সংখ্যার এককের রাজস্ব সংগ্রহকারী পদাধিকারীকে বৃত্তি হিসাবে ভূমি অনুদান দেওয়া বিধেয় এইরূপ এককেব ব্যবস্থা রাষ্ট্রকূটদের এবং পালদের রাজ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু গুর্জর-প্রতীহার এবং তাঁদের সামন্ত ও উত্তরাধিকারী চাহমান, পরমার, ও চৌলুক্যগণ রাজ্যকে দ্বাদশমিক ও ষষ্ঠ দশমিক পদ্ধতিতে বিভক্ত করেছিলেন। এইরূপ কিছু একক রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের জায়গীররূপে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য এককগুলি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্যই সংগঠিত হয়েছিল এবং এগুলি রাজপদাধিকারীর অধীন করে দেওয়া হয়েছিল এবং রাজপধাধিকারীকে ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল। স্পষ্টত ই রাজপুতগণ বিজিত অঞ্চলকে এইরূপ এককে বিভক্ত করেছিলেন। এইরূপ একক সংগঠনের পশ্চাতে মধ্যএসিয়ায় প্রচলিত ব্যবস্থার প্রভাব ছিল কিনা, অথবা জার্মানদের আক্রমণের ফলে ইউরোপের সামন্তপ্রথার উদ্ভবে যে বাহ্য প্রভাব পড়েছিল, হুণ ও গুর্জরদের আক্রমণের ফলে ভারতেও অনুরূপ প্রভাব পড়েছিল কিনা তা নিতান্তই অনুমানের বিষয়।

উচ্চ তিন বর্ণের সেবক বা দাসরূপে গৃহীত শূদ্রগণ গুপ্তযুগ থেকে ক্রমশ কৃষকে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল এবং জাত কৃষকগণ ক্রমশ অর্ধভূমিদাসে পরিণত হচ্ছিল। এই রূপান্তর ভারতীয় সামন্তবাদের আর্থিক দিকটির বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত করে। প্রথমটির ইঙ্গিত পাওয়া যায় হুয়েন স্যাঙের বিবরণীতে, সেখানে শূদ্রদের কৃষক বলা হয়েছে। প্রায় চার শতাব্দী পরে অলবেরুনীও এই তথ্যকে সমর্থন করেছেন।

মধ্যযুগের প্রথম দিকে ভারতীয় কৃষকদের অবনতির কারণের অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল গ্রামবাসীদের উপর করভার বৃদ্ধি। গাহরওয়াল অনুদানপত্রে ১১ প্রকার করের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি সরকার কর্তৃক এই সকল-প্রকার কর আদায় করা হত, তা হলে কৃষকদের জীবিকানির্বাহের জন্য কিছু বাঁচত কিনা সন্দেহ। দানগ্রহীতাকে এই সকল কর আদায়ের অধিকার ত হস্তান্তর করা হতই, তা ছাড়া অতিরিক্ত কর ধার্য করার এবং উচিত অনুচিত কর আরোপ ও আদায় করার অধিকারও তাদের দেওয়া হত। বহু অনুদানপত্রে—যেমন পাল অনুদানপত্রে করের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হত না এবং গ্রহীতাকে অন্যান্য কর আদায়ের অধিকার দেওয়া হত, সেগুলি 'আদি', 'সর্বায়সমেত' অথবা 'সমস্তপ্রত্যায়' ইত্যাদি শব্দের মধ্যে উহ্য থাকত। এর থেকেই বোঝা যায় তারা নতুন নতুন কর আরোপের সুযোগ পেত। কৃষকগণ সরকারকে রাজস্বরূপে যা কিছু দিত, অনুদান দেওয়া হলে সেই রাজস্বই গ্রহীতাকে প্রদত্ত হত কররূপে এবং এই-সকল ব্যক্তিগত অনুদানভোগীদেব অথবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের আয়ের কোনো অংশই কররূপে দাতাকে দিতে হত না।

কৃষকদের অবনতির দ্বিতীয় কারণ বেগারপ্রথা। মৌর্যযুগে ক্রীতদাস ও ভাড়াটে শ্রমিকদের কাছ থেকেই বেগার আদায় কবা হত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সকল শ্রেণীর প্রজাদের কাছ থেকেই বেগার আদায় করা হত। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে প্রথম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রদত্ত অনুদান 'বিষ্টি'র প্রচলনের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলাদেশ ও বিহারে কৃষকগণ সর্বপ্রকার অত্যাচারের (সবপীড়া) শিকার হত এবং পালদের দ্বারা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদত্ত গ্রামগুলিই একমাত্র এই সর্বপীড়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেত। শাসকসর্দারগণ সময় সময় বেগার আদায় করতেন, কিন্তু, এই অধিকার দানগ্রহীতার হাতে চলে গেলে তা নিশ্চিতরূপে আরো ভয়ানক হয়ে উঠত, কারণ দানগ্রহীতা গ্রামের আয়ের সকল উৎসগুলি পরিপূর্ণভাবে শোষণ করার জন্য বেগারপ্রথার পূর্ণ সুযোগ নিত।

অনুদানভোগী দানলব্ধ জমি পুনরায় দান করার যে অধিকার ভোগ করত, তাই হল কৃষকদের অবনতির তৃতীয় কারণ। গ্রহীতাকে এই অধিকার দেওয়া হত যে অনুদত্ত ভূমি সে নিজে ভোগ করতে পারবে, অথবা অন্যকে ভোগ করতে দিতে পারবে, ভূমি নিজে চাষ-আবাদ করতে পারবে অথবা অন্যকে দিয়ে চাষ-আবাদ করাতে পারবে। মধ্যযুগের আরম্ভকালের কিছু ধর্মশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে রাজা ও প্রকৃত জমিচাষীর মধ্যে জমির উপর কোনো না কোনো প্রকার অধিকার রাখে এমন চারটি শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। শিলালিপি থেকেও এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া

যায়। নিজে চাষ করা অথবা অন্যকে দিয়ে চাষ করানোর অধিকারের মধ্যে কৃষককে উৎখাত করার অধিকারও অন্তর্নিহিত আছে। মালব, গুজরাট, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রে পঞ্চম শতাব্দী থেকে নিয়ে ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রথা সুপ্রচলিত ছিল। ফলে কৃষকদের স্থায়ী অধিকার দুর্বলতর হয়ে পড়েছিল এবং জমিদার ইচ্ছা করলে তাদের উৎখাতও করতে পারত এবং পরিণামস্বরূপ কৃষকগণ খেতমজুরে পরিণত হয়ে যেত। উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল কিনা তা স্পষ্ট জানা যায় না বটে, তবে মনে হয় ঘনবসতিপূর্ণ আবাদ এলাকায় এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আদিবাসী অধ্যুষিত অনুন্নত অঞ্চলে কৃষকগণ চাষ-আবাদ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার অধিকারী ছিল না। মধ্যভারতের কোনো-কোনো অংশে, বিশেষ করে কাঙড়া ও উড়িষ্যায় এমন বহু গ্রামদান করা হয়েছিল, যেখানে অনুদত্ত গ্রামের অধিবাসী শিল্পী, রাখাল এবং চাষীদেরও মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় ভূমিদাসের মত দানগ্রহীতার হাতে সমর্পণ করা হয়েছিল। শ্রমিকের অভাবের ফলেই প্রাচীন অর্থব্যবস্থাকে কায়েম রাখার জন্য এইরূপ প্রথার প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয়।

গ্রামবাসীদের সার্বজনীন সামাজিক অধিকার হরণ করে তা দানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করার ফলেই কৃষকগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। বহুক্ষেত্রে অনুদত্ত গ্রামের সীমা নির্ধারিত করে দেওয়া হত না, দানগ্রহীতা সেই সুযোগে নিজ ভূসম্পত্তি বাড়িয়ে নিত। তা ছাড়া পতিত জমি ঝাড়জঙ্গল, গোচারণভূমি, গাছগাছালি, জলাশয় ইত্যাদি দানগ্রহীতাকে হস্তান্তরিত করা হলে, দানগ্রহীতা ঐগুলি ব্যবহারের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করত। উপরোক্ত সার্বজনীন ব্যবহারযোগ্য সম্পত্তির উপর রাজার অধিকার স্বীকৃত ছিল, কিন্তু এগুলি হস্তান্তরিত হলে তা দানগ্রহীতার ব্যক্তিগত অধিকারে পরিণত হত এবং গ্রামবাসীদের প্রথাগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হত। গ্রামের ভূমির উপর গ্রামবাসীদের যে প্রথাগত অধিকার ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় গুপ্তযুগে। এইযুগে বাংলাদেশে গ্রাম্যসমাজের অনুমতি ব্যতীত ভূমি বিক্রয় করা যেত না। পালগণও গ্রামবাসীদের সম্মতি ছাড়া ভূমি অনুদান দিতেন না। এইভাবে গ্রামবাসীদের প্রথাগত অধিকারসমূহ দানগ্রহীতাকে হস্তান্তরিত করার ফলে, কৃষকদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং ভূসম্পত্তির একটি নূতন স্বত্বের জন্ম হয়েছিল।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে রাজা অথবা ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানভোগী স্বার্থের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার সেবা আদায় করতে পারতেন। পরিণামে কৃষকগণ আর্থিক দিক থেকে তাদের পরিত্রাণ পাবার কোনো রাস্তাই খোলা ছিল না।

কিন্তু কৃষকদের দীনদরিদ্রে পরিণত করার এই প্রক্রিয়া তাদের মধ্যে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার কোনো পরিচয় ভূমি অনুদানপত্রে অথবা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য সেযুগে অধিকাংশ সাহিত্যই ছিল রাজসভার সাহিত্য। তবু কিছু রচনা থেকে দুটি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়—প্রথম, গ্রামবাসীগণ কর্তৃক গ্রাম পরিত্যাগ, এই প্রথাটি সুপ্রাচীন কারণ, জাতকেও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সুভাষিতরত্নকোষে' ষষ্ঠ শতাব্দীর জ্যোতির্যাচার্য বরাহমিহিরের একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত হয়েছে। সেটিতে এমন সব জনশূন্য গ্রামের দশা বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে ভোগপতির[১] অত্যাচারে গ্রাম থেকে পলায়িত কৃষকদের ভগ্ন জীর্ণ গৃহের দেয়ালগুলি মাত্র অবশিষ্ট ছিল। বাণকৃত হর্ষচরিতেও ভোগপতির অত্যাচারের উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে 'বৃহন্নারদীয়পুরাণে' বলা হয়েছে যে দুর্ভিক্ষ ও কর-ভারে পীড়িত গ্রামবাসীগণ সমৃদ্ধতর স্থানে চলে যেত।[২] কিন্তু কৃষকগণ অধিবাসী-সহ অনুদত্ত গ্রাম থেকে পলায়ন করতে পারত না, কারণ দানগ্রহীতা আইনসঙ্গত-ভাবে তাদের বাধা দিতে পারত। শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পূর্ববঙ্গে, যেখানে কৈবর্তরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। এতাবৎ এই ঘটনাকে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে বর্ণিত করা হয়েছে অথবা জনগণের সম্মতি নিয়ে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ন্যায্য শাসকের বিরুদ্ধে উপদ্রব বলে বর্ণিত করা হয়েছে। কিন্তু কৈবর্তদের সেবাবৃত্তিরূপে প্রদত্ত জমি বেদখল করা[৩] এবং তাদের উপর করের বোঝা[৪] চাপিয়ে দেওয়ার কথা স্মরণ করলে তবেই ঐ বিদ্রোহের তাৎপর্যটা সম্যক বোঝা যায়। বিদ্রোহের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে এই সকল উলঙ্গ (আক্ষরিক অর্থে) মহিষারোহী সৈনিকগণ তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করেছিল।[৫] স্পষ্টতঃই এই বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই বিদ্রোহী যোদ্ধাগণ সাধারণ কৃষক ছিল। রামপালের বিরুদ্ধে বিফল বিদ্রোহের নায়ক ভীমের সেনাদলে একটিও রথ ছিল না।[৬] তবু এই বিদ্রোহ এত সাংঘাতিক রূপ নিয়েছিল যে তাকে দমন করার জন্য রামপালের নিজ সেনা ও শক্তি-সামর্থ্য পর্যাপ্ত না হওয়ায়, তিনি

১। ডি. ডি. কোসাম্বি ও ভি. গোখলে সম্পাদিত, শ্লোক ১১৭৫
২। পি. এইচ. শাস্ত্রী সম্পাদিত, পৃঃ ৩৮
৩। এ. ই. xxix, ৫
৪। রামচরিত ii, ৪০
৫। ঐ, ৩৯-৪৩
৬। ঐ, ৪০

নিজ সামন্তদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ এটি ছিল পালদের বিরুদ্ধে কৃষকবিদ্রোহ এবং পালরাজাগণ নিজ সামন্তদের সাহায্য নিয়ে কৈবর্তদের পরাভূত করেছিলেন। কিন্তু কেবল কৃষকবিদ্রোহের উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না, কারণ কৃষকদের দিক থেকে এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার আর বিশেষ কোনো দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। সম্ভবতঃ শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকগণ কর্তৃক গ্রাম পরিত্যাগই ছিল একমাত্র প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মধ্যযুগের প্রারম্ভকালে স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থায় কৃষকগণ জমির সঙ্গে আবদ্ধ থাকায়, গ্রাম পরিত্যাগও সকল ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া অন্যত্রও অনুরূপ আর্থিক পরিস্থিতি এবং অনুরূপ রাজনৈতিক সংগঠন থাকায়, কৃষকগণ অন্যত্র বসবাস করলেও দুর্ভাগ্যের হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ ছিল না।

দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত স্বনিভর আর্থিক এককের উপরই সামন্তীয় ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল। মুদ্রার অব্যবহার, পরিমাপের ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিমাপ ব্যবস্থাব প্রচলন, রাজা ও সামন্তগণ কর্তৃক শিল্প-ব্যবসায়ের নগদ ও বস্তুগত আয় মন্দিরকে হস্তান্তর, এই সমস্ত বিষয়গুলি আর্থিক এককের সাক্ষ্য বহন করে। পালগণ প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রচারিত কোনো মুদ্রা পাওয়া যায় নি। গুর্জর, প্রতীহার এবং রাষ্ট্রকূটদের সম্পর্কেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। চাহমান ও সেনদের দলিলদস্তাবেজে মুদ্রার উল্লেখ আছে বটে কিন্তু অদ্যাবধি তাদের কোনো মুদ্রা পাওয়া যায় নি। মধ্যযুগের প্রারম্ভে মুদ্রার কিরূপ প্রচলন ছিল এবং তৎকালীন সমাজে তাদের প্রভাবই বা কিরূপ ছিল এ সবই অনুসন্ধানের বিষয়। আমরা যতটুকু জানি তার ভিত্তিতে এইটুকুই বলা যায় যে ১১শ শতাব্দী থেকে পশ্চিম ও মধ্য ভারতে মুদ্রার পুনঃপ্রচলন হয়েছিল। সম্ভবতঃ শিল্প-ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবন এবং বিষ্টিপ্রথার বিলোপই এর কারণ। কিন্তু এই অঞ্চল বা এইকালকে বাদ দিলে দেখা যায় যে স্থানীয় আবশ্যকতা স্থানীয়ভাবেই মেটানো হত এবং এই কারণে কৃষক ও শিল্পীদেরকে গ্রামেই আবদ্ধ রাখা হত। কখনও কখনও অনুদানপত্রে এই ব্যবস্থাও রাখা হত যার দ্বারা করদাতা কৃষক ও শিল্পীদের অন্যস্থান থেকে নিয়ে অনুদত্ত গ্রামে বসানো যেত না। অনুদত্ত গ্রামের আর্থিক জীবন অনুদানের ফলে যাতে বিপর্যস্ত না হয়, তার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। মঠ ও মন্দিরও বৃহৎ অর্থনৈতিক এককরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের মধ্যে কোনো-কোনোটির অধীনে শতাধিক গ্রাম ছিল। স্পষ্টতঃই কোনো গ্রাম শস্য, কোনো গ্রাম বস্ত্র এবং অন্যান্য গ্রাম গৃহসংস্কারের জন্য শ্রমিক সরবরাহ করত অথবা এমনও হতে পারে প্রত্যেক গ্রামই কিছু-কিছু পরিমাণে ঐ সকল বস্তু সরবরাহ করত।

প্রারম্ভিক ভারতীয় সামন্তবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ

ছিল। প্রথমতঃ ভূমি অনুদানের ফলে মধ্যভারত, উড়িষ্যা ও পূর্ববঙ্গে বহু পতিত জমি আবাদযোগ্য হয়েছিল। উদ্যমী ও সাহসী ব্রাহ্মণদের নিয়োগ করে অনুন্নত ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ চাষবাসের নূতন প্রক্রিয়া প্রচলন করা সম্ভব হয়েছিল। পুরোহিতগণ কর্তৃক সমর্থিত কিছু মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও রীতিনীতি উপজাতীয় অধিবাসীদের আর্থিক উন্নতিব সহায়ক হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ গোহত্যাকে নরহত্যার তুল্য জঘন্য অপরাধরূপে বিধান দেওয়ায়, গোধনরক্ষায় সুফল পাওয়া গিয়েছিল। চাষ-আবাদের জন্য গোরু যে কত উপকারী তা সর্বজনবিদিত। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণ আদিবাসীদের হল ব্যবহার ও সার ব্যবহার ত শিখিয়ে-ছিলেনই, তা ছাড়া নক্ষত্র, ঋতু ও বর্ষার আগমন সম্বন্ধীয় তথ্যাদি সম্বন্ধে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে কৃষির উন্নতি হয়েছিল। এই বিষয়ে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সম্ভবতঃ এইকালেরই রচনা 'কৃষি-পরাশর'[১] গ্রন্থে সংকলিত আছে। বসতিপূর্ণ এলাকায় ধর্মীয় অনুদানভোগীকে এমন জমিদান কবা হত, যেখানে আগে থেকেই চাষ-আবাদ হত। অনুদানভোগীরা সেখানে সাধারণেব মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যবস্থাব প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগাতে চেষ্টা করতেন। দ্বিতীয়তঃ, ভূমি অনুদানের ফলে অনুদত্ত ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হত কারণ অনুদানভোগীকেই তার নিজস্ব এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দেওয়া হত। দাতার অনুগ্রহেব প্রতিদানে কোনো-কোনো কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ পূর্ব-মধ্যযুগীয় রাজাদের জাল বংশলতিকা প্রস্তুত করে রাজাদের চন্দ্র বা সূর্যবংশীয় প্রমাণিত করে, তাঁদের দৈবী মহিমাকীর্তন করতেন। অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানভোগী সামন্তগণ নিজ নিজ জায়গীরের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং যুদ্ধকালে প্রভুর জন্য সৈন্যসংগ্রহ করে সাহায্য করতেন। তৃতীয়তঃ, ভূমি অনুদানের ফলে উপজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রসার ঘটেছিল। এই সংস্কৃতি তাদের লিপি, শিল্প, সাহিত্য এবং উন্নত জীবনযাত্রার সন্ধান দিয়েছিল। এই দিক থেকে সামন্তবাদ জাতীয় সংহতির সহায়ক হয়েছিল। ব্রাহ্মণগণকে তাদের আদি বাসভূমি মধ্যপ্রদেশ ও তীরভুক্তি থেকে ভূমি অনুদান ভোগ করবার জন্য বাংলা, উড়িষ্যা ও মধ্যভারতে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। ফলতঃ এই সকল অঞ্চল একই সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে সংহত হতে পেরেছিল। ভূমি অনুদানের ফলে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সংস্পর্শে আসা বিভিন্ন উপজাতিকে ব্রাহ্মণ্যসমাজের মধ্যে স্থান করে দেওয়ার ফলে চারি বর্ণ থেকে অসংখ্য জাতি ও বর্ণসংকরের (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুযায়ী এই সংখ্যা ১০০) উৎপত্তি হয়েছিল। এইভাবে ভূমি অনুদান নতুন ক্ষেত্র আহরণে, নতুন নতুন জনসংখ্যাকে বর্ণব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত

১। জি. পি. মজুমদার ও এস. সি. ব্যানার্জী অনুদিত ও সম্পাদিত, পৃঃ ৮

করায় সাহায্য করেছিল এবং ফলতঃ সারা দেশে একই প্রকার সামাজিকব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। কিন্তু বিপরীতপক্ষে ভূমি অনুদানের ফলে কায়েমিস্বার্থের উদ্ভব এবং তার ফলে রাজনৈতিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছিল। দেশের বিশালতা এবং যাতায়াতেব অসুবিধার জন্য রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষা করা রাজার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল। কালক্রমে ব্রাহ্মণ ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকগণ বিশেষ বিশেষ এলাকায় সংঘবদ্ধ হয়ে স্থানীয় সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ দেশে আঞ্চলিকতাবাদের উদ্ভব হয়েছিল।

ভারতীয় সামন্তবাদেব কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের ইউরোপীয় সামন্তবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। পুরোহিতদেব ভূমি অনুদান দেওয়ার প্রথাব সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপে গির্জাকে জায়গীরদানের প্রথাব তুলনা চলে। পার্থক্য শুধু এই যে ভারতে মন্দির বা ব্রাহ্মণগণ ইউরোপের গির্জার মত কোনো সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগীয় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ জায়গীর প্রদানের প্রথা ততটা ব্যাপক ছিল না; যতটা ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপে। রাজপদাধিকাবীদেব ভূমিবৃত্তি দেওয়া হত বটে, কিন্তু তাদেব অধীনস্থ প্রশাসনিক ক্ষেত্রেব একটি ক্ষুদ্র অংশই তাদেব বৃত্তিরূপে দেওয়া হত। এই বৃত্তি ইউরোপীয় জায়গীব বা 'ম্যানর' (তালুক) কোনোটার সঙ্গেই তুলনীয় নয়, সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত গ্রামগুলি এগুলিরই সঙ্গে তুল্য হতে পারে। তা ছাড়া ভারতীয় সামন্তদের নিজ প্রভুকে শুধু সামরিক সাহায্যই প্রদান করতে হত, ইউরোপের মত তাঁরা এখানে প্রশাসনিক কার্যে কোনো সাহায্য প্রদান করতেন না। তথাপি ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানেও বর্তমান ছিল। এ দেশও আর্থিক দিক থেকে ছোট ছোট স্বনিভর এককে বিভক্ত ছিল—ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের অভাবই এর কারণ বলে মনে হয়। এখানেও এক শক্তিশালী ভূম্যধিকারী মধ্যবর্তীব আবির্ভাব হয়েছিল, কৃষকগণ ক্রমশ তাদের অধীনে দাসরূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল।

প্রশ্ন উঠেছে যে ভারতীয় সামন্তবাদ নূতন ও একবারই সংঘটিত, নাকি এটি নূতন বোতলে পুরাতন মদ্যের তুল্য।[১] ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে যে আমরা সামন্তবাদ বলতে কি বুঝি। যদি রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণকেই সামন্তবাদ বলে গ্রহণ করি, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে ভারতে বৃটিশ শাসনের পূর্বে বহুবার সামন্তবাদের অভ্যুদয় হয়েছিল। কিন্তু সামন্তবাদকে যদি আমরা একটা সামাজিক ব্যবস্থারূপে

১। এস. সি. সরকার, 'কোয়ার্টার্লি রিভিউ অব হিস্টোরিক্যাল স্টাডিজ' iii, (১৯৬২-৬৩)

দেখি, তা হলে কৃষকদের উপর এবং তাদের জমির উপর উচ্চতর অধিকারপ্রাপ্ত সম্পদশালী ব্যক্তিদের দ্বারা সমস্ত উদ্বৃত্ত ফসল দখল করার যে ব্যবস্থা আমরা লক্ষ করি, সেটি গুপ্তযুগের পূর্বে ভারতে কখনও দেখা যায় নি। ঋগ্বেদের যুগে পুরোহিতগণ সমর্থিত উপজাতীয় সর্দারগণ মুখ্যত যুদ্ধে লুণ্ঠিত বস্তুর দ্বারাই জীবনযাপন করত। উত্তর বৈদিককাল এবং বেদোত্তরকালে সরকার ও পুরোহিত কৃষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফসলের অংশ এবং শূদ্রের নিকট হতে বিভিন্ন প্রকার সেবা গ্রহণ করতেন। রাজ্যসমূহ প্রচুর সংখ্যক মুদ্রা জারী করেছিল, তাই নগদ আদায় করা সহজ হয়েছিল। তাঁরা ক্রীতদাস এবং ভাড়াটে শ্রমিকদের সেবাও ভোগ করতেন, এদের কাছ থেকে বেগার আদায় করা হত এবং এদের উৎপাদনের কাজে লাগান হত।[১] কিন্তু গুপ্তকাল থেকে তারা তাঁদের জন্য নির্ধারিত ভূমিরাজস্বের উপরই নির্ভর করতেন এবং ৮ম শতাব্দী থেকে প্রত্যক্ষভাবে জমির উপরই নিভর করতে লাগলেন। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর পাঁচ শতাব্দী ধরে কৃষক ও শিল্পীগণ, ভূম্যধিকারী মন্দির, পুরোহিত, সর্দার, সামন্ত ও রাজপদাধিকারীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে গিয়েছিল, এরূপ অবস্থা পূর্বে ভারতে কখনও হয় নি। এই সময়ে ভূম্যধিকারীর মধ্যবর্তীবর্গ রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উভয় দিক থেকেই এমন সমৃদ্ধ হয়েছিলেন যা পূর্বে কখনও হয় নি। প্রাক্‌মুসলিম মধ্যযুগকে ভারতীয় সামন্তবাদের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। কারণ মুসলমানগণ ব্যাপকহারে নগদ দানপ্রথার[২] সূত্রপাত করলে কৃষকসম্প্রদায়ের উপর ভূম্যধিকারীদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ল। ভূমির উপর উচ্চতর অধিকার থাকায় এবং বেগার আদায় করার অধিকারী হওয়ায়, সামন্তগণ কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসল গ্রহণ করতে পারত, খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলিতে অথবা ভারতে তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা কোনো সময়ই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু আমাদের আলোচ্যকালের সামন্তবাদের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য। এইকালের সমগ্র রাজনৈতিক ছকটি ভূমি অনুদানের ভিত্তি করেই দাঁড়িয়েছিল এবং ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় শ্রেণীর অনুদানভোগীই নিজেদের কায়েমিস্বার্থের জন্য সামন্ততন্ত্র রক্ষায় তৎপর ছিলেন এবং তার জন্য অনুরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধেই শুধু নয় এমন কি কৃষকবিদ্রোহের সম্মুখীন হতেও প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু ভারতীয় সামন্তবাদকে বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়েছিল।

১। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা লেখক 'শূদ্রজ ইন এনিসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া'র পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ও ইনকোয়ারী নং ৪-এ প্রকাশিত 'স্টেজেজ ইন এনিসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান ইকনমি' প্রবন্ধে করেছেন।

২। মুরল্যাণ্ড —'এগ্রেরিয়ান সিস্টেম অফ মুসলিম ইণ্ডিয়া' পৃঃ ২০৪-৫

গুপ্তযুগ এবং পরবর্তী দুই শতাব্দীতে মন্দির ও ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের সূত্রপাত হয় এবং পাল, প্রতীহার ও রাষ্ট্রকূটদের রাজ্যে এইরূপ অনুদানের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং তার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হতে থাকে। প্রাথমিকযুগে অনুদানভোগীকে কেবল ভোগাধিকার দেওয়া হত, কিন্তু ৮ম শতাব্দী থেকে তাদের স্বত্বাধিকারও দেওয়া হতে থাকে। ১১শ ও ১২শ শতাব্দীর অনুদানে এই প্রথা চরম সীমায় পৌঁছেছিল। এই সময়ে উত্তর ভারত বহু খণ্ড খণ্ড রাজনৈতিক এককে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এই এককগুলি প্রধানতঃ ধর্মীয় বা গৃহস্থ অনুদানভোগীর অধীনস্থ ছিল। এই অনুদানভোগীগণ ইউরোপীয় 'ম্যানর' অপেক্ষা কিছু বেশি অধিকারই ভোগ করতেন তাঁদের দানলব্ধ গ্রামে। কিন্তু পশ্চিম ও মধ্য ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার, মুদ্রার ক্রমবর্ধমান প্রচলন, 'বিষ্টি'প্রথার বিলোপ ইত্যাদির ফলে প্রাচীন সামন্তবাদের অবক্ষয় ঘটেছিল।

পরিশিষ্ট ১

মধ্যযুগীয় উড়িষ্যায় ভূমিব্যবস্থা

(আনুমানিক ৭৫০—১২০০ খ্রীঃ)

মধ্যযুগের প্রথম দিকে উড়িষ্যায় পনের বা ততোধিক রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটেছিল, এদের মধ্যে অনেকগুলি সমসাময়িককালেই রাজত্ব করেছিলেন। যাতায়াতের অসুবিধা এবং উড়িষ্যায় পাহাড় পর্বতময় পরিবেশ ছোট ছোট রাজবংশের উদ্ভবের অনুকূল হয়েছিল। রাজ্যের স্বাধীনতাপ্রিয় উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রজাদের সাহায্যেই রাজবংশগুলি স্থায়িত্বলাভ করত। স্থানীয় সর্দারদের দ্বারা ভঞ্জ ও তুঙ্গের অনুরূপ বহু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, যাঁরা ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে নিজেদের সম্মানীয় ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত করেছিলেন। এই প্রথা কিছু পরিমাণে এখনও উড়িষ্যার প্রতিবেশী অঞ্চলে ছোটনাগপুরে প্রচলিত। পার্বত্য এলাকার এই সকল শাসকগণ সমুদ্র তটবর্তী সমতল অঞ্চলের শাসকদের অধীনতা স্বীকার করতেন বটে, কিন্তু তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল এবং সারা প্রদেশে ছোট ছোট শাসকাধীন খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এই শাসকগণ সামন্ত, রাজপদাধিকারী, মন্দির এবং বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের ভূমি অনুদান দিতেন। ফলে ভূমি আরও খণ্ডিত হয়েছিল। বাংলা ও বিহারের তুলনায় উড়িষ্যায় সমকালে তাম্রপত্রে অঙ্কিত ভূমি অনুদানের সংখ্যা সর্বাধিক এবং সাধারণ কৃষকদের উপর এই সকল ধর্মীয় ও গৃহস্থ অনুদানভোগীদের চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানভোগীরা ছিলেন সামন্ত ও রাজপদাধিকারীবৃন্দ। সামন্তদের প্রদত্ত ভূমি অনুদানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুব কম পাওয়া গেলেও, তাঁদের সম্পর্কে অনুদানপত্রে প্রযুক্ত পদবীগুলি ভূম্যধিকারী সামন্তের সূচক। যেমন ভূপাল শব্দটির শাব্দিক অর্থ ভূমির পালনকর্তা, হতে পারে এরা বৃহৎ ভূম্যধিকারী ছিলেন। কেবলমাত্র তাঁরাই খিজিঙ্গের ভঞ্জদের দ্বারা ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে জারী করা অনুদানপত্রে ভূমিলাভ করেছিলেন। উপজাতীয় রাজ্যটি হয়তো কতকগুলি স্থানীয় এককের সমষ্টি ছিল এবং প্রত্যেক একক একজন উপজাতীয় সর্দারের (সংস্কৃত উপাধি ভূপাল দ্বারা ভূষিত) অধীনে থাকত এবং ঐ সর্দারই ঐ অঞ্চলের প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করত। এই সময় সম্ভবতঃ খিজিঙ্গের ভঞ্জদের রাজ্যে রাজপদাধিকারী ও অন্য রাজপুরুষদের কোনো স্থান ছিল না, যাদের উল্লেখ আমরা বহু অন্যান্য অনুদানপত্রে পাই। মনে হয় ভঞ্জদের রাজ্যে কিছুকাল ভোগী ও সামন্তগণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন।

কারণ বিদ্যাধর ভঞ্জদেবের একটি অনুদানপত্রে কেবল এই দুটি শ্রেণীর রাজপুরুষেরই উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] ভৌমকর ও ভঞ্জ অনুদানপত্রে ভোগী শব্দের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। কখনও কখনও ভোগী শব্দের অর্থ করা হয়েছে গ্রাম প্রধান। কিন্তু গ্রামপ্রধানকে মহত্তব বলা হত এবং তারা মহামহত্তরের অধীনে থাকত।[২] কিন্তু ভোগী শব্দের শাব্দিক অর্থ থেকে মনে হয় যে সম্ভবতঃ রাজ্য থেকে প্রাপ্ত জমির জন্য ভোগীকে কোনো খাজনা দিতে হত না। সম্ভবতঃ প্রশাসনিক কার্যের পরিবর্তেই এইরূপ জায়গীর দেওয়া হত। বিদ্যাধর ভঞ্জদেবের অধীন ভঞ্জরাজ্যে এইরূপ জায়গীরের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে প্রাচীন প্রজাদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হয়েছিল। একটি শ্রেণীতে ছিল রাজসবকাব দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত বিষয়গুলির (জেলা) প্রজাগণ, অন্য শ্রেণীতে ছিল ভোগীকে জায়গীররূপে প্রদত্ত অঞ্চলের প্রজাগণ।[৩] সোমবংশীয় শাসকদেব অধীনস্থ ভোগীদের একটি বিশিষ্ট শ্রেণী ছিল, যাদের ভোগিজন আখ্যা দেওয়া হত।[৪] তা ছাড়া ভোগিরূপের সাক্ষাৎও পাওয়া যায়।[৫] সাধারণভাবে ভোগীরূপের অর্থ ভোগীব অংরূপ, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ভোগীব তুলনায় এঁরা কম অধিক'রপ্রাপ্ত ছিলেন। মনে হয় রাজস্বব্যবস্থাব সঙ্গে ভোগীগণ সম্পৃক্ত ছিলেন এবং ভৌমকরের অধীনস্থ কিছু ভোগী 'মহাক্ষপটলিক' বা 'মহালেখাপালে'র অর্থাৎ প্রধান হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন এবং অনুদানপত্র প্রস্তুতের যাবতীয় কাজ তাঁরা করতেন।[৬] উচ্চতর ভোগীকে মহাভোগী আখ্যা দেওয়া হত। এঁদের উল্লেখ একটি অজ্ঞাতনামা শাসক পবিবারের জারী করা অনুদানপত্রে পাওয়া যায়।[৭] কিন্তু ভৌমকর অনুদানপত্রে উচ্চতর ভোগীর অর্থে 'বৃহদ্ভোগী' শব্দেব বহুল উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[৮] এই অধিকারীগণকে গ্রামপ্রধানরূপে গ্রহণ করা হয়েছে[৯] কিন্তু আমাদের মতে এরা উচ্চতর শ্রেণীর ভোগীই ছিলেন, কারণ সাধারণ ভোগী অপেক্ষা এদের অধীনে অনেক বেশি গ্রাম ছিল। ভৌমকর অনুদানপত্রে ভোগী ও বৃহদ্ভোগী উভয়েরই

১। এ. ই. ix, নং ৩৭, প ১৭
২। ঐ xv, নং ১, প ১-১০
৩। 'ভাগ্যাদিবিষয়জনপদম্' এ. ই. ix, নং ১৩, প ১৬-৭
৪। ই. হি. কোয়া. xxxv, নং ২, বালিখারি (নরসিংহপুর) তাম্রপত্র, প ৩৬
৫। এ. ই. xxviii, ৩২৩
৬। বিনায়ক মিশ্র, 'মিডাইভ্যাল ডাইনেস্টিজ অফ ইণ্ডিয়া' উড়িষ্যা' পৃঃ ১০২-৩০, নং ১২, এ. ই. xv. নং ১, প ৩৩-৪, জা. বি. ও রি. সো. ii, ৪২৩-৭, প ৪০-২
৭। মিশ্র—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৪-৫, শিলালিপি নং ১
৮। ই. হি. কোয়া. xxi, ২২১, প ২৭-৪০
৯। ঐ, ২১৭

বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে।[১] অতএব এ কথা বলা চলে যে উড়িষ্যায় ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধিশালী ভূম্যধিকারী যথেষ্টই ছিল।

সামন্ত ও মহাসামন্তের মধ্যে কয়েকটা স্তর বর্তমান ছিল। এই স্তর সম্ভবতঃ ভূমি অনুদান এবং প্রভুকে কে কি পরিমাণ সামরিক সাহায্য প্রদান করতে পারে, তার উপর নির্ভর করত। ভৌমকর এবং তাদের অধীনস্থ সর্দারদের রাজ্যে এই সামন্ত ও মহাসামন্তদের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। তুঙ্গবংশীয় একজন সর্দার একটি অনুদানপত্রে কেবল সামন্তকেই সূচনা দিয়েছেন[২] যার দ্বারা অনুমিত হয় যে রাজকার্যে কেবল তাদেরই প্রাধান্য ছিল। নন্দবংশের তৃতীয় দেবানন্দের (নবম শতাব্দীর শেষকালে) জন্য প্রযুক্ত মহাসামন্তাধিপতি পদবী উচ্চতর ছিল। তিনি কারও অনুমতি ছাড়াই স্বেচ্ছায় ভূমি অনুদান দিতে পারতেন।[৩] তিনি সামন্ত ও মহাসামন্তকে জায়গীর দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু খিজিঙ্গে ভঞ্জ শাসকগণ যে মহাসামন্ত, বট্টকে গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন, তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে।[৪] বট্টের পিতা মুণ্ডি একজন সাধারণ সামন্ত মাত্র ছিলেন।[৫] কিন্তু পুত্র উচ্চতর স্থান অধিকার করেছিলেন এবং পিতার জায়গীরের বিস্তার করেছিলেন। আমাদের কাছে এমন কোনো শিলালৈপিক প্রমাণ নেই যার সাহায্যে বলা যায় যে সামন্তদের ভূমি অনুদান দেওয়া হত। পরবর্তীকালে সামন্তগণ যে উড়িষ্যায় ভূম্যধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন তার কারণ এ-ও হতে পারে যে মধ্যযুগের প্রারম্ভে তাঁরা যেসকল জায়গীর পেয়েছিলেন তার ফলেই তাঁদের এই প্রতিষ্ঠা।

ভূস্বামীদের একটি শ্রেণীকে 'রাণক' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এঁরা সম্ভবতঃ রাজাকে সামরিক সাহায্য প্রদান করতেন। এঁরা 'রাজন্যকে'র সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন।[৬] এই 'রাজন্যক'গণ মূলতঃ রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন; ভঞ্জদের অধীনে এঁরা নিজেরাই[৭] একটি শ্রেণী কায়েম করেছিলেন। এদের[৮] সম্বন্ধে উপজীবিজন শব্দটি প্রযুক্ত হওয়ায় মনে হয় তাঁরা রাজার দয়াদাক্ষিণ্যে পালিত হতেন। কালক্রমে এমন সব সামন্তগণও 'রাণক' শ্রেণীভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যারা রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন না, অথচ ভূমি অনুদান

১। এ. ই. xix, ৮৫-৬
২। জা. এ. সো. বে. (নব পর্যায়) xii (১৯১৬) ২৯১
৩। এ. ই. xxvi, ৭৭
৪। জা. এ. সো. (নব পর্যায়) xl, নং ৩, ১৬৬-৮
৫। ঐ, ১৬৮
৬। 'স্ববংশসমুত্থবাশেষরাজন্য' 'ব' বর্গ; এ. ই. xviii, নং ২৯, প ১৭-৮
৭। ঐ
৮। এ. ই. iii, নং ৪৭, প্লেট 'এক', প ২৮-৪২

পেয়েছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ রাণক যাঁর পিতামহ শ্রাবস্তী থেকে চলে এসে. এখানে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন, তাঁকে সোমবংশীয় রাজা মহাভবগুপ্ত (১০০০-১৫) একটি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[১] কোনো-কোনো রাণককে যে একটি গ্রামেরও বেশি ভূমিদান করা হত তার পরিচয় আমরা গঙ্গ-শাসক বজ্রহস্তের (১০৩৮-৭০) অধীনস্থ জনৈক রাণক দ্বারা প্রদত্ত গ্রাম অনুদান থেকে পাই।[২] তাঁর অধীনে একাধিক গ্রাম না থাকলে, তিনি গ্রাম অনুদান দিতে পারতেন না। এই শ্রেণীর সামন্তগণ বড় বড় প্রশাসনিক পদ পেতেন। বিশেষ করে সোমবংশীয় রাজাদের অধীনে এঁরা অনুদানপত্র প্রবর্তক[৩] মহাক্ষপটলিক[৪] মহাসান্ধিবিগ্রহিক[৫] ইত্যাদি পদলাভ করতেন। সোমবংশীয় রাজ্যে সামন্তীয় শ্রেণীবিন্যাসে এদের স্থান রাজ্ঞী ও রাজপুত্রের মাঝখানে ছিল।[৬] রাজ্ঞীদের সম্ভবতঃ নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। ভৌমকরদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল; কারণ তাঁদের বংশে ৬জন মহিলা শাসক হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ রাজপুত্রদেরও নিজস্ব জায়গীর ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য যে একজন রাজপুত্রকে বজ্রহস্তের কোনো বড় আমলা যৌতুকস্বরূপ একটি করমুক্ত গ্রামদান করেছিলেন।[৭] রাজপুত্রদের পর আসে রাজবল্লভদের স্থান।[৮] এরাও রাজানুগ্রহপুষ্ট ছিলেন এবং মনে হয় তৎকালীন প্রথানুযায়ী এদেরও গ্রামানুদান দিয়ে পুরস্কৃত করা হত।[৯]

উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী আমরা যেসকল সামন্ত, ভূস্বামীর উল্লেখ পাই তাঁরা হলেন ভূপাল, ভোগী. ভোগিরূপ, মহাভোগী, বৃহদ্ভোগী, সামন্ত, মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি, রাজ্ঞী, রাণক বা রাণক, রাজপুত এবং রাজবল্লভ। মনে হয় এঁদের সকলকেই কিছু-কিছু সামরিক দায়িত্বপালন করতে হত। এঁদের জীবিকানির্বাহ হত রাজসরকার থেকে প্রাপ্ত ভূমি অনুদান থেকে এবং সম্ভবতঃ প্রাপ্ত ভূমির রাজস্বের উপরই এঁদের অধিকার ছিল। বিভিন্ন পর্যায়ের এই সামন্তদের মধ্যে কার স্থান উচ্চে এবং কার নিম্নে তা সঠিকভাবে জানার কোনো উপায় নেই।

১। এ. ই iii, নং ৪৭, প্লেট 'এক' প ২৮-৪২
২। ঐ, নং ৩১, পৃঃ ২২২
৩। মিশ্র, 'ডাইনেষ্টিজ অফ মিডাইভ্যাল ওড়িষ্যা' পৃঃ ১০২-৩, শিলালিপি নং ১২
৪। ঐ, পৃঃ ১৭, শিলালিপি নং ১০
৫। ঐ, পৃঃ ৬৬-৭
৬। এ. ই. iii, নং ৪৭, প্লেট 'এক' প ৩৩-৪
৭। ঐ, নং ৩১, প ৯-১৫
৮। ঐ, নং ৪৭, প্লেট 'এক' প ৩৩-৪
৯। সুপ্র, পৃঃ ২৭৭

কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে প্রতিবেশী প্রদেশগুলির তুলনায় উড়িষ্যায় ভূম্যধিকারীর সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং এদের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট।

রাজপদাধিকারীদের অধীনেও বেশ কিছু গ্রাম ছিল। তাঁরা রাজ-সেবার পরিবর্তে এই সকল গ্রামের আয় ভোগ করতেন। সোমবংশীয় রাজা প্রথম মহাভবগুপ্ত (৯৩৫-৭০) তিনটি ভূমি অনুদানপত্রে নিজ ব্রাহ্মণ মহামাত্য সাধারণকে কৌশলে চারিটি গ্রামদান করেছিলেন।[১] নন্দরাজ তৃতীয় দেবানন্দ (৮৯১) নিজ কায়স্থ মহাসান্ধিবিগ্রহিককে কটক জেলায় একটি গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[২] খিজ্জলীর দুই ভঞ্জ শাসকের (এঁরা দুই সহোদর ছিলেন) মধ্যে প্রত্যেকে ১২শ শতাব্দীর উত্তরার্ধে এক জ্যোতিষীকে একটি করে গ্রাম দিয়েছিলেন।[৩] সেন ও গাহরওয়াল রাজপুরুষদের তালিকায় জ্যোতিষীর স্থান অতি উচ্চে ছিল এবং সম্ভবতঃ খিজিঙ্গের ভঞ্জদের অধীনেও রাজার বিভিন্ন কাজকর্মের শুভক্ষণ নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষী নিযুক্ত করা হত এবং তার পরিবর্তে তাঁকে ভূমি অনুদান দেওয়া হত। নিতান্তই বৈষয়িক প্রয়োজনে গঙ্গশাসক অবন্তিবর্মণ চোড়গঙ্গ (১০৭৬-১১৩৮) নিজ বিশ্বাসী পদাধিকারী (আপ্তক্রিয়ায়) চোড়গঙ্গকে কলিঙ্গ অঞ্চলে একটি কুটিরসমেত গ্রামদান করেছিলেন।[৪]

সামরিক পদাধিকারীগণকে প্রদত্ত অনুদান থেকে আমরা গঙ্গ অনুদানের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাই। এই অধিকারীগণকে নায়ক[৫] বলা হত এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বৈশ্যজাতীয় ছিলেন। গঙ্গ সালের ৫২৬তম বৎসরে অনন্তবর্মণের পুত্র মধুকামার্নব দ্বারা জারী করা একটি অনুদানপত্র[৬] অনুসারে তিনটি গ্রামের এক বৈশ্য অগ্রহার প্রতিষ্ঠা করে, বৈশ্যজাতীয় মচিনায়কের পুত্র এরপনায়ককে অনুদানরূপে প্রদত্ত হয়েছিল।[৭] শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অনুদানকে অগ্রহার বলা হত, কিন্তু সামরিক পদাধিকারীর কাছ থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজ প্রত্যাশা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সামরিক সেবার প্রতিদান হিসাবেই এইরূপ অনুদান দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। অবন্তিবর্মণ চোড়গঙ্গের একটি শিলালিপি থেকেও একজন নায়ককে অনুদান দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি নিজ

১। এ. ই. iii, নং ৪৭ 'বি' প ৪-৫ সি, প ৪-৫
২। ঐ xxvi, নং ২৬, প ১৯-৫৮
৩। ঐ xviii, নং ২৯, প ১৯-২৯, xix, ৪৩, পাদটীকা ১
৪। ঐ iii, পৃঃ ১৭৪, প ৩০-৪
৫। ম'দ্রাজ রিপোর্ট অফ এপিগ্রাফি, ১৯১৮-১৯, পরিশিষ্ট 'এ' নং ৩
৬। ঐ, নং ৫
৭। ঐ

আশ্রিত মাধবকে একটি করমুক্ত গ্রাম অনুদান দিয়েছিলেন।[১] উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, তার সংখ্যা কিন্তু বেশি নয়। তবু এইকালে বিহার ও বাংলার অনুরূপ উদাহরণের যেসব উদাহরণ পাওয়া যায় তাব থেকে এগুলি সংখ্যায় বেশি। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে মধ্যযুগীয় উড়িষ্যার সামরিক ও অসামরিক পদাধিকারীগণকে বৃত্তিস্বরূপ গ্রাম অনুদান দেওয়া হত এবং সেই সঙ্গে এইরূপ অনুদান সামরিক সাহায্য প্রদানকারী সামন্তদেরও দেওয়া হত।

১২ ও ১৩ শ্রেণীর সামন্ত এবং রাজপদাধিকাবীদেব তুলনায় তিনশো ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত অনুদানেব প্রমাণ পাওয়া যায়।[২] এঁদেব মধ্যে অধিকাংশকে সম্ভবতঃ বাইরে থেকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। কিন্তু ভঞ্জ অনুদানপত্রে ব্রাহ্মণদেব সূচনা দিতে দেখা যায়, কিন্তু ভৌমকব, তুঙ্গ, সোমবংশীয় এবং গঙ্গদের সকল অনুদানপত্রে ব্রাহ্মণদেব কোনো সূচনা দেওয়া হয় নি। এব কারণ এই হতে পারে যেসকল অঞ্চলে এইরূপ অনুদান দেওয়া হয়েছিল, সেই সকল অঞ্চলে হয়ত ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল না, অথবা তাদেব সংখ্যা সেখানে এত অল্প ছিল যে অনুদানপত্রে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছিল। গ্রহীতাদেব তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে তাঁরা প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ, তীবভুক্তি, রাঢ, বঙ্গ ও ববেন্দ্র থেকে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।[৩] উড়িষ্যার অনুদানপত্রে উল্লিখিত ঐ মধ্যপ্রদেশ যে বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল, এইরূপ একটি মতও প্রচলিত আছে। যাই হোক না কেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না যে এই অঞ্চল উড়িষ্যারই অঙ্গ ছিল। কিন্তু অনুদানপত্র থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না যে ব্রাহ্মণদের বাহিব থেকে আহ্বান করে আনা হয়েছিল বটে, তবে কিছুকাল তাঁরা ওড্রতে অবস্থান করেছিলেন[৪], সেখান থেকে তাঁদেরকে উড়িষ্যায় অন্যান্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

সাধারণতঃ একটি অনুদান একজন ব্রাহ্মণকেই দেওয়া হত, কিন্তু কখন-কখন একটি অনুদান দুই থেকে দুইশত ব্রাহ্মণকেও দেওয়া হত। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের শাসনকর্তা ভৌমকর রাজা শুভাকরদেব উত্তর তোসলীতে দুটি

১। ই. এ. xviii, ১৭১. প ১০৯-১৩
২। এই সংখ্যা মিশ্রের গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৩৪ সালে পুস্তকটি প্রকাশিত হবার পর উড়িষ্যায় আরও দুটি অনুদানপত্র পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তার ফলে ধর্মীয় ও ধর্ম নিরপেক্ষ অনুদানের অনুপাতে কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না।
৩। মিশ্র—পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১
৪। ঐ

গ্রামকে সংযুক্ত ক'রে, সেই অঞ্চল বৈদিক পরম্পরাগত বিভিন্ন গোত্রীয় দুইশত ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন।[১] এই অনুদানটি পূর্ববঙ্গের লোকনাথ কর্তৃক একশত ব্রাহ্মণকে সংযুক্তভাবে একটি অনুদানপত্রদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[২] এখানে ভূমিদানের দ্বারা আর্যীকরণ পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। উড়িষ্যায় এই প্রক্রিয়ার প্রচলন ব্রাহ্মণ রাজাগণ আরম্ভ করেছিলেন যেমন তুঙ্গ এবং গঙ্গগণ। গয়াড়তুঙ্গের পূর্বপুরুষগণ সাহাবাদ জেলান্তর্গত রোহতাস নামক স্থান থেকে উড়িষ্যায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[৩] ইনি বহিরাগত ব্রাহ্মণদের তালচের অঞ্চলে বহু ভূমিদান করেছিলেন। একটি অনুদানপত্রে তিনি অহিচ্ছত্রা থেকে আগত এগারজন ব্রাহ্মণকে একটি গ্রামের উর্বর জমিদান করেছিলেন।[৪] অন্য একটি অনুদানপত্রে তিনি একটি গ্রাম তিনজন ব্রাহ্মণের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই ব্রাহ্মণগণ বরেন্দ্র থেকে এসেছিলেন, কিন্তু এঁদের পূর্বপুরুষগণ মূলতঃ শ্রাবস্তীর অধিবাসী ছিলেন।[৫] এইভাবে এই ব্রাহ্মণ রাজবংশ উড়িষ্যায় অনেক ব্রাহ্মণ ক ভূস্বামীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অনুরূপভাবে সম্ভবতঃ গঙ্গও নিজ রাজ্যের তেলেগুভাষী অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন।

ব্রাহ্মণদের ভূমি অনুদানের গুরুত্বের কথা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। তারা এই অঞ্চলে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন জ্ঞান নিয়ে এসেছিলেন, যার দ্বারা এখানকার চাষ-আবাদের প্রণালীর পরিবর্তন হয়েছিল। তা ছাড়া এরা এখানকার আদিবাসীদের ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত করেছিলেন। ফলে হিন্দু রাজাদের শাসনকার্য পরিচালনা সহজতর হয়েছিল, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অধিক সংখ্যায় কর্মচারীর আর প্রয়োজন হত না। এই সাহায্যের পরিবর্তে ব্রাহ্মণগণ ভূমিরাজস্ব-বিষয়ক অধিকার লাভ করেছিলেন এবং ভূস্বামীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

রাজার কাছ থেকে দানগ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত রাজস্ব-বিষয়ক অধিকারগুলি সর্বত্র একপ্রকার ছিল না। অনুন্নত ও উন্নত এলাকার মধ্যে পার্থক্য ছিল। ভঞ্জ সোমবংশীয় ও গঙ্গদের অধীনস্থ বন্যপ্রদেশেও ভূমি অনুদান দেওয়া হয়েছিল। খিঞ্জলীর যশোভঞ্জদেব গাছপালা, ঝোপঝাড় এবং জঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে পাটিকোমান (স্পষ্টতঃই কোনো আর্যেতর উপনিবেশ) নামক একটি গ্রামদান করেছিলেন এবং

১। এ. ই. xv, নং ১, প ১-৩০
২। ঐ, নং ১৯, প ৩৫-৫০
৩। জা. এ. সো. বে. (নব পর্যায়) xii, ২৯২
৪। ঐ v, ৩৪৭, প ২২-৩, ৩৩-৫
৫। ঐ xii, ২৯৩-৪, প ২২-৩২

তিনি গ্রহীতাকে মাছ ও কচ্ছপ ধবার অধিকারও দিয়েছিলেন।[১] স্পষ্টত ই এই গ্রামটি জঙ্গল পরিবেষ্টিত ছিল। ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে উড়িষ্যা ও দক্ষিণ কোশলে শাসন করতেন সোমবংশীয় রাজা চতুর্থ মহাভবগুপ্ত। তার প্রদত্ত একটি অনুদানপত্র পাওয়া যায়। এই অনুদানপত্রে তিনি 'অহিদণ্ড' ও 'হস্তিদণ্ডে'র অর্থাৎ সাপ ও হাতি মারার অধিকারসহ দুটি গ্রামদান করেছিলেন।[২] সম্ভবতঃ প্রদত্ত অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যায় হাতি পাওয়া যেত, কারণ যে অঞ্চলে গ্রামদুটি অবস্থিত তাকে ঐরাবট্টমণ্ডল বলা হত।[৩] এই অঞ্চলে সাপ ও হাতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিখ্যাত শববগণ বাস কবত।[৪] জায়গীর (উপভোগ) রূপে দুই ভাইকে প্রদত্ত অনুদানে ভবিষ্যতে আরোপযোগ্য কর (ভবিষ্যৎ-কর) সম্বন্ধীয় অধিকারও অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৫] ভবিষ্যৎ-কর ভবিষ্যতে রাজার দ্বারা আরোপযোগ্য কর, না কি দানগ্রহীতা কর্তৃক আরোপযোগ্য কর, সেটা স্পষ্ট জানা যায় না। দ্বিতীয়টি ঠিক হলে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে রাজা তাদের এক অসাধারণ অধিকার প্রদান করেছিলেন, যার সাহায্যে তারা গ্রামবাসীদের একেবারে কৃষিদাসে পরিণত করতে পারত। সোম-বংশীয় শেষ রাজা সোমেশ্বরদেবের একটি অনুদানপত্রে বনপ্রদেশের অনুরূপ কিছু নতুন রাজস্বসংক্রান্ত অধিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি দুটি গ্রাম থেকে কয়েকখণ্ড জমি (খণ্ড ক্ষেত্র) অনুদান দিয়েছিলেন। জমির সঙ্গে সঙ্গে হস্তিদান, ব্যাঘ্রচর্ম ও নানা প্রকার বন্যপশু এবং তৎসহ তাল, তেঁতুল বৃক্ষাদির উপর অধিকারও দেওয়া হয়েছিল।[৬] উক্ত তিনটি অনুদানপত্রে অনুদত্ত ক্ষেত্রের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। ফলে গ্রহীতার পক্ষে নিজ অধিকারভুক্ত অঞ্চল বৃদ্ধি করা খুব সহজ ছিল। কিন্তু গঙ্গরাজ অনন্তবর্মণের একটি অনুদানপত্রে অনুদত্ত গ্রামের বন, বৃক্ষ ও পাহাড় বেষ্টিত সীমা নির্দেশ কবা হয়েছে।[৭] স্পষ্টতঃই এলাকাটি বনভূমি ছিল। এই অনুদানে কোনো শর্ত আরোপ করা হয় নি, কিন্তু অন্য অনুদানের শর্ত থেকে স্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে অনুন্নত এলাকায় গাছপালা, জঙ্গল, চামড়া, মাছ ইত্যাদি ভূমিরাজস্বের উৎস ছিল।

১। এ. ই. xviii, নং ২৯, প ১৬ ২২
২। জা. বি. ও. রি. সো. xvii, ১, প ২৯-৪৯
৩। ঐ, প ৩৭-৪৯
৪। ঐ, প ১৮-২১
৫। ঐ, প ৩৭-৪৯। কেবল একটি গ্রামের অনুদানের শর্তাবলীর উল্লেখ আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ দ্বিতীয় গ্রামের অনুদানেও অনুরূপ শর্ত ছিল।
৬। এ. ই. নং ৫৩, প ৩ ৮
৭। ঐ iii, নং ৩, প ১৮-২২

উন্নত এলাকায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে দাতা বিভিন্ন প্রকার করের সঙ্গে শুধু গ্রামই নয়, উপরন্তু সেই সঙ্গে গ্রামবাসী তাঁতি, শুঁড়ী, রাখাল এবং অন্য প্রজাদের (প্রকৃতঃ) গ্রহীতার হাতে সমর্পণ করতেন। ভৌমকর রাজাগণ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রায় এক শতাব্দী ধরে অনুদানের এই প্রথাটি অনুসরণ করেছিলেন।[১] তাঁদের সামন্ত ভঞ্জ[২] এবং তুঙ্গগণও অনুরূপ প্রথায় অনুদান দিয়েছিলেন। গ্রহীতাকে[৩] হস্তান্তরিত প্রজাদের মধ্যে তাঁতী ও শুঁড়ীর উল্লেখ থেকে মনে হয় যে মদ্য প্রস্তুত করা এবং বস্ত্র বয়ন করা সেযুগের গ্রামে অনিবার্য ব্যবস্থা ছিল। তা ছাড়া রাখালের হস্তান্তর থেকে পশুপালনের গুরুত্ব অনুমান করা যায়। গ্রহীতাকে হস্তান্তরিত করা অন্যান্য শিল্পী কারিগরগণ সম্ভবতঃ 'প্রকৃতঃ' শব্দটির অন্তর্ভূত ছিল। শিল্পী ও কৃষকদের স্পষ্টতঃ গ্রহীতার হাতে সমর্পণ করার ফলে প্রতীয়মান হয় যে তারা জমির সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল[৪] এবং গ্রহীতার অত্যাচার সত্ত্বেও তারা স্থানত্যাগ ক'রে অন্য স্থানে যেতে পারত না, যদিও এইরূপ জমির কোনো অভাব ছিল না। ১২শ শতাব্দীর একটি চন্দেল শিলালিপিতেও অনুরূপ ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়—এক্ষেত্রেও দানগ্রহীতাকে, কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের হস্তান্তরিত করা হয়েছিল।[৫] উড়িষ্যার এই প্রথা ব্যাপকরূপে এবং দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ শ্রমিকের অভাবই এর কারণ। কিন্তু এইরূপ অনুদানের ফলে সম্ভবতঃ কৃষকেরা ভূমিদাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল ভোগ করত ব্রাহ্মণেরা। এই দানগ্রহীতার মধ্যে অনেককেই 'সগুল্মকে'র অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। পণ্ডিতদের মতে এটি শিকার করবার অধিকার।[৬] কিন্তু মনুস্মৃতির[৭] প্রয়োগ থেকে জানা যায় যে গুল্ম ছিল রাজা কর্তৃক গ্রামে স্থাপিত সামরিক ঘাটি। এই ঘাটিসমেত দানই 'সগুল্মক' দান। অপরাধীকে দণ্ডদানের উপায়টি গ্রহীতার হস্তগত হওয়ায়, তার পক্ষে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও আত্মনির্ভর গ্রামীণ ব্যবস্থা কায়েম রাখা সহজ হয়েছিল। ভূমির উপর সার্বজনীন

১। এইচ. পি. শাস্ত্রী, 'সেভেন কপারপ্লেট রেকর্ডস্ অফ ল্যাণ্ড গ্রান্টস্ ফ্রম ঢেনকানল—ডি-গ্রাণ্ট অফ ত্রিভুবন মহাদেবী' জা. বি. ও. রি. সো ii, ৪২৬-৭, প ২৪-৩২

২। 'সনন্তবায় গোকুল শৌণ্ডি (ডি) কালি প্রকৃতি…' ঐ, জা. বি. ও. বি. সো. xvi, ৮১-৩, প '৮-২৪ ; এ. ই. xxix, ৮৫-৬ ; ই. হি. কোয়া. xxi, ২২১, প ২৮-৩৮

৩। এ. ই. xxv, নং ১৪, প ১২-২০

৪। জা. বি. ও. রি. সো. vi, ২৩৯, ১১৫-৬

৫। 'সকারু কর্ষক বণিগ্বাস্তব্যম্।' এ ই. xx, নং ১৪, 'বি' প্লেট, প ১৯ (সম্প্রতি 'ভারতী'তে ডঃ ডি. এম. এস. মিশ্র কর্তৃক প্রকাশিত মদনবর্মণের একটি অনুদানপত্রের ভিত্তিতে সংশোধিত পাঠ।)

৬। এইচ. পি. শাস্ত্রী, ঐ ii, ৪২৬-৭

৭। ৭, ১১৪

অধিকারের ক্রমহ্রাসও লক্ষ্য করা যায়। দাতা গ্রহীতাকে গাছপালা, ঝাড়-জঙ্গল, নদী-নালা ইত্যাদিও দান করে দিতেন।[১] পূর্বে এই সকল সম্পদের উপর সার্বজনীন অধিকার ছিল, অবশ্য গ্রামবাসীগণ তাদের এই অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। কিন্তু এই সকল সম্পদ একবার দানগ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত হলে দানগ্রহীতা যে গ্রামবাসীদের বিনা শুল্কে এইগুলি ভোগ করতে দিত না, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উত্তরপ্রদেশে এই প্রথা ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সেখানে স্থানীয় প্রধানরা কাঠ কাটার জন্য কর আদায় করত।[২] তা ছাড়া বন্যভূমি আবাদ করাও এখন আর গ্রামবাসীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিপরীতপক্ষে দানগ্রহীতার পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা পতিত জমি উদ্ধার করে, সেগুলি ভোগ করত।[৩] এইভাবে পতিত জমিচাষ করার অধিকার থেকে কৃষকগণ সম্ভবতঃ বঞ্চিত হয়েছিল। ফলে গ্রামের জমির বেশিরভাগটাই গ্রহীতাপরিবারের হস্তগত হয়ে যেত। তা ছাড়া দানগ্রহীতা দাতার নিকট থেকে ভূমি রাজস্ব-বিষয়ক অধিকারাদি প্রাপ্ত হওয়ায় কালক্রমে সেই জমির স্বত্বাধিকারীও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এইরূপ অবস্থা যে একমাত্র উড়িষ্যাতেই বর্তমান ছিল তা নয়; উত্তর ভারতে গ্রামবাসীগণের সমস্ত-প্রকার চাষ-আবাদ সংক্রান্ত অধিকারগুলি দানগ্রহীতাকে হস্তান্তর করাই মধ্যযুগীয় অনুদানের বৈশিষ্ট্য ছিল।

রাজার প্রাপ্য এবং পরে দানগ্রহীতাকে হস্তান্তরিত ভূমিরাজস্বের উৎসগুলির তালিকাটি দীর্ঘ। কিন্তু উৎপন্ন ফসলের কত অংশ দাবী করা হত এবং সেই অংশ কিভাবে নির্ধারণ করা হত, যে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। দুটি অনুদান থেকে অনুমান হয় যে কর নগদেই নির্ধারণ করা হত। একটিতে জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত সম্পূর্ণ গ্রামের রাজস্ব ৪৪ রূপক[৪] নির্ধারিত করা হয়েছিল এবং অপরটিতে নির্ধারিত করা হয়েছিল ৪২ রূপক।[৫] বাংলাদেশে নগদে রাজস্ব আদায়ের সূত্রপাত হয় ১১শ শতাব্দীতে সেনদের আমলে। কিন্তু মধ্যযুগের প্রারম্ভিককালে বাংলাদেশ অথবা উড়িষ্যাতে নগদ অর্থে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব ছিল কিনা সন্দেহ। মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি তৎকালে এতটা শক্তিশালী ছিল না যার দ্বারা নগদ অর্থে সব দেনা-পাওনা মেটানো সম্ভব হতে পারে।

ভূমি অনুদানের মোটামুটি ফল হয়েছিল এই যে এখানেও সামন্ততান্ত্রিক

১। এ. ই. xviii, নং ২৯, প ১৯-২২
২। বেডেন পাওয়েল—'ল্যাণ্ড সিস্টেম ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া', ১২৮-৯
৩। ঐ i, ১৭৩
৪। জা. এ. সো. বে. (নব পর্যায়) xii (১৯১৬), পৃঃ ২৯৫, প ২২-৩৬
৫। এ. ই xii, নং ২০, প ২৩-৮

পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, সাধারণ কৃষকদের মাথায় ভূস্বামীদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং এঁরা ছিলেন বহিরাগত ব্রাহ্মণ। এঁরা শুধু যে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের অধিকার কায়েম রাখাতেই সাহায্য করেছিলেন তাই নয়, ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রসারে এবং নীতি ও আদর্শগত দিক থেকে আদিবাসী প্রজাসমুদ্রের মধ্যে হিন্দু রাজাদের নোঙর ফেলতে সাহায্য করেছিলেন। কালক্রমে কিছু আদিবাসী সর্দারগণও এঁদের সামন্তে রূপান্তরিত হয়েছিল। মাঠরসর্দার পুঞ্জকে 'সমাধিগতপঞ্চমহাশব্দ' এবং 'মাণ্ডলিক রাণক' উপাধি প্রদান করা হয়েছিল।[১] তাঁকে পঞ্চদশ পল্লিকার অধিপতি বলা হত।[২] এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে তিনি তাঁর অধীনস্থ জমির মালিক ছিলেন। এই সকল সামন্তগণ অবশ্য ভূমি অনুদান প্রদানের অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু তাদের মধ্যে পুলিন্দবাজ নামক একজন এত প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি মন্দিরের ব্যয়নির্বাহ ও শৈব সাধুদের ভরণ-পোষণের জন্য ভৌমকর রাজা শুভাকরদেবকে (৯ম শতাব্দী) ভূমি অনুদান দিতে বাধ্য করেছিলেন।[৩] ভূম্যধিকারীদের একটি তৃতীয় শ্রেণীও ছিল, এঁরা ব্রাহ্মণদের অনুরূপ শর্তে সেবা-বৃত্তিস্বরূপ ভূমি অনুদান ভোগ করতেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ অনুদানভোগীব সংখ্যা ধর্মনিরপেক্ষ অনুদানভোগীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। রাজা এঁদের শুধু নিজের প্রাপ্য ভূমিরাজস্বের অধিকার হস্তান্তব করতেন না, তা ছাড়া ব্রাহ্মণ গ্রহীতাদের কৃষকদের জমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখার অধিকারও দিতেন। একদিকে তাঁদের এই অধিকার দেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে আবার গ্রামের সর্বজনীন ভোগ্য সম্পদগুলি হরণ করার অবাধ অধিকারও প্রদান করা হয়েছিল। মধ্যযুগীয় উড়িষ্যায় এই সকল ব্যবস্থাগুলি সামন্তবাদী ভূমিব্যবস্থার বিশিষ্ট লক্ষণের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু উড়িষ্যায় এই ভূমিব্যবস্থার উদ্ভব উত্তর ভারতের ন্যায় কোনো সুসংগঠিত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে হয় নি। এখানে অর্থব্যবস্থা আদিম উপজাতীয় রীতি পরম্পরার পটভূমিতে বিকশিত হয়েছিল। এই আদিম অধিবাসীদের মাঝখানে বহিরাগত ব্রাহ্মণগণকে ভূস্বামী-রূপে প্রতিষ্ঠা করে আদিবাসীদের হিন্দু জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছিল।

১। ডি. সি. সরকার, হি. কা. ই. পি. ৮, ২০৯
২। ঐ
৩। জা. বি. ও. রি. সো. xvi, ৮১-২, প ১৮-২৪

পরিশিষ্ট ২

পাল ও চন্দেল রাজ্যে দুর্গরক্ষিত উপনিবেশ

মধ্যযুগের সুরুতেই দেশে বহু ছোট ছোট সামন্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এরা পরস্পরের এলাকা দখল করার সুযোগ সন্ধান করত। ফলে গ্রামগুলির রক্ষার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। গ্রামপ্রতিষ্ঠার বিস্তারিত নিয়ম নির্দেশাদি সম্ভবতঃ প্রথমে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। গ্রাম পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে দিয়ে কৌটিল্য গ্রামের সুরক্ষার দায়িত্ব বাগুরিক, পুলিন্দ ইত্যাদি আদিবাসীদের হাতে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু গ্রামে দুর্গপ্রতিষ্ঠার কথা কোথাও বলেন নি। বাণভট্টের রচনায় কয়েকটি গ্রামের বর্ণনাও পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির কোনোটাই দুর্গরক্ষিত নয়। পরবর্তীকালে 'মানসার' গ্রন্থে আট প্রকার গ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে একপ্রকার গ্রামকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত দেয়াল এবং গভীর ও প্রশস্ত পরিখা-বেষ্টিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] ঐ গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে গ্রামের দেয়াল বেষ্টনীতে চারটি প্রবেশ দ্বার থাকা বিধেয়।[২] পরে ময়মতও বলেছেন যে গ্রাম পরিখা ও দুর্গপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকা উচিত।[৩] মানসারে দুর্গের বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনা মোটের উপর সেযুগে দুর্গের গুরুত্বের পরিচায়ক। এই গ্রন্থের এক-স্থানে আট প্রকার দুর্গ, অন্যস্থানে সাত প্রকার এবং পুনরায় তিন প্রকার পার্বত্য দুর্গের অর্থাৎ মোট আঠারো শ্রেণীর দুর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪] এই সমস্ত প্রমাণ-গুলি পর্যালোচনা করলে স্বীকার করতে হয় যে মানসারের প্রণয়নকাল দুর্গ রচনারই কাল ছিল। এই গ্রন্থে প্রদত্ত নির্দেশগুলি কতদূর পালিত হত তা অবশ্য আমরা জানি না। ভূমি অনুদানপত্রে গ্রামের সীমা নির্দেশ করতে গিয়ে দুর্গ প্রাচীরের কোথাও কোন উল্লেখ করা হয় নি। স্পষ্টতঃই মানসারে বিশেষ শ্রেণীর গ্রামেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রামগুলি হয় রাজার দ্বারা নিযুক্ত স্থানীয় শাসনকর্তার কেন্দ্র ছিল, অথবা স্থানীয় সামন্ত বা সর্দারদের শক্তিকেন্দ্র ছিল। সম্ভবতঃ এইগুলির মধ্যে কিছু গ্রাম পরবর্তীকালে সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত হয়েছিল।

মানুষের তৈরি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে সমগ্র উত্তর ভারতে

১। পি. কে. আচার্য, মানসার সিরিজ vi, ১০২

২। ঐ, ১০২-৩

৩। ৯, ৬০

৪। ঐ, ১০৪

অসংখ্য মধ্যযুগীয় দুর্গ আজও দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এবার পাল ও চন্দেল রাজ্যের দুর্গ সংরক্ষিত স্থানগুলির মোটামুটি বিবরণী দেব।[১] পুরাতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে আমরা পালদের দুর্গগুলির সম্বন্ধেই বেশি জানি। মুঙ্গের ও তৎসংলগ্ন ভাগলপুর, পাটনা ও গয়ায় পালযুগের বহু দুর্গের দেখা পাওয়া যায়। গঙ্গার দক্ষিণদিকে মুঙ্গেরের মুদ্গগিরি নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ কেল্লাটি অবস্থিত। এটি সম্ভবতঃ পালদের বিজয় স্কন্ধাবারের একটি ছিল এবং সম্ভবতঃ রাজধানীও ছিল। প্রতিবেশী অঞ্চলেও অনেকগুলি দুর্গ আছে। মুঙ্গেরের সদর সাবডিভিসনের রামপুর ও পোখরামা গ্রামদুটি পালযুগের দুর্গরক্ষিত গ্রাম বলে মনে হয়। ঐ অঞ্চলেই লক্ষ্মীসরাইয়ের নিকট জয়নগরের দুর্গ অবস্থিত। এটি সম্ভবতঃ পালরাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী ছিল।[২] সেখান থেকে কিছুটা দূরে সুরজগড়ার দুর্গ ছিল। এই স্থানটি অবশ্য এখন গঙ্গাগর্ভে বিলীন, তবু এখনও পালযুগীয় কিছু ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়।[৩] জামুই সাবডিভিসনে ইন্দপেব কেল্লাটি এখনও বর্তমান, আর দেয়ালগুলি এবং পরিখা এখনও পূর্ববৎ আছে; এই দুর্গটিও রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের ছিল, এইরূপ একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।[৪] গঙ্গার উত্তরে মুঙ্গেরে জওলাগড়, জয়মঙ্গলাগড় ও আলৌলীগড়; এই তিনটি দুর্গ ছিল।

ভাগলপুর জেলাতেও বেশ কয়েকটি পালযুগীয় দুর্গ দেখা যায়। এই জেলার পশ্চিমপ্রান্তের শেষে সুলতানগঞ্জের দুর্গ অবস্থিত। এখানে পালযুগের বহু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। একেবারে পূর্বপ্রান্তে কহলগাওয়ের নিকটবর্তী অন্তিচকে একটি দুর্গ ছিল। বটেশ্বরথান থেকে দেড় মাইল দূরবর্তী অন্তিচকে সাম্প্রতিক খননকার্যের দ্বারা বটপর্বতকের তিনটি সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। পাল অনুদানপত্রে বটপর্বতককে একটি বিজয় স্কন্ধাবার বলা হয়েছে এবং পণ্ডিতদের মতে আধুনিক বটেশ্বরথানই সেযুগে বটপর্বতক নামে খ্যাত ছিল। অন্তিচকের দুর্গপ্রাকার প্রায় আড়াই মাইল দূর পর্যন্ত বিস্তৃত—তাই দেখে অনুমিত হয় যে বটপর্বতকের স্কন্ধাবার দুর্গরক্ষিত স্থান ছিল এবং আন্তচকের সম্পূর্ণ এলাকা তারই অন্তর্ভূক্ত ছিল। তা ছাড়া এখান থেকে একজন রাণকের (রাণক শ্রীদেবন্ত)

১। যদিও প্রারম্ভিক মধ্যযুগীয় প্রত্যেক রাজবংশের উপর গবেষণা করে গবেষকগণ ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন, কিন্তু কোনো গবেষণানিবন্ধে প্রাসঙ্গিক রাজবংশের অধীনস্থ দুর্গরক্ষিত উপনিবেশগুলির বিবরণ দেওয়া হয় নি।

২। এ. রি. বি. নং ২১০

৩। ঐ, নং ৪২৭

৪। ঐ, নং ১৯০

মোহরও পাওয়া গিয়েছে।[১] মনে হয় দুর্গটির তত্ত্বাবধায়ক কোনো একজন রাণক ছিল। মনে হয় পাথরঘাটার পার্বত্য দুর্গটিও এর পাশেই অবস্থিত ছিল।[২] পাহাড়ের উপর নির্মিত শাহকুণ্ডের দুর্গটিও অনুরূপ পার্বত্য দুর্গ ছিল এবং মনে হয় এটিও পালদেরই কীর্তি। ভাগলপুরের প্রত্যন্তপ্রদেশে চম্পকনগর দুর্গ অবস্থিত ছিল। বুকানন বলেছেন যে তিনি সেখানে একটি পরিখাবেষ্টিত বর্গাকার দুর্গপ্রাকার দেখেছিলেন। তাঁর মতে এটি পালযুগের।[৩]

গয়া জেলায় পালযুগের অন্ততঃ পাঁচটি ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। দাউদ নগরের নিকটবর্তী আমৌনাতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের শিলালিপি[৪] পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে একটি মাটির কেল্লা আছে, যেটি সম্ভবতঃ পালযুগের। আবার কুকিহারে ইষ্টকনির্মিত একটি কেল্লার ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং সেখানে পালযুগের পুরাবস্তুও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে।[৫] যেসব তামার বস্তুগুলি পাটনা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্পষ্টতঃই এটি পালদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ ছিল। এ ছাড়া আরও তিনটি দুর্গের উল্লেখ করা যায়। প্রথম, ধররৎ দুর্গ—এখানে বহু বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে।[৬] দ্বিতীয়, কিউর এবং তৃতীয় অফসদ। অফসদে আদিত্যসেনের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে।[৭]

পালদের অন্যান্য দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাটনা জেলায় দেখতে পাওয়া যায়। পাটলিপুত্র নগরই পালদের একটি বিজয় স্কন্ধাবার ছিল। মনে হয় পালদের সময় পাটনা দুর্গরক্ষিত নগর ছিল এবং মুসলমানদের আমল পর্যন্ত এই নগরী প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল।[৮]

পালদের মাত্র ৯টি বিজয় স্কন্ধাবারের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দেলদের ২১টি স্কন্ধাবার ও রাজশিবিরের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯] এ কথা মনে করা খুব অসঙ্গত হবে না যে এই সবগুলিই দুর্গ ছিল। অন্ততঃ সাতটি শিবির সম্পর্কে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। সেই সাতটি শিবির হল, খজুরবাহক, বারিদুর্গ, জয়পুর বা নন্দিপুর

১। এই সকল তথ্যের জন্য আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিভাগের ফিল্ড ডাইরেক্টার ডঃ আর. সি. পি. সিংহের প্রতি কৃতজ্ঞ।

২। এ রি. বি., নং ৩০৩

৩। ঐ, নং ১০০

৪। ঐ, নং ১২

৫। ঐ, নং ২৬২

৬। ঐ, নং ১৪০

৭। ক. ই. ই. iii, ২০০-১

৮। এ. রি. বি. নং ৩৫০ (iii)

৯। এস. কে. মিত্র—'দি আর্লি রুলার্স অফ খজুরাহো' পৃঃ ১৬৩-৪

(অজয়গড়), কীর্তিগিরি দুর্গ (দেবগড়), গোপালগিরি (গোয়ালিয়র), কালঞ্জর এবং সোম্ফি (সিউম্ফ দুর্গ-এখন কন্থরগড়)।[১] তা ছাড়া লোকশ্রুতি অনুসারে আরও আটটি দুর্গও চন্দেলদের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে আসছে, অবশ্য এই আটটির মধ্যে পূর্বোক্ত সাতটির তিনটি অন্তর্ভূত।[২] অতএব সব মিলিয়ে চন্দেলদের প্রায় দুই ডজন দুর্গ ছিল বলে মনে হয়। তাঁদের সবচেয়ে বেশি দুর্গ ছিল বুন্দেলখণ্ডে, অবশ্য এই অঞ্চলেই তাঁদের রাজ্যের অধিকাংশ ভাগ ছিল। চন্দেলদের রাজ্য আধুনিক ডিভিসনের চেয়ে বেশি বড় ছিল না (প্রকৃতপক্ষে তাদের রাজ্যভুক্ত অঞ্চলের নাম ছিল জেজাভুক্তি এবং ভুক্তির ক্ষেত্রফল বর্তমানকালে ডিভিসনের প্রায় সমান)। এই রাজ্যে মাত্র ১৬টি 'বিষয়' বা 'পত্তলা' ছিল।[৩] এদিক থেকে দেখলে তাঁদের রাজ্যে দুর্গের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্যই ছিল।

স্পষ্টতঃই চন্দেল দুর্গগুলি স্থানীয় সর্দারদের অধীনস্থ স্বয়ংশাসিত সামন্তীয় দুর্গ ছিল; উপরন্তু এগুলি কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় এবং তাদের শাসনাধীন রাখার জন্য সামরিক কেন্দ্র ছিল। মনে হয় প্রত্যেক দুর্গ একজন দুর্গাধিপ[৪] নামধেয় শাসকের অধীনে থাকত এবং তাঁর পদের নাম ছিল দুর্গাধিকার।[৫] কালঞ্জর এবং অজয়গড়ের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ দুর্গের সেনানায়ককে 'বিশিষ্ট' বলা হত এবং তাঁদের সেবার বেতন হিসাবে তাঁদের অন্ততঃ একটি করে গ্রাম অনুদান দেওয়া হত।[৬] সম্ভবতঃ চন্দেল রাজত্বের শেষকালে এঁরা সম্পূর্ণ সামন্তপ্রভুরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ১২শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে বৃটিশ রাজকীয় দুর্গের দুর্গরক্ষক সৈনিককে জমিদারীসমূহ সেবাবৃত্তিরূপে দান করা হত।[৭] চন্দেলদের অধীনস্থ রাজকীয় দুর্গের সেনানায়ককেই শুধু ভূমিবৃত্তি দেওয়া হত, কিন্তু দুর্গরক্ষী নিয়োগ ও বরখাস্ত করার দায়িত্ব তাঁর হাতে ছিল না। সম্ভবতঃ এই সকল সৈনিকদের ভরণ-পোষণ রাজার ব্যয়েই পরিচালিত হত। যাই হোক, চন্দেলরাজ্যে দুর্গের বাহুল্য ঐ রাজ্যের সামন্তীয় গঠনেরই ইঙ্গিত বহন করে।

অবশ্য পাল ও চন্দেলদের অধীনস্থ দুর্গের এই সামান্য আলোচনা থেকে কোনো

১। এস. কে. মিত্র—'দি আর্লি রুলার্স অফ খজুরাহো' পৃঃ ১৬৩-৪
২। ঐ, পৃঃ ৬-৮
৩। এস. কে. মিত্র তাঁর গ্রন্থের ১৬১-৩ পৃষ্ঠায় বিষয়কে পত্তলার অভিন্নরূপে গ্রহণ করে চন্দেল শিলালিপি অনুসারে ১৬টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।
৪। ঐ, পৃঃ ১৬০
৫। ঐ
৬। ঐ, পৃঃ ১৫৮-৯
৭। ফ্র্যাঙ্ক সেন্টন—'ইংলিশ ফিউড্যালিজম' ১০৬৬-১১৬৬, পৃঃ ২১২-৩

সাধাবণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। যদি আমরা মুসলমান শাসনের স্থাপনাব পূর্ববর্তী মধ্যযুগীয় শক্তিকেন্দ্রগুলিব ভূমিকাব প্রকৃতিস্বরূপ বুঝতে চাই, তা হলে বিভিন্ন বাজবংশেব দুর্গগুলিব পৃথক পৃথক আলোচনা কবতে হবে। তবু বাজনৈতিক ও আর্থিক সংগঠনেব দিক থেকে দুর্গগুলিব উপযোগিতাব কথা অস্বীকার কবা যায় না। মধ্যযুগীয় দুর্গগুলি বহু উদ্দেশ্যবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ছিল। এই দুর্গ আশেপাশেব গ্রামেব প্রযোজন পুবণ কবত, সেদিক থেকে এগুলি আধুনিক শহবেব কাজ কবত। বস্তুতঃ আদায়ীকৃত বাজস্বও এখানে গুদামজাত কবা যেত। দুর্গরক্ষী সৈনিকদেব ছাউনিও ছিল এখানে, তা ছাড়া যুদ্ধকালে বন্যায় (বিশেষ কবে পূর্ব-ভাবতে) এবং দুর্ভিক্ষব কলে প্রতিবেশীগণ এখানে অশ্রয় গ্রহণ কব.ত পাবত। সবোপবি এই স্থান থেকেই বাজা অথবা সদাব কৃষকদেব উপব নিজেব অধিকাব কায়েম রাখতে পাবতেন।

গ্রন্থপঞ্জী

ধর্মশাস্ত্র ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলী

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সম্পাঃ ও অনুঃ মার্টিন হগ্, ২ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৬৩।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, সম্পাঃ জি. বুলার, বোম্বাই, ১৯৩২।

অর্থশাস্ত্র অফ্ কৌটিল্য, সম্পাঃ আর. শ্যামশাস্ত্রী, ৩য় সং, মহীশূর, ১৯২৪ (উল্লেখ না থাকিলে বর্তমান গ্রন্থে মূলগ্রন্থরূপে ইহাই ব্যবহৃত হইয়াছে)। অনুঃ আর. শ্যামশাস্ত্রী, ৩য় সং, মহীশূর, ১৯২৯। টীকাসহ সম্পাঃ টি. গণপতি শাস্ত্রী, ৩ খণ্ড, ত্রিবান্দ্রম, ১৯২৪-২৫। সম্পাঃ জে. জলি ও আর. স্মিড্, ১ম খণ্ড, লাহোর, ১৯২৪।

অর্থশাস্ত্রের টীকাসমূহ

(১) **জয়মঙ্গলা** (অর্থশাস্ত্রের ১ম খণ্ডের শেষ পর্যন্ত—অংশবিশেষ বাদে), সম্পাঃ জি. হরিহর শাস্ত্রী, জে. ও. আর, xx—xxiii।

(২) **প্রতিপদপঞ্জিকা** (ভট্টস্বামী) (২য় খণ্ডের ৮ম অনুচ্ছেদের উপর) সম্পাঃ কে. পি. জয়সওয়াল ও এ. ব্যানার্জী-শাস্ত্রী, জে. বি. ও. আর. এস্, xi—xii।

(৩) **নয়চন্দ্রিকা** (মাধব যজ্জ্ব) (vii—xii খণ্ডের উপর) সম্পাঃ উদয়বীর শাস্ত্রী, লাহোর, ১৯২৪।

(৪) আচার্য্যযোগ্ঘম অপরনামে মুগ্ধবিলাস কর্তৃক **নীতিনির্ণীতি** নামক টীকার অংশসহ কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্র** অপরনামে **রাজসিদ্ধান্ত**-র অংশবিশেষ, সম্পাঃ মুনী জিন বিজয়, বোম্বাই, ১৯৫৯।

বার্হস্পত্যসূত্রম (অর্থশাস্ত্র), সম্পাঃ এফ্. ডব্লিউ. টমাস্, পাঞ্জাব সংস্কৃত সিরিজ, লাহোর, ১৯২২।

বৌধায়ন ধর্মসূত্র, সম্পাঃ ই. হালৎস্, লিপজিগ্, ১৮৮৪।

বৃহস্পতি স্মৃতি, সম্পাঃ কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার (এই মূলগ্রন্থ ১ম অনুচ্ছেদে অনুসরণ করা হইয়াছে। অন্যান্য অনুচ্ছেদে জলির সংস্করণ অনুসরণ করা হইয়াছে) জি. ও. এস্, lxxxv, বরোদা, ১৯৪১।

বৃহৎ-পরাশর সংহিতা, বোম্বাই, ১৯১১।

গৌতম ধর্মসূত্র, সম্পাঃ এ. এস্. স্টেনসলার, লণ্ডন, ১৮৭৬। মস্করী কৃত টীকাসহ সম্পাঃ এল. শ্রীনিবাসাচার্য, মহীশূর, ১৯১৭।

কামন্দকীয় নীতিসার, সম্পাঃ আর. এল্. মিত্র, বি. আই., কলিকাতা, ১৮৮৪, অনুঃ এম্. এন্ দত্ত, কলিকাতা, ১৮৯৬।

কামন্দক নীতিসার, ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ্, ত্রিবান্দ্রম, ১৯১২।

ব্যবহার (আইন ও পদ্ধতি) সম্বন্ধে **কাত্যায়ন স্মৃতি**, পি. ভি. কানে কর্তৃক পুনঃসংগঠিত মূল মন্তব্য ও ভূমিকা সহ অনূদিত ও সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯৩৩।

কৃত্যকল্পতরু (লক্ষীধর) সম্পাঃ কে. ভি. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, জি. ও. এস্, বরোদা, ১৯৪৩।

লেখপদ্ধতি, সম্পাঃ সি. ডি. দালাল ও জি. কে. শৃঙ্গদেকার, জি. ও. এস., xix, ১৯২৫।

মনুস্মৃতি অর মানব ধর্মশাস্ত্র, সম্পাঃ ভি. এন. মান্দলিক, বোম্বাই, ১৮৮৬, অনুঃ জি. বূলার, এস্. বি. ই., xxv, অক্সফোর্ড, ১৮৮৬।

নারদ স্মৃতি (অসহায় কৃত টীকা হইতে উদ্ধৃতিসহ), সম্পাঃ জে জলি, কলিকাতা, ১৮৮৫, অনুঃ জে. জলি, এস্ বি. ই., xxxiii, অক্সফোর্ড, ১৮৮৯।

পরাশর স্মৃতি, (**মনোহর** টীকাসহ), বেনারস সংস্কৃত সিরিজ, ১৯০৭।

শুক্রনীতিসার, সম্পাঃ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৮৯০, অনুঃ বি. কে. সরকার, এলাহাবাদ, ১৯১৪।

তিরুক্কুডল্, অনুঃ ভি. আর. আর. দীক্ষিতর, দি আদেয়ার লাইব্রেরী, ১৯৪৯।

বশিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র, সম্পাঃ এ. এ. ফ্যুরার, বোম্বাই, ১৯১৬।

বিষ্ণুস্মৃতি অথবা **বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র** (নন্দপণ্ডিত কৃত টীকা হইতে উদ্ধৃতি-সহ), সম্পাঃ জে. জলি, বি. আই., কলিকাতা, ১৮৮১। অনুঃ জে. জলি, এস্. বি. ই., vii, অক্সফোর্ড, ১৮৮০।

ব্যবহারময়ূখ (ভট্ট নীলকণ্ঠ , সম্পাঃ পি. ভি. কানে, পুণা, ১৯২৬।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (**বীরমিত্রোদয়** ও **মিতাক্ষরা** টীকাসহ), চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস, ১৯৩০।

জি. বূলার কৃত **আপস্তম্ব, গৌতম, বশিষ্ঠ** ও **বৌধায়ন ধর্মসূত্র**-সমূহের অনুবাদ, এস. বি. ই., ii ও xiv, অক্সফোর্ড, ১৮৭৯-৮২।

মহাকাব্য, পুরাণ ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলী

অগ্নি পুরাণ, বি. আই., কলিকাতা, ১৮৮২, অনু: এম্ এন্. দত্ত, ২ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯০৩-৪।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, সম্পাঃ পি. এইচ্. শাস্ত্রী, কলিকাতা, ১৮৯১।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এব, **কৃষ্ণজন্ম খণ্ড**, এলাহাবাদ, ১৯২০।

মহাভারত, কলিকাতা সং, সম্পাঃ এন্ শিবোমণি ও অন্যান্য, বি. আই., কলিকাতা ১৮৩৪-৯, অনু: কে এম্. গাঙ্গুলী, প্রকাশক পি. সি. রায়, কলিকাতা, ১৮৮৪-৯৬, কুম্বকোনম্ সং, সম্পাঃ টি. আব. কৃষ্ণাচার্য ও টি. আব. ব্যাসাচার্য, বোম্বাই, ১৯০৫-১০, **শান্তিপর্বণ** (রাজধর্ম, ২ অংশ), সমালোচনাসহ সং, সম্পাঃ এস্. কে. বেলভালকার, পুণা, ১৯৪৯-৫০, **শান্তিপর্ব**, চিত্রশালা প্রেস, পুণা, ১৯৩২।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, সম্পাঃ বেভাবেণ্ড কে. এম্. ব্যানার্জী, বি. আই., কলিকাতা, ১৮৬২।

বৌদ্ধ মূলগ্রন্থসমূহ

দীঘ নিকায়, সম্পাঃ টি ডব্লিউ. রীস্ ডেভিড্স্ ও জে. ই. কাবপেণ্টাব, ৩ খণ্ড, পি. টি. এস্, লণ্ডন, ১৮৯০-১৯১১। অনু: টি. ডব্লিউ. রীস্ ডেভিড্স্, ৩ খণ্ড, এস্. বি. ই., লণ্ডন, ১৮৯৯-২১।

জাতক (ব্যাখ্যাসহ), সম্পাঃ ভি. ফাউস্‌বোল, ৭ খণ্ড (৭ম খণ্ড, ডি. এ্যাণ্ডারসন্ কৃত ইণ্ডেক্স) লণ্ডন, ১৮৭৭-০৭, অনু: বিভিন্ন অনুবাদক কৃত, ৬ খণ্ড, লণ্ডন, ১-৯৫-১৮৯৭।

মিলিন্দপঞ্‌হ, সম্পাঃ ভি ট্রেন্‌কনাব, লণ্ডন, ১৯২৮, অনু: টি. ডব্লিউ রীস্ ডেভিড্স্, এস. বি ই., অক্সফোর্ড, ১৮৯০-৪।

ঐতিহাসিক ও ইতিহাসোপম গ্রন্থাবলী

সংস্কৃত

বাণভট্ট, **হর্ষচরিত**, শঙ্করের টীকাসহ সম্পাঃ কে. বি. পরব, বোম্বাই, ১৯৩৭।

বান, **হর্ষচরিত**, অনু: ই. বি. কাউয়েল ও এফ্. ডব্লিউ. টমাস্, লণ্ডন, ১৮৯৭।

হেমচন্দ্র, **কুমারপালচরিত**, পূর্ণকলস অগনি কৃত টীকাসহ সম্পাঃ এস্. পি. পণ্ডিত, বোম্বাই, ১৯০০।

মেরুতুঙ্গ, **প্রবন্ধচিন্তামণি**, সম্পাঃ মুনী জীন বিজয়, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৩।

কল্‌হন, **রাজতরঙ্গিণী**, অনুঃ এম্‌. এ. স্টেইন্‌, ওয়েস্ট-মিনিস্টার, ১৯০০।

সন্ধ্যাকরনন্দী, **রামচরিত**, সম্পাঃ আর. সি. মজুমদার, আর জি. বসাক ও এন্‌ জি ব্যানার্জী, রাজশাহী, ১৯৩৯।

আরবী ও পারসী (অনুঃ)

দি হিস্ট্রী অফ্‌ ইণ্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইট্‌স্‌ ওন্‌ হিস্টো-রিয়ানস্‌, সম্পাঃ ও সংগৃহীত এইচ্‌ এম্‌. ইলিয়ট ও জন্‌ ডসন্‌, ৮ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৬৭-৭৭।

বিষয় সম্বন্ধীয় (টেকনিক্যাল) গ্রন্থাবলী

ভুবনদেব, **অপরাজিতপৃচ্ছা**, সম্পাঃ পি. এ. মানকড়, জি ও. এস্‌., বরোদা, ১৯৫০।

বরাহমিহির, **বৃহৎ সংহিতা**, অনুঃ দুর্গাপ্রসাদ, লক্ষ্ণৌ, ১৮৮৪ ; ভট্টোৎপল কৃত টীকাসহ ২ অংশ, সম্পাঃ সুধাকর দ্বিবেদী, বেনারস, ১৮৯৫-৭।

হেমচন্দ্র, **দেশনামালা**, সম্পাঃ মুরলীধর ব্যানার্জী, কলিকাতা, ১৯৩১।

বাৎস্যায়ন, **কামসূত্র** (যশোধর কৃত **জয়মঙ্গলা** টীকাসহ), সম্পাঃ গোস্বামী দামোদর শাস্ত্রী, বেনারস, ১৯২৯।

নাগবর্মা, **কর্ণাটকভাষাভূষণ**, সম্পাঃ এল্‌. রাইস্‌, বাঙ্গালোর, ১৮৮৪।

কৃষি-পরাসর, সম্পাঃ ও অনুঃ জি. পি. মজুমদার ও এস্‌. সি. ব্যানার্জী, বি. আই., কলিকাতা, ১৯৬০।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য সম্পর্কে **মানসার** (সংস্কৃত মূল টিপ্পনীসহ), সম্পাঃ পি. কে. আচার্য, অক্সফোর্ড, ১৯৩৩।

মানসোল্লাস অথবা **অভিলষিতার্থ চিন্তামণি**, সম্পাঃ জি. কে. শ্রীগোন্দেকার, জি. ও. এস্‌., xxviii ও lxxxiv, বরোদা, ১৯২৫-৩৯।

ময়মত, সম্পাঃ টি. গনপতি শাস্ত্রী, ত্রিবান্দ্রম সংস্কৃত সিরিজ, ১৯১৯।

রাজা ভোজদেব, **সমরাঙ্গন সূত্রধার**, সম্পাঃ টি. জি শাস্ত্রী, বরোদা, ১৯২৫।

বিবিধ সাহিত্যগ্রন্থ

সুভাষিতরত্নকোষ, সম্পাঃ ডি. ডি. কোসাম্বি ও ভি. ভি. গোখলে, হার্ভাড ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, ১৯৫৭।

ধনপাল, (**দি**) **তিলকমঞ্জরী**, সম্পাঃ ভবদত্ত শাস্ত্রী ও কে. বি. পরব, নির্ণয়-সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯০৩।

বান, **কাদম্বরী**, এস. আর. কালে রচিত টীকাসহ, বোম্বাই, ১৯২৮।

মুদ্রা ও উৎকীর্ণলিপি

এ. এস্. আলটেকর (সম্পাঃ) ও সি. আর. সিংহল সংগৃহীত, **বিবলিওগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান কয়েনস্**, পার্ট-১।

সি. জে. ব্রাউন, **কয়েনস্ অফ ইণ্ডিয়া**, কলিকাতা, ১৯২২।

এ. কানিংহাম, **কয়েনস্ অফ মিডিয়াভ্যাল ইণ্ডিয়া ফ্রম দি সেভেন্থ সেঞ্চুরী ডাউন টু দি মহামেডান কন্‌কোয়েষ্ট**, লণ্ডন, ১৮৯৪।

এম্. জি. দীক্ষিত, **সিলেক্টেড্ ইন্‌স্‌ক্রিপসানস্ ফ্রম মহারাষ্ট্র** (ফিফ্‌থ টু টুয়েলভথ্ সেঞ্চুরী এ. ডি.), পুণা, ১৯৪৭।

—, **সোর্সেস্ অফ দি মিডিয়াভ্যাল হিস্ট্রী অফ দি ডেকান** (মারাঠী ভাষায় মূল ও মন্তব্যসহ , iv, পুণা, ১৯৫১।

জে. এফ. ফ্লিট্, **ইন্‌সক্রিপসানস্ অফ দি আর্লি গুপ্ত কিংস**, সি. আই. আই, iii, লণ্ডন, ১৮৮৮।

স্টেন্ কোনাউ, **খরোষ্ঠী ইন্‌স্‌ক্রিপসানস্**, সি. আই. আই, ii, পার্ট i, কলিকাতা, ১৯২৯।

জি. এইচ্. খারে, **সোর্সেস্ অফ দি মিডিয়াভ্যাল হিস্ট্রী অফ দি ডেকান**, i, পুণা, ১৯৩০।

লুডার্স লিস্ট অফ ইন্‌স্‌ক্রিপসান্‌স, ই. আই., x।

এন্. জি. মজুমদার (সম্পাঃ), **ইন্‌স্‌ক্রিপসানস্ অফ বেঙ্গল**, iii, রাজশাহী ১৯২৯।

ভি. ভি. মিরাশী, **ইন্‌স্‌ক্রিপসানস্ অফ দি কলচুরি-চেদি এরা**, সি. আই. আই., iv, ২ অংশ, উটাকামণ্ড, ১৯৫৫।

— **বাকাতক রাজবংশ কা ইতিহাস তথা অভিলেখ**, বারাণসী, ১৯৬৪।

আর. বি পাণ্ডে, **হিস্টোরিক্যাল এণ্ড লিটারারি ইন্‌স্‌ক্রিপসানস্**, বারাণসী, ১৯৬২।

আর. বি. পাতিল, **এ্যান্টিকুইরিয়ান্ রিমেইনস্ ইন্ বিহার**, পাটনা, ১৯৬৩।

ভি. এ. স্মিথ, **ক্যাটালগ অফ দি কয়েনস্ ইন্ দি ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম**, কলিকাতা, অক্সফোর্ড, ১৯০৬।

ডি সি. সরকার, **সিলেক্ট ইন্‌স্‌ক্রিপসানস্ বিয়ারিং অন্ ইণ্ডিয়ান্ হিস্ট্রী এ্যাণ্ড সিভিলিজেনস্**, i, কলিকাতা, ১৯৪২।

বিদেশী সূত্রসমূহ

(১) গ্রীক

জে. ডব্লিউ. ম্যাক্‌ক্রিণ্ডেল, **এন্‌সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাজ ডেস্‌ক্রাইবড বাই মেগাস্থিনেস্‌ এ্যাণ্ড এ্যারিয়ান্‌**, কলিকাতা, ১৯২৬।

—, **এন্‌সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া এ্যাজ ডেস্‌ক্রাইবড্‌ ইন্‌ ক্লাসিক্যাল লিটারেচার**, ওয়েস্টমিনিস্টার, ১৯০১।

(২) চীনা

স্যামুয়েল বীল, **ট্রাভেলস্‌ অফ ফা-হিয়েন এ্যাণ্ড সুঙ্‌ ইউন** (অনুঃ, লণ্ডন, ১৮৭৯।

— **দি লাইফ্‌ অফ হিউয়েন সাঙ্‌**, লণ্ডন, ১৮৮৮।

হো চাংচুন, "**ফা-হিয়েনস্‌ পিলগ্রিমেজ টু বুদ্ধিস্ট কাণ্ট্রিজ**", **চাইনিজ লিটারেচার**, ১৯৫৬, নং ৩।

এইচ. এ. গাইল্‌স, **দি ট্রাভেলস্‌ অফ ফা-হিয়েন অর রেকর্ড অফ বুদ্ধিস্টিক্‌ কিংডামস্‌** (অনুঃ), কেম্ব্রিজ, ১৯৩৩।

জেমস লেগ্‌, **এ রেকর্ড অফ বুদ্ধিস্টিক্‌ কিংডামস্‌** (চীনা সন্ন্যাসী ফা-হিয়েনের ভ্রমন বৃত্তান্ত), অনুঃ, অক্সফোর্ড, ১৮৮৬।

টি. টাকাকুসু, **এ রেকর্ড অফ বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়ান্‌**, অক্সফোর্ড, ১৮৯৬।

টি. ওয়াটার্স, **অন্‌ উয়ান চুয়াঙ্‌স ট্রাভেলস্‌ ইন্‌ ইণ্ডিয়া**, অনুঃ টি. ডাব্লিউ. রীস্‌ ডেভিডস্‌ ও এস্‌. ডাব্লিউ. বুশেল্‌, ২ খণ্ড, লণ্ডন, ১৯০৪-৫।

(৩) অন্যান্য

হেন্‌রী ইউল, অনুঃ ও সম্পাঃ, **দি বুক অফ সের মার্কো পোলো**, ২ খণ্ড, লণ্ডন, ১৯২৬।

আকর গ্রন্থ

লক্ষ্মণশাস্ত্রী যোশী, **ধর্মকোষ** (৩ অংশে), ওয়াই, সাতারা জেলা, ১৯৩৭-৪১।

মনিয়ের মনিয়ের-উইলিয়ামস্‌, **এ স্যান্‌স্ক্রিট্‌-ইংলিশ ডিক্‌শনারি**, অক্সফোর্ড, ১৯৫১।

টি. ডব্লিউ. রীস্‌ ডেভিডস্‌ ও ডব্লিউ. স্টেড্‌, **পালি-ইংলিশ ডিকশনারি**, পি. টি. এস., লণ্ডন, ১৯২১।

প্রাচীন ভারতীয় সামন্ততন্ত্র, অর্থনৈতিক ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক গ্রন্থাবলী

পি. কে. আচার্য, **হিন্দু আর্কিটেক্চার ইন্ ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড অ্যাব্রড,** মানসার সিরিজ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, অক্সফোর্ড, ১৯৪৬।

ভি. এস. আগরওয়াল, **হর্ষচরিত—এক সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন,** পাটনা, ১৯৫৩।

— **কাদম্বরী—এক সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন,** বারাণসী, ১৯৫৮।

এ. এস. আলটেকর, **দি রাষ্ট্রকুটস্ এ্যাণ্ড দেয়ার টাইমস্,** পুণা, ১৯৩৪।

কে. এ. এ্যানটোনোভা, **"কে ভপরোসু ও রাজভিতি ফেওডালিজ্মা ভি ইণ্ডি",** ক্রাত্‌কি সুব্‌শেচেনিয়া ইনষ্টিটুটা ভস্টোকোভেডেনিয়া, iii. (এ. কে নউক, ইউ. এস. এস. আর, মস্কো, ১৯৫২) ২৩-৩২।

বি. এইচ্. বাডেন-পাওয়েল, **দি ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কমিউনিটি,** লণ্ডন, ১৮০৬।

— **দি ল্যাণ্ড সিস্টেমস্ অফ বৃটিশ ইণ্ডিয়া,** ৩ খণ্ড, লণ্ডন, ১৮৯২।

পি. সি. বাগচী, **ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল এশিয়া,** কালকাতা, ১৯৫৫।

পি. এন ব্যানার্জী, **পাব্লিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া,** কলিকাতা, ১৯১৬।

এ. এল ব্যাশাম, **স্টাডিজ ইন্ ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী এ্যাণ্ড ক্যালচার,** কলিকাতা, ১৯৬৪।

— **দি ওয়াণ্ডার ছ্যাট্ ওয়াজ ইণ্ডিয়া,** লণ্ডন, ১৯৫৪।

আর. জি. বসাক, **দি হিস্ট্রী অফ নর্থ-ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া,** কলিকাতা, ১৯৩৪।

মার্ক ব্লক, **ফিউড্যাল সোসাইটী,** লণ্ডন, ১৯৬১।

সি. ই. বস্ওয়ার্থ, **দি গজনভিড্স** (৯৯৪ ; ১০৪০), এডিনবার্গ, ১৯৬৩।

এম. এ. বাক্, **ইকনমিক্ লাইফ ইন্ এন্সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া,** ২য় খণ্ড, বরোদা, ১৯২৪।

আর. কে চৌধুরী, "ফিউড্যালিজম্ ইন্ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া", জে. আই. এইচ. **xxxvii, 385 ff ; xxxviii, 193 ff।**

— "ভিস্তি (ফোর্স্ট লেবার) ইন্ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া," আই. এইচ. কিউ., মার্চ, ১৯৬২।

— "সাম এ্যাসপেক্টস্ অফ ফিউড্যালিজম্ ইন্ কম্বোডিয়া," জে. বি. আর. এস্., **xlvii,** ২৪৬-৬৮।

এইচ্. টি. কোলব্রুক, **মিস্‌সিলিনিয়াস্ এসেস্**, সম্পাঃ ই. বি. কাউয়েল, লণ্ডন, ১৮৭৩।

আর. কাউলবোর্ন (সম্পাঃ), **ফিউড্যালিজম্ ইন্ হিস্ট্রী**, প্রিন্সটন্, ১৯৫৬।

ভি. আর. আর. দীক্ষিতর, **দি গুপ্ত পলিটী**, মাদ্রাজ, ১৯৫২।

চার্লস্ ড্রেকমেয়ার, **কিংসিপ এ্যাণ্ড কম্যুনিটি ইন্ আর্লি ইণ্ডিয়া**, স্টানফোর্ড, স্ট্যান্‌ফোড ইউনিভার্সিটি, ১৯৬২।

বি. এন. দত্ত, **হিন্দু ল অফ ইন্‌হেরিটেন্স**, কলিকাতা, ১৯৫৭।

— **স্টাডিজ ইন্ ইণ্ডিয়ান্ সোস্যাল পলিটী**, কলিকাতা, ১৯৪৪।

ডি. সি. গাঙ্গুলী, **হিস্ট্রী অফ দি পরমার ডাইনেস্ট্রী** ঢাকা, ১৯৩৩।

এফ. এল. গ্যানশফ্, **ফিউড্যালিজম্**, লণ্ডন, ১৯৫৯।

ইউ. এন. ঘোষাল, **দি বিগিনিংস্ অফ ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিওগ্রাফী এ্যাণ্ড আদার এসেস**, কলিকাতা, ১৯৪৪।

— **কণ্ট্রিবিউশনস্ টু দি হিন্দু রেভেনিউ সিস্টেম্**, কলিকাতা, ১৯২৯।

ম্যারিয়ন গিবস্, **ফিউড্যাল অর্ডার**, লণ্ডন, ১৯৪৯।

কৃষ্ণকান্তি গোপাল, "দি অ্যাসেমব্লি অফ দি সামন্তস্ ইন্ আর্লি মিডিয়াভ্যাল ইণ্ডিয়া" জে. আই এইচ, xlii, ২৪১-৫০।

— "ফিউড্যাল কম্পোজিশান্ অফ অ্যার্মি ইন্ আর্লি মিডিয়াভ্যাল ইণ্ডিয়া", জার্নাল অফ দি অন্ধ্র হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ সোসাইটী, xxviii, ৩০-৪৯।

লালনজী গোপাল, **ইকনমিক লাইফঅফ নর্দান্ ইণ্ডিয়া** (সি. এ. ডি. ৭০০-১২০০), বেনারস, ১৯৬৫।

— "অন্ ফিউড্যাল পলিটী ইন্ এন্‌সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া" জে. আই এইচ, xli, ৪০৫-১৩।

— "সমতট—ইট্‌স ভ্যারিং সিগ্‌নিফিক্যান্স ইন্ এন্‌সিয়েন্ট ইণ্ডিয়া" জে. আর. এ. এস্., ১৯৬৩।

— "দি শুক্রনীতি—এ নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরী টেক্সট্," বি. এস. ও.এ. এস., xxv, ৫২৪-৫২৬।

এস. গোপাল ও আর. থাপার (সম্পাঃ), **প্রব্লেমস্ অফ হিস্টোরিক্যাল রাইটিং ইন্ ইণ্ডিয়া**, নিউ দিল্লী, ১৯৬৩।

এস. এ. কিউ. হুশেনি, **দি ইকনমিক হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া**, i, কলিকাতা, ১৯৬২।

কে. পি. জয়সওয়াল, **হিন্দু পলিটী**, ২ অংশ, কলিকাতা, ১৯২৪।

— **হিন্দু পলিটী**, বাঙ্গালোর, ১৯৪৩ (উল্লেখ না থাকিলে এই সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে)।

পি. ভি. কানে, **হিস্ট্রী অফ ধর্মশাস্ত্র**, ii, পুণা, ১৯৪১।

ডি. ডি. কোসাম্বি, "অন্ দি ডেভালাপমেণ্ট অফ ফিউড্যালিজম্ ইন্ ইণ্ডিয়া", এ বি ও. আর. আই., xxxvi, ২৫৮-৬৯।

— **দি কালচার এ্যাণ্ড সিভিলিজেশন্ অফ এন্সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া ইন্ হিস্টোরিক্যাল আউটলাইন**, লণ্ডন, ১৯৬৫।

— "ইণ্ডিয়ান ফিউড্যাল ট্রেড চার্টারস্", জে. ই. এস এইচ. ও., ii, ২৮১-৯৩।

— **অ্যান ইণ্ট্রোডাকশান্ টু দি স্টাডি অফ ইণ্ডিয়ান্ হিস্ট্রী**, বোম্বাই, ১৯৫৬।

— "ওরিজিনস্ অফ ফিউড্যালিজম্ ইন্ কাশ্মীর", দি স্বার্ধশতাব্দী কমেমোরেশন্ ভলুম, ১৮০৪-১৯৫৪, এশিয়াটিক সোসাইটী অফ্ বোম্বে।

এস. কে. মাইতি, **দি ইকনমিক লাইফ অফ নর্দান্ ইণ্ডিয়া ইন্ গুপ্ত পিরিয়ড্** (সি. এ. ডি. ৩০০-৫৫০), কলিকাতা, ১৯৫৭।

এ. কে. মজুমদার, **চালুক্যস অফ গুজরাট**, বোম্বাই, ১৯৫৬।

আর. সি. মজুমদার (সম্পাঃ), **হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল**, i, ঢাকা, ১৯৪৩।

আর. সি. মজুমদার ও এ. এস্. আলটেকর (সম্পাঃ), **দি বাকাতক-গুপ্ত এজ্**, বেনারস, ১৯৫৪।

আর. সি. মজুমদার ও এ. ডি. পুসালকর (সম্পাঃ), **হিস্ট্রী এ্যাণ্ড কালচার অফ দি ইণ্ডিয়ান্ পিপল্**, ii, **দি এজ্ অফ ইম্পিরিয়াল ইউনিটী**. বোম্বাই, ১৯৫১।

— **দি হিস্ট্রী এ্যাণ্ড কাল্চার অফ দি ইণ্ডিয়ান্ পিপল্**, iii, **দি ক্ল্যাশিক্যাল এজ্**, বোম্বাই, ১৯৫৩।

কার্ল মার্কস, **প্রি-ক্যাপিট্যালিস্ট ইকনমিক ফরমেশনস্**, অনুঃ জ্যাক কোহেন, সম্পাঃ ই. জে. হব্সবম, লণ্ডন, ১৯৬৪।

বি.পি. মজুমদার, **দি সোসিও-ইকনামিক হিস্ট্রী অফ নর্দান্ ইণ্ডিয়া** (১১শ ও ১২শ শতাব্দী), কলিকাতা, ১৯৬০।

— "ডেট এ্যাণ্ড কন্‌করডেন্স অফ দি শুক্রনীতিসার", জে. বি. আর. এস্‌, xlvii, ২১৪-৩৩।

ওয়াই. এস. মেডভেডেভ, "কে ভোপরোসু ও করমাথ জেমলেভলাডেনিয়া ভি সেভেরনৈ ইন্দি ভি VI-VII ভেকাখ্‌," **প্রব্লেমি ভস্টোকোভিডেনিয়া**, ১৯৫৯, i, ৪৯-৬১।

— "অরিজিন এ্যাণ্ড এভল্যুশান্‌ অফ দি ফর্ম অফ দি ইণ্ডিয়ান গ্রান্টস্‌ (৩য় — ১২শ শতাব্দী)," **ইস্তোরি ই কুলটুরা দ্রেভনেই ইন্দি**, সম্পাঃ ডব্লিউ. রুবেন, ভি. ষ্ট্রুভে ও গ্রি. বনগার্ড-লেভিন, মস্কো, ১৯৬৩।

বিনায়ক মিশ্র, **মিডিয়াভ্যাল ডাইনেষ্টিজ অফ উড়িষ্যা**, কলিকাতা, ১৯৩৪।

এস. কে. মিত্র, **দি আর্লি রুলার্স অফ খাজুরাহো**, কলিকাতা, ১৯৫৮।

ডব্লিউ. এইচ মোরল্যাণ্ড, (দি) **এ্যাগ্রেরিয়ান সিস্টেম অফ মোসলেম ইণ্ডিয়া**, এলাহাবাদ, ১৯২৯।

সুলতান নাদভি, **আরব-ভারত কে সম্বন্ধ**, এলাহাবাদ, ১৯৩০।

প্রাণনাথ, **ইকনমিক কণ্ডিসানস্‌ অফ এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া**, লণ্ডন, ১৯২৯।

পুষ্প নিয়োগী, **কণ্ট্রিবিউশনস্‌ টু দি ইকনমিক হিস্ট্রী অফ নর্দার্ন ইণ্ডিয়া**, কলিকাতা, ১৯৬২।

রমা নিয়োগী, **দি হিস্ট্রী অফ দি গাহড়ওয়াল ডাইনেস্টি**, কলিকাতা ১৯৫৯।

রিচার্ড প্যাঙ্কহার্স্ট, **এ্যান ইণ্ট্রোডাকশন্‌ টু দি ইকনমিক হিস্ট্রী অফ ইথিওপিয়া**, লণ্ডন, ১৯৬১।

হেন্‌রী পিয়েরনে, **ইকনমিক এ্যাণ্ড সোসাল হিস্ট্রী অফ মিডিয়াভ্যাল ইউরোপ**, লণ্ডন, ১৯৬১।

বি. এন. পুরী, **দি হিস্ট্রী অফ দি গুর্জর-প্রতিহার**, বোম্বাই, ১৯৫৭।

ই. জে. র‍্যাপসন্‌ (সম্পাঃ), **দি কেমব্রিজ হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া**, ১ম খণ্ড, এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া, প্রথম ভারতীয় পুনর্মুদ্রন, দিল্লী, ১৯৫৫।

নীহাররঞ্জন রায়, **বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)**, কলিকাতা, ১৯৪৮।

জে. এইচ. রাউণ্ড, **ফিউড্যাল ইংল্যাণ্ড**, ১৯৬৪ (প্রথম প্রকাশ, ১৮৯৫)।

এইচ. ডি. সাঙ্কালিয়া, **আরকিওলজি অফ গুজরাট**, বোম্বাই, ১৯৪১।

বি. সি. সেন, **সাম হিস্টোরিক্যাল অ্যাস্‌পেক্টস্‌ অফ ইন্‌সক্রিপশানস্‌ অফ বেঙ্গল**, কলিকাতা, ১৯৪২।

দশরথ শর্মা, **আর্লি চৌহান ডাইনেস্টিজ**, দিল্লী, ১৯৫৯।

আর. এস. শর্মা, **অ্যাস্‌পেক্টস্‌ অফ পলেটিক্যাল আইডিয়াস এ্যাণ্ড ইন্‌স্টিটিউশনস্‌ ইন্‌ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া**, দিল্লী, ১৯৫৯।

— **শূদ্রস ইন্‌ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া**, দিল্লী, ১৯৫৮।

— **সাম্‌ ইকনমিক অ্যাস্‌পেক্টস অফ দি কাস্ট সিস্টেম ইন্‌ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়া**, পাটনা, ১৯৫২।

— "ষ্টেজেস্‌ ইন্‌ এনসিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান ইকনমি", **এন্‌কোয়ারী**, নং ৪।

আর. বি. সিং, **দি হিস্ট্রী অফ চাহমানস্‌**, বারাণসী, ১৯৬৪।

ভি. এ. স্মিথ, **আর্লি হিষ্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া**, অক্সফোর্ড ১৯০৪।

ফ্র্যাঙ্ক স্টেনটন, **ইংলিশ ফিউড্যালিজম** ১০৬৬-১১৬৬, অক্সফোর্ড, ১৯৬১।

পল. এম. সুইজি ও অন্যান্য, **দি ট্রানজিশন্‌ ফ্রম ফিউড্যালিজম টু সোস্যালিজম্‌**, (এ সিম্‌পোসিয়াম), সংস্কৃতি পাব্লিকেশন্‌, পাটনা, ১৯৫৭।

কে. জে. ভিরজি, **এনসিয়েন্ট হিস্ট্রী অফ সৌরাষ্ট্র**, বোম্বাই, ১৯৫২।

লক্ষীশঙ্কর ব্যাস, **চৌলুক্য কুমারপাল** (হিন্দী), ২য় সং, বারাণসী, ১৯৬২।

জি. ইয়াজদানি (সম্পাঃ), **দি আর্লি হিস্ট্রী অফ দি ডেকান**, i-vi, অক্সফোর্ড, ১৯৬০।

নির্দেশিকা

অ

আ

ফ

ব

হ